পঙ্কপ্রদীপ

বুদ্ধদেব গুহ

নবসাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা ৯

প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬২

মঞ্জু সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

পরিবেশক : নবসাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণি, কলি-৯
মুদ্রক : সোয়ান আর্ট প্রিন্টার্স, ১বি/২৮, দমদম রোড, কলি-২ প্রচ্ছদ: সু সরকার।

কুচিবনে গান

অমুর ডাইরি

স্টীল একসপ্রেস ধরে জামশেদপুরে এসেছিলাম সোমবার সকালে।

নিশির ডাকেরই মতো জামশেদপুর আমাকে ডাকছিল কিছুদিন ধরেই। কিছু কিছু স্থান মাঝে মাঝে এমন করে ডাক পাঠায়। যখন পাঠায়, তখন অগ্রাহ্য করা যায় না।

ঘুমের মধ্যে জেগে উঠছিলাম। তারাভরা আকাশে চেয়ে, জানালার সামনে বসে মনে হচ্ছিলো কতদিন একটু রোদ লাগেনি গায়ে, কতদিন বদগন্ধ কর্মব্যস্ত পুরুষদের ধাক্কাধাক্কি, ধুলো, বিকট আওয়াজ আর ফিরিওয়ালার চিৎকার এড়িয়ে একটু নির্জন পথে গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায় হাঁটিনি একটুও। কতদিন! দম বন্ধ হয়ে আসছিলো একেবারে।

রোজ সকালে কাগজ খুললে একই খবর। দাম বেড়েছে! সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে হু-হু করে প্রতিদিন। আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে একেবারেই। হাত ফসকে যাওয়া গ্যাস বেলুন যেমন উড়ে যায় উপরে, নিচে দাঁড়িয়ে-থাকা শিশুকে হতভম্ব করে। ঠিক তেমনি করেই দাম বাড়ছে। আর দাম কমছে মানুষ আর টাকার। টাকা একদিন অনেকই রোজগার করেছি, ট্যাক্সও দিয়েছি অনেক।

একদিন ছিলো, যখন লোকে আমাকে বড়লোক বলেই জানতো। কিন্তু নিজেরই স্বভাব দোষে (না, মদ খেয়ে বা জুয়া খেলে নয়) সব টাকা নষ্ট করেছি। নষ্ট করেছি না বলে, বলা ভালো, নষ্ট হয়েছে। সত্যমিথ্যা নানা অজুহাতে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বহু লোকে। তার চেয়েও বেশি নষ্ট হয়েছে, নিজের মধ্যেরই নষ্ট করার তাগিদে। যারা ঠকিয়েছে, সে আত্মীয়ই হোক, কী বন্ধু, কী কর্মচারী, তারা সবাই ভেবেছে বোকাটাকে ঠকিয়ে নিলাম। কিন্তু তারা কেউই জানেনি যে, এ বোকা জেনেশুনেই ঠকেছে বারবার।

আমার বহু দূরসম্পর্কের পিসতুতো ভাই গবু এখানেই আছে। শুনেছি, বড় চাকরি করে। তার মূল পড়াশোনার খরচাটা পুরো আমিই দিয়েছিলাম। বাড়িওয়ালা একবার উৎখাত করতে চেয়েছিলেন, বহু হাজার টাকা ভাড়া বাকি

পড়াতে, তাদের সমস্ত পরিবারের সেই দায় আমি উদ্ধার করেছিলাম। তা বিয়ের সময় গবু পণ নিয়েছিলো এবং আমার কাছ থেকেও লোক খাওয়ানো জন্যে কিছু টাকা নিয়েছিলো। যে শিক্ষিত মানুষ বিয়েতে পণ নেয়, তাবে শিক্ষিত বলে মানা অসম্ভব। মিছিমিছিই ওর পড়াশোনার জন্যে টাকা নষ্ট করেছিলাম। এখন মনে হয়।

একদিন বড়লোক এবং কবি বলে অগণ্য মানুষই খাতির করতো। আজকে যে খাতির-যত্নটুকু পাই, তা শুধু মাত্র কবি বলেই। এই খাতিরের দাম অন্য।

আজ আমার কাউকেই দেবার মতো কিছু নেই। তবে থাকলেও আম হয়তো কাউকেই কিছু দিতামও না। কারণ যে ডান হাতটি দিয়ে দান করতাম সকলে মিলে নির্মম মোচড়ে মোচড়ে সেই ডান হাতটিকেই ভেঙে দিয়ে গেছে ভাঙা হাতের যন্ত্রণা তো আছেই তার চেয়েও অনেক বেশি বাজে অকৃতজ্ঞতাং আর কৃতঘ্নতার আঘাত। আমার স্ত্রী রানী বলে, যা-কিছুই যা কারো জন্যেই করেছো, তা মনে করো নিজের আনন্দর জন্যই করেছিলে। প্রত্যাশা করবেই ব কেন?

যখন করেছিলাম, তখন কিন্তু আনন্দের জন্যেই করেছিলাম। এখন তাদের কৃতঘ্নতাতে কেন যে কষ্ট পাই, জানি না।

আমি কবি। যেহেতু আমি কোনো রাজনৈতিক দলেরই পোস্টার লিখিনি, লিখব না; তাই আমি এখনও লিটল ম্যাগাজিনেরই কবি। পাঠকসমাজ আমাকে কবি বলে মেনে নিয়েছিল, এইটে ভেবেই আনন্দে থাকি শত দুঃখের মধ্যেও। কবিরা প্রায় কেউই মানেননি যদিও। আমি তাঁদের মতে "রোম্যান্টিক"। "মহিলাদের মদতপুষ্ট কবি"। অতএব কবি নই।

রানীর আত্মাটি খুব ভালো। এবং ওর ভিতরে এক প্রচণ্ড শক্তি আছে। নইলে আর্থিক অবস্থার এই সাংঘাতিক পরিবর্তন ওর পক্ষে মানিয়ে নেওয়াই সম্ভব হতে না। কৃতঘ্নতা, এবং অকৃতজ্ঞতার আঘাত ওকে সইতে হয় আমার চেয়ে অনেকই বেশি। কিন্তু রানী স্বীকার করে না কিছুমাত্র। অনুযোগও করে না। আমি বলবো যে, ওর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, ও আমার মতো স্বামী নিয়ে এতোদিন ঘর করে এলো। শিশু অথবা সেনাইল বৃদ্ধকে সামলানোও এর চেয়ে অনেকই সোজা।

রানীই আমার জীবনে একমাত্র নারী নয়। অথচ রানী নিজে প্রকৃতার্থে সতী। বারংবার অনুরোধ উপরোধ করেও ওকে একবারটির জন্যেও অসতী করতে পারলাম না। জানি না, অসতী তো হলে ও আমাকে বলে হবে না। না হওয়াই ভালো। তবে এ ব্যাপারে আমার কোনো মান্ধাতার আমলের ধ্যান-ধারণা নেই। বিয়ে যে একটা চুক্তি সে কথা আমিও মানি। কিন্তু যে-কোনো চুক্তিই যদি ধনুক ভাঙা-পণ হয়ে ওঠে তাহলে তা তো প্রহসনই। চুক্তির দু'পাশেই বিদেশের হাইওয়েতে যেমন থাকে, তেমনই 'SOFT SHOULDER' থাকা উচিত। PARKING LANE। হু-হু করে ছুটে যেতে যেতে ক্লান্তি লাগলে পথপাশে একটু থেমে থাকলে বা মোটেলে পছন্দসই কারো সঙ্গে একটি

রাত কাটালে, সেই দামামা-বাজানো চুক্তি আরও ঔজ্জ্বল্য পায়। ঘর না ভেঙেও ঘরকে নতুন করা যায়।"

কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষেরা সেই শ্বেতকেতু আর উদ্দালকের দিন থেকেই নারীকে গাভীর চেয়ে বেশি মর্যাদা দিতে নারাজ। নারীরা নিজে হাতে এই অধিকার তুলে না নিলে তাঁরা দেবেনও না কোনোদিন।

তবে আমার ব্যাপারে রানীর কোনো দ্বিধা নেই। ও বলে তুমি কবি। এই নিখিলবিশ্ব তোমার চারণভূমি। 'চারণভূমি' কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা যে নেই তা নয়। তবু আমি হাসি।

রানী বলে, তোমার জীবনে যে অভিজ্ঞতাই হোক না কেন তা তোমার নিজের একার নয়, নিজের নিজস্ব করে রাখবারও নয়। তাই তার ভালোমন্দ তোমাতে বর্তায় না। পাঠক-পাঠিকাকে তা দিয়ে দিলেই তুমি ফুরিয়ে যাবে। তার পর নতুন করে ভরে নেবে নিজেকে আবার। ও হাসতে হাসতে বলে, বাচ্চাদের যেমন যখন তখন স্টম্যাক-আপসেট হয়, তোমারও যখন তখন প্রেম হয়। শিশুদের অনেক দোষ ক্ষমা করে দিতে হয়। আর ক্ষমার কথাই যখন ওঠে তখন মা অথবা স্ত্রীই যদি ক্ষমা না করে অথবা বাবা এবং স্বামী; তবে ক্ষমা করবেটা কে!

রানীর এই মহীয়সী, প্রকৃত শিক্ষিত, প্রখর বুদ্ধিমতী চরিত্রই হয়তো কোনোদিন আমাকে সত্যিকারের বড় কবি করে তুলবে। তুলবে কি? এই মনু ঘোষকে?

লক্ষ্মী যতদিন ছিলেন সরস্বতীর বোধহয় পা ফেলতে দ্বিধা হচ্ছিলো। অন্যান্য অনেক কবিদের কথাও জানি যে লক্ষ্মী যখন ছিলেন না তখন ঘরে সরস্বতী জাঁকিয়ে ছিলেন। লক্ষ্মী যেই এলেন অমনি সরস্বতী নীরবে চলে গেলেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর সহাবস্থান বড় একটা দেখা যায় না। গেলে, সুখের কথা হতো। লক্ষ্মীর প্রাচুর্য বোধহয় অধিকাংশ মানুষের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে ... করে দেয়।

তবে আমি খুশি। এক দেবীকে, এক স্ত্রীকে ভজনা করাই যথেষ্ট কষ্টর কাজ। তার উপর আবার দু নম্বর। অথবা ততোধিক। সরস্বতী আর রানীকে নিয়েই আমি খুশি। আপাতত।

এখানে যে মান-সম্মান, অকৃত্রিম প্রীতি ও ভালোবাসা পেলাম ও পাচ্ছি আসার পর থেকেই যে, সত্যিই অভিভূত হয়ে গেছি। স্টেশানে নেমে সাইকেল রিক্সা নিয়ে কুটুর কুটুর করে ছবিদের বাড়ি পেঁছে বললাম, এই যে ছবি। আমি এসেছি 'আমি এসেছি' এই সামান্য শব্দ দুটি যে নীলডির ছবির মতো পরিবেশে ছবির মনে এবং অনেকেরই মনে এমন ঢেউ এর পর ঢেউ তুলবে তা অভাবনীয় ছিলো। কবিতা পড়ুন কী না পড়ুন সকলেই যে আমাকে এমন আপন করে নেবেন তা ধারণারও বাইরে ছিলো। ঈশ্বরের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা আমার। জানি না, যাবার দিনে কেমন করে, কী বলে বিদায় নেবো এঁদের কাছ থেকে। চলে যাব কী ভাবে এদের সকলকে রেখে। না বলেই পালিয়ে

যাবো কি? সরস্বতীর মতন? না, তা কেন? জাগতিক দুঃখ থেকে পালানোর প্রবৃত্তিও যেমন খারাপ, ভালোবাসা এবং প্রাপ্তি থেকে অমন চোরের মতো পালানোও খারাপ। জানি না, চোখে জল এসে যাবে না তো! যাঁরা আমাকে অন্তরের মধ্যে ঠাঁই করে দিলেন তাঁদের নিরন্তর অন্তরে রাখাও তো কর্তব্য। কিন্তু পারব না। আমি জানি। কলকাতায় থেকে কোনো মানবিক বৃত্তির লালন সম্ভব নয় আর। সে কৃতজ্ঞতাই হোক কী প্রেম।

আবার বলি, ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নীলডির সকলেই ভালো থাকুক। ভালো থেকো, তোড়া। তুমি বড় বিত্রস্ত করেছো আমাকে। বাঁচা দায় এখন।

তোড়া

কী অদ্ভুত সব নাম তোমাদের নীলডির রাস্তার। ভিয়াস রোড। ভিস্তুভিয়াসও আছে নাকি?

না, না। নদীর নামে নাম যে! ভিয়াস, রবি, ঝিলম্, সুবর্ণরেখা, খড়কাই। পাহাড়ের নামেও আছে। যেমন দলমা। জার্মান সাহেবরা যখন এক্সপ্যানশনের সময়ে এসেছিলো, কাইজার বাংলোতে ছিলো, তখন কিছু নাম তাদের খাতিরেও হয়েছিলো। যেমন স্টুটগার্ট রোড।

এটা কী গাছ?

গাছ-ফাছ আমি চিনি না। আমি কি বটানিস্ট?

অমনোযোগী গলায় উত্তর দিলো কবি অমু ঘোষ।

বটানিস্ট না হলেও, গাছ ভালোবাসেন তো।

তো? গাছ ভালোবাসলেই কি তাদের নাম বলে বলে বিদ্যে জাহির করতে হবে?

ভালোবাসেন অথচ নাম জানেন না, চেনেন না, কখন ফুল আসে খোঁজ রাখেন না? অদ্ভুত মানুষ তো আপনি!

মানুষ কী না সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দেহ নই। তবে আশ্চর্যজনক জীব যে, সেকথা নিশ্চয়ই মানি। অনেককিছুই, অনেককিছুকেই ভালোবাসি, আবার বাসিও না।

না কেন? এটা ভালো না।

তোমার নাম কি?

আমার নাম তো আপনি জানেনেই!

সে তো তোড়া! মা-বাবার দেওয়া নাম। সে তো পোশাকি নাম। যে নামে নামী হয়ে অন্নপ্রাশনের দিনে মামার কোলে বসে চামচে করে পায়েস খেয়েছিলে। যে নাম লিখিয়ে দিয়ে এসেছিলেন কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে, তোমার দাদু বা দিদা। সেই নাম কি নাম? নামই নয় সেটা।

কেন সে নাম নাম নয়, কেন ?

ওটা একটা চাপিয়ে-দেওয়া নাম। তোমার মেজ জ্যাঠা বা ন'পিসী বা বাড়িউলি দিদা, যাঁর প্রচণ্ড স্নেহ ছিলো তোমার মায়ের প্রতি, তাঁর মনোমতো নাম। যে নামে তিনি নিজেকে ডাকতে পারলে খুশি হতেন, বা তাঁর প্রিয়তমা কাউকে, তা না পেরে তোমার অবোধ ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। অথবা তোমার মায়ের নিজের নাম, নিজে দিলে যে নাম দিতেন তিনি অথবা তোমার বাবার বিয়ের আগের প্রেমিকার নাম।

সেটা ঠিক নয়।

বললে কী হয়। সে নাম, নামই নয়। তোমার বাবার অফিসের বড়সাহেবের দেওয়া নাম অথবা তোমর দোর্দণ্ডপ্রতাপ বড়মামা বা বড়জ্যাঠা বা কুঁদুলে বড়পিসীর দেওয়া নামের ভারে নিশ্চয় তুমি চাপা পড়ে আছো জন্ম থেকেই ইঁট-চাপা ঘাসেরই মতো। সে নামে বিকশিত, পুষ্পিত হওনি কখনও।

আমার কোনো জ্যাঠা বা মামা নেই। আমার মা ও বাবাও একমাত্র সন্তান।

আগেই বোঝা আমার উচিত ছিলো। নইলে এমন টোটালি স্পয়েল্ট তুমি হতে না। তার উপর স্বামীও মোটে একজন। তুমি ছাড়া স্পয়েল্ট আর হবটা কে ?

আপনার নিজের নামটাও কি চাপানো নাম নয় ? অমুদা ?

এই বঙ্গভুমে একটি বড় বদভ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। চলচ্চিত্রাভিনেতা, লেখক, গায়ক, বাদক, আবৃত্তিকার, কবি, সকলকেই তাঁদের জ্যাঠামশায় অথবা ঠাকুর্দার বয়সী মানুষেরাও দাদা বা দিদি বলে ডাকেন -অ্যাজ আ রুল। এতে ঠিক কী ধরনের ভক্তি দেখানো হয় বুঝি না। কিন্তু আমি এইরকম সম্বোধন মানতে রাজি নই। একথা সবাইকে বলেও দিতে পারো। তবে তুমি দাদা ডাকলে আপত্তি নেই।

নাম সম্বন্ধে একটি ভারী ভালো গপ্পো আছে। হিতুদাদের বাড়ি পৌঁছে বলব সে-গল্প। নামের নামাবলীর কথা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ হাঁটলো দুজনে। ডিনার খেতে খেতেই বলা যাবে।

কি হলো ? কথা বলুন।

অমু বললো, সত্যি ! ভাবতেই ভালো লাগছে। কত্দিন পর যে, ক'টা দিন ছুটি পেলাম। এ-কটা দিন শুধু আমারই দিন। খেয়ালখুশির নিয়মভাঙার দিন। তোমাদের এখানে প্রত্যেকে যে এই ঠাণ্ডাতে উঠে তৈরি হয়ে সাতটার মধ্যে কারখানায় পেঁছিচ্ছে একথা ভাবলেই আনন্দে মূর্চ্ছা যাচ্ছি আমি। আমার একারই ছুটি। আর সকলেরই কাজ। আঃ। বাঙালি হয়ে জন্মেছি তো। শুধুমাত্র নিজে সুখী হলেই সুখী হতে পারি না। আমার সুখের প্রেক্ষিতে অন্যদের দুখী দেখতে না পারলে নিজের সুখটা যেন সম্পূর্ণই হয় না।)

তোড়া হাসলো অমুর কথা শুনে।

আঃ। কী সুন্দর রাত। কী সুন্দর গাছ-গাছালিতে-ভরা সব নির্জন পথ। কী সুন্দর তুমি। আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছো অচেনা পথে।

আমি সুন্দর নই।

সৌন্দর্যের বিচার করে অন্যর চোখ। নিজের চোখ নয়। "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি যে পথ জানি না, তোমার উপর করিনু নির্ভর তোমা বই কিছু মানি না।" অমু আবৃত্তি আর গানের মাঝামাঝি গোছের কিছু একটা করলো। আবার বললো, গাছটা কী?

এটা সোনাঝুরি।

হ্যাঁ। তোমাদের জামশেদপুরে তো সোনাঝুরির জন্যে বিখ্যাত। সোনারি লিংকের দুপাশে তো অনেকই সোনাঝুরি গাছও আছে না? একসময় প্রতি সপ্তাহে এসে কাইজার বাংলোতে থাকতাম। একটি কম্পানির ডিরেক্টর ছিলাম। আদিত্যপুরের কারখানায় যেতাম ভোরে উঠে। সন্ধেবেলা এসে দু পাত্তর হুইস্কী চড়িয়ে ডিনার খেয়ে লাইনিং-এ কেটে রাখা রাউরকেল্লা এক্সপ্রেসে লাগবার জন্যে আলাদা যে ডিট্যাচড্ কোচ থাকতো, তাতে উঠে ঘুমিয়ে পড়তাম। যেসব সুখের দিন ছিলো। স্বপ্নর মতো মনে হয়। জামশেদপুরের আর জানতাম না কিছুই। স্টেশান-কাইজার বাংলো-কারখানা বাংলো-স্টেশান। ব্যসস্। মাঝে-মাঝে লাঞ্চে বেলদি ক্লাবে যেতাম অবশ্য। ফর অ্যান অকেশনাল পিংক-জিন। অথবা ভড্কা। অথবা টু পিপল্ট আ বীয়ার উইথ সামওয়ান্।

আপনি বড় বেশি কথা বলেন।

জানি। সবার কাছে বলি না। যাদের ভালো লাগে, পছন্দ হয়, তাদের কাছে বলি। জানি, এটা আমার মস্ত দোষ। মার্জনা কোরো নিজগুণে।

অমুদা, আপনি যেমন কথা বলেন তেমনি চিঠিও লেখেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, কোনো মানুষ এই টেলিফোন-টেলেক্স-টেলিফ্যাক্স-এর দিনেও এমন চিঠির ভাষায় কথা আর কথার ঢঙে চিঠি লিখতে পারেন। এই অভ্যেস হলো কী করে?

কু বলছো না সু? অভ্যেসটাকে? যাত্রা করি বলছো কি?

হেসে ফেললো তোড়া। বললো, দুটোর একটাও নয়। এটা একটা আশ্চর্য অভ্যেস। এ যুগে বেমানান। অলমোস্ট প্রাগৈতিহাসিক। কী করে হলো এই অভ্যেস?

ব্যর্থ প্রেমের চিঠি লিখে লিখে, ও পাঠিয়ে। অথবা নিজের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে বলে?

তাই?

হ্যাঁ তাই।

কিন্তু প্রকৃত প্রেম মানেই তো ব্যর্থ।

তোড়া বললো।

যে প্রেম পূরীত হয়েছে তার মধ্যে নীলামে-কেনা ফার্নিচারেরই মতো পরে অনেকই ফাঁক-ফোকর বেরোয়; ফাটাফুটি। পুডিং দিয়ে অনেক জায়গা মেরামত করা থাকে। যতই দিন যেতে থাকে ততই সে সব ছিদ্র, গহ্বর, চিড়, ফাটল নগ্নভাবে প্রকট হতে থাকে। অপূরীত প্রেম বা ব্যর্থ প্রেমই তো আসল

প্রেম। যা থাকে, নীরব মুহূর্তে, জানলা দিয়ে চাওয়া তারাভরা আকাশে, নিজের গায়ের শালের নিচের ওমে, দুঃখময় একাকীরাতের সুন্দর সব স্বপ্নে।

বাঃ। তুমি খুব সুন্দর কথা বলেছো। সুন্দর করেও। চমৎকার। খড়কাই নদীর মতো তোমার কথার চাল। যার বোঝার সেই বুঝবে।

আরে এটা কী গাছ? দাঁড়িয়ে পড়ে অমু বললো। কী সুন্দর সটান শরীর, ছিপ্ছিপে। ঠিক তোমারই মতো। আমি দেখেছি আকাশমুখী আগুনবরণ ফুল, কোমল সবুজ পাতার মোড়কে ফোটে এই গাছেই। বসন্তকালে। নাম কী এর জানো?

অগ্নিশিখা।

অমু মাথা উঁচু করে দেখলো। গাছটির দিকে বার বার তাকালো। তারপর বললো, কী স্নিগ্ধ গাছটি। আর ফুল যখন ফোটে তখন এই স্নিগ্ধতার মধ্যেই জমিয়ে তোলা বছরভোরের সব জ্বালা নরম আগুন হয়ে নিবাত নিষ্কম্প হয়ে থাকে। নিঃশব্দে হাতছানি দেয়। বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করে। আমি তোমার পুরোনো নাম বদলে নতুন নাম দিলাম অগ্নিশিখা। পছন্দ?

তোড়া দাঁড়িয়ে পড়ে গাছটির দিকে চাইলো একবার। তারপর মাথা হেলালো।

বললো, যে নামেই ডাকতে ভালো লাগে ডাকবেন। সাড়া দেব। দেখবেন। কাছেই দারুণ কুর্চিবন আছে। যাবেন একদিন? আমি আর আপনি। পূর্ণিমার রাতে? গান শোনাতাম আপনাকে।

অমু তোড়ার বাঁ হাতখানি তুলে নিয়ে ওর হাতের পিঠে চকিতে চুমু খেলো।

একটু লজ্জা, একটু উত্তেজনায় গাল লাল হয়ে উঠলো তোড়ার। বললো, কেউ দেখে ফেলবে। চারধারে বাড়ি। কী যে করেন! আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই।

কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এই সব মোটা-মোটা গাছেরই কাণ্ডের মতো অচল হয়ে যায়। তাদের একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আজীবন। কাণ্ডজ্ঞানকে আমি সযত্নে এড়িয়ে চলি।

নিশ্চয়ই কেউ দেখেছে। গাছ-গাছালির মধ্যের বাংলোগুলো থেকে হাজার চোখ চেয়ে থাকে। এ সব পথে যে লোক চলে না।

দেখলেই বা! গোপনে কতটুকু আর ঘটে একজন নারী বা পুরুষের মধ্যে। যেটুকু ঘটে বন্ধ দরজার ঘরের মধ্যে সেটুকুও অনুমান করেই নেওয়া যায়। গোপন আসলে থাকে না। কিছুই গোপন থাকে না। কিন্তু যা কিছু ঘটে দুজন মানুষের মনে মনে, তার একটুও কি কেউ আঁচ করতে পারে? প্রতিক্ষণ লোকে ভুল দেখে, ভুল বোঝে এবং এক-অষ্টমাংশ ভেসে-থাকা হিমবাহর টুকরোটুকু দেখেই সবই দেখেছে এবং জেনেছে বলে ভাবে। রাজেশ খান্নার মুখে সেই বিখ্যাত গান শোনোনি? "ও ছোড়ো বেকার বাঁতে। লোগো কো কহেগা লোগোকো যো ক্যাহনা"।

আপনার মতো মানুষের মুখে এই সব ভাষা, গান ভালো লাগে না।

মস্ত ভুল। 'আমার মতো', 'তোমার মতো' বলে কোনো আলাদা মানুষ নেই। সব মানুষই সমান। ভাগ শুধু দুই। ভালো আর মন্দ। তাছাড়া, ভাষার নানা রকম হয় মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে। যে অভিব্যক্তি, যে শব্দ বা বাক্য ছাড়া প্রকাশ করা যায় না তা ব্যবহার না করলে সে অভিব্যক্তি অব্যক্তই থাকে। প্রকাশিত হয় না। ভাষা নিয়ে বাতিকগ্রস্ততা সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়।

বলেই, অমু থেমে পড়ে বললো, বাঃ। সামনের এই বিস্তীর্ণ মাঠটি তো বেশ। এ কি গলফ্-এর কোর্স নাকি ?

হ্যাঁ। কী দারুণ দেখেছেন আমাদের গোলমুড়ি।

মুড়িকে কোনোদিন চৌকো হতে দেখিনি বটে। তবে তোমাদের গোলমুড়ি নীলডি সত্যিই সুন্দর। কিন্তু তোমাদের গলফ্ কোর্সটি যাচ্ছেতাই।

তাই ?

হ্যাঁ।

কেন ?

মজঃফরপুরের কোনো সান্-ট্যানড্ মধ্যবয়সী মানুষের মাথার টাকের মতো এ মাঠ। গলফ-লিংকস দেখবে তো কোলকাতায় এসো 'আর সি. জি. সি.' বা 'টলী'তে। অথবা চলে যাও শিলঙে। বা ডিগবয়ে। পুবী না হলে, চাপ চাপ দুব্বো ঘাস না হলে, খেলার মজাই হয় না। তা সে কোর্স নাইন-হোলেরই হোক আর কম-হোলেরই হোক। একসময় তো আমিও গলফ্ খেলতাম। যখন বড়লোক ছিলাম।

কী জানি! আমি তো গলফ্ খেলি না। ও খেলে, ওই জানে!

ম্যাচ খেলার সময় আসো তো দেখতে ? তোমার স্বামী দুর্বার যখন খেলে ? চ্যাম্পিয়নশিপে ? তোমার স্বামীর নামটি ভারী পছন্দ আমার। কিন্তু মানুষটি একেবারেই তোমার আঁচল ধরা। সেদিক দিয়ে ওর নামটিও একটি ট্র্যাজেডি। কই বললে না, গলফ্ খেলা দেখতে আসো কি না ?

তা আসি।

কী দ্যাখো ?

মানে ?

ম্যাচ ? না কাঁচাপাকা জুলফির ছোট শর্টস-পরা নানা পুরুষের সুগঠিত পা।

অসভ্য আপনি।

আমি সবচেয়ে বেশি সভ্য। তোমাদের অভ্যেসের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে সাহায্য করি আমি। সত্যিকে স্বীকার করতে বড় ভয় তোমাদের। কী করবে না করবে—কী করা উচিত না উচিত ভাবতে ভাবতেই আঁজলা গলে তোমাদের জীবন গাড়িয়ে পড়ে যায়। যা বাকি থাকে তা একঘেয়েমি, হা হুতোশ, পেছন ফিরে তাকানো। জীবন এক ধরনের জলীয় পদার্থ। আঁজলা গলে গড়িয়ে

গেলে তা আর কুড়োনো যায় না। তারপর বেলা বাড়ে। বেলা পড়ে। কী দুরন্ত গতিতে যে আমাদের এই একটা মাত্র জীবন ফুরিয়ে আসে, তা ফুরিয়ে এলেই শুধু বোঝা যায়। বাইরে ধুলো ওড়ে। ধুলোয় খড়কুটো। আর তার মধ্যে ঘূর্ণীর মতো উপরে উঠে নাগালের বাইরে চলে যায় তোমাদের অতীত। আমাদের অতীত। সবাকার অতীত। যে অতীত তামাদি হয়ে গেছে! বড় দুঃখ হয় তখন। অথচ করার কিছুই থাকে না। দেখো। সুপুরুষের সুগঠিত পা দেখলে পাপ নেই। কিছুতেই পাপ নেই। পাপ নিজেকে বেঁধে রাখায়; নিজেকে কষ্ট দেওয়ায়। এই ছোট্ট জীবনে পরিতাপ করার সময় নেই। বাঁচো। প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচার মতো বাঁচো।

বড্ড মন খারাপ করে দেন আপনি, অমুদা।

মানুষেরই মন থাকে। এবং থাকে বলেই সে মন মাঝে মাঝে খারাপ হয়। যা-কিছুই সত্যি তার মধ্যেই মিথ্যেও সুপ্ত থাকে। কখনও সত্যিটা মন খারাপ করায়; কখনও মিথ্যেটা। কী করা যাবে!

দামুদা কিন্তু দলমা পাহাড়ে পিকনিক-এর বন্দোবস্ত করেছেন আপনার অনারে। রবিবারে।

তাই?

তুমিও যাবে তো? শ্রেয়া, শ্রমণা, জ্যোৎস্না, জয়িতা এবং তাদের স্বামীরা?

স্বামীরা যে আমাদের, আপনার সঙ্গে একা ছাড়বার মতো বুদ্ধিহীন এমন মনে করবেন না। তবে মজার কথা এই যে, আমাদের প্রত্যেকের স্বামীরাও আপনার প্রেমে পড়েছেন। এটা একটা ফ্যানটাসটিক ব্যাপার! এমনটি ঘটে না সচরাচর।

সে কী। সে তো ভালো কথা নয়। মন্দলোকে এর খারাপ মানে করতে পারে।

খুবই মজা লাগছে ভাবলেই যে, একটা পুরো দিন একসঙ্গে কাটানো যাবে আপনার সঙ্গে। দলমাতে।

তারপরই বললো, জানেন, সেদিন দলমা থেকে একটি হাতি নেমে হাইওয়েতে একটি মারুতি গাড়িকে চেপ্টে দিয়েছে। বাস তাড়া করেছে। পরে নাকি হাতিটাকে মারাও হয়েছে। কী অন্যায়।

তুমি বুঝি হাতি খুব ভালোবাসো?

খুব।

আমাকে কি হাতির মতোই ভালোবাসো? না তার চেয়ে একটু কম?

ইয়ার্কি ভালো লাগে না সবসময়। ভালোবাসার মতো সূক্ষ্ম একটা ব্যাপারের মধ্যে কবি হয়ে আপনার হাতি এনে ফেলতে লজ্জা করলো না?

আমার নাম ষষ্ঠীচরণ, যিনি হাতি লোফেন যখন তখন। জানি না, তোমরা সকলেই আমাকে হাতির মতো ভালোবাসলে কেন?

আমরাও ঠিক জানি না। কালকে শ্রমণার সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা হচ্ছিলো। সত্যি! আপনি একজন পূর্ণ মানুষ।

হাঃ। হাঃ। খুব জোরে হেসে উঠলো অমু ঘোষ। বললো, জোক্ অফ দ্যা ইয়ার ইনডিড্। আমার স্ত্রী রানীতো বলেন আমি একটি বিদূষক। ভাঁড়। এণ্টারটেইনার। ঐটুকুই আমার দাম। আর কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই আমার এ সংসারে। যদি বিদূষকের বা ক্লাউনের দরকার হয় কখনও, ডেকো তাকে। পূর্ণ পুরুষ! আর এখন মরলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। এই উপাধিটি আমার বুকে বাঁধিয়ে দিতে বোলো শ্রমণাকে।

মিথ্যে কথা বলেন বড়ই আপনি বানিয়ে বানিয়ে। মিথ্যে কথা বলাটাই আপনার অবসর বিনোদন। আপনি বিদূষক, এ-কথা কোনো মানুষই বলতে পারেন না। আপনার স্ত্রীতো নয়ই। আপনার মতো স্বামী পেলে যে কোনো মেয়েই···।

আমার স্ত্রী মস্ত বড় মানুষ। ভালো মানুষ। কবির এই কাছা-খোলা বাউণ্ডুলে অবাস্তব স্বভা বর কারণে তাকে অনেকই দুঃখ দিয়েছি। তাই হয়তো বলে। তবে আমি কবি। আমার জাত আলাদা। তাই কুজাত বা বজ্জাতও অনেকে বলেন। সত্যিটাকেও এমন সুন্দর করে বলি যে তা মিথ্যের মতো শোনায়। অথবা উল্টোটাও বলতে পারো। একজন গোলা-কাঁঠালের মহাজন বা কালোয়ারের কথার সঙ্গে আর একজন কবির কথার সঙ্গে তফাত তো কিছু থাকবেই! নাকি থাকবে না?

মোটেই না। আপনি সবসময়ই সুন্দর করেই বলেন। ঈশ্বরের দান এ। আপনার কথা।

দুর্বার তো চমৎকার ছেলে। কৃতী। বড়লোক। বড় চাকুরে। প্রাক্‌টিকাল। দায়িত্ববান। স্ত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সবসময়। তার তো হীনম্মন্যতা থাকার কথা নয় কোনোরকম, তারও আমাকে ভালোলাগার কারণ তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

সবই ঠিক। তবু।

অগ্নিশিখা, তোমার নিজের কখনও দুর্বার ছাড়া আর কাউকে ভালো লাগেনি? বিয়ের পর? কারো জন্যে একটু দুর্বলতা? না দেখতে পেলে মন খারাপ হওয়া? চিঠির জন্যে বারবার শূন্য লেটার বক্সে কারো চিঠির আশায় হাত ঢুকিয়ে নিজেকে অভিশাপ দাওনি কি কখনও? সত্যি করে বলবে?

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলো তোড়া। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বললো, আপনাকে মিথ্যে বলবো না। কারণ মিথ্যে বলা যায় না আপনাকে। অদ্ভুত বাজে লোক আপনি একটা! আপনি র‍্যাস্‌পুটিন!

কী বললে? র‍্যাস্‌পুটিন! হাঃ। হাঃ। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। একথা যদি কখনও সত্যি হতো!

তবে র‍্যাস্‌পুটিনের মতো হতে হয়তো সব পুরুষেরই সাধ যায়। তাতে তার যে-শাস্তিই হোক না কেন! কিন্তু আমি র‍্যাসপুটিন নই। হতে পারবো না কখনও। হতে চাইও না। হলে, বড় জোর হতে পারি কোনোদিন ডরিয়ান গ্রে। যে-মানুষের বিবেক, বাড়ির গভীরের ঠাণ্ডা অন্ধকার সেলারে

তার মুখের উপরে তার প্রকৃত চরিত্রর ছাপ এঁকে দিয়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে, নষ্ট হলেও নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে।

অগ্নিশিখা, এমন কে কবি আছে বলো যে, একা ঘরে নীরবে কেঁদে বলে না যে "প্রভু নষ্ট হয়ে যাই"। এমন কোন্ কবি আছে যে ঠোঁট কামড়ে নিজের দাঁতে তা রক্তাক্ত করে চোখের ধারা বওয়ায় না ? আমরা তো সব ভেতো বাঙালী ! এখানে পিকাসো, গঁগা, বোদলেয়র, সেজান, হুইটম্যান্, হেমিংওয়ে, রবার্ট ফ্রস্ট, এমনকি রিচার্ড বাখও নেই। সে রক্ত, সে স্বেদ, সেই রক্তক্ষরণের সাহস আমাদের কারোরই নেই। হবেও না আগামী পঞ্চাশ বছরে। হবে না, যতদিন এ দেশের মেয়েরা কবিদের যোগ্য মর্যাদা দেবে। তোমাদের জন্যেই একটি প্রজাতির পুরুষজাত পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলো। তবু শেষে বলি, র‍্যাসপুটিন হওয়ার বাসনা আমার নেই। যাইই পাই তাইই আমি গ্রহণ করি না। অন্যকে কষ্ট দিয়ে আমি কবি হইনি। অন্যের কষ্টকেই ফুল করে ফুটিয়ে তোলাই আমার সাধনা। সব কবিরই সাধনা।

এবার বলো, তুমি কি দুর্বার ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসোনি ? বিয়ের পরে ? তার কথা বলো, যার কথা বলছিলে।

একবারই হয়েছিলো। বম্বেতে। তখন বম্বেতেই থাকতাম। একটি পাঞ্জাবী ছেলে। ব্যাচেলর। ওদেরই কোম্পানির। "ভাবী" "ভাবী" করতো। এক সঙ্গে খেতে বসে আমার জন্যে মাছ, কী ভালো রান্না ; যথেষ্ট পরিমাণে রইলো কিনা তা দেখা থেকে আমাকে কোন্ শাড়িতে কেমন দেখায়, কোন জামা শাড়িতে। কোন্ ফুল যায়, এই সবই নজর করা প্রায় ওর প্রি অকুপেশানই ছিলো বলতে পারেন। অথচ দুর্বার কখনও কোনদিনও মাথা ঘামায়নি এসব ব্যাপার নিয়ে। সব স্বচ্ছল মানুষের জীবনই এখন যেমন হয়, গাড়ি, ভি সি আর, কালার টি ভি, ইত্যাদি ইত্যাদি ; প্রতি শুক্রবার বা শনিবারে পার্টি। আমার হাতে যখন যা চাই তা দেওয়া। এসবই দুর্বার করে। স্বচ্ছল ও সচ্চরিত্র স্বামীদের যে অন্য কোনো দোষ বা অপূর্ণতা থাকতে পারে, এমন কথা আমি কেন অন্য কোনো মেয়েই ভাবে না অমুদা। কারণ ভাবনার কোনো অবকাশই ঘটে না। সংসারের জাল এমনই। তবে যখনই একটু ফাঁক পাই তখনই একটি বই নিয়ে হয়তো বসি। বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগতো। আপনিও আমার প্রিয় কবি ছিলেন। আপনার কিছু কিছু কবিতা পড়ে মন বড় খারাপ হয়ে যায়। ঝড় ওঠে মনে। আপনি মানুষটি মানুষ হিসেবেও যেমন ডিস্টার্বিং কবি হিসেবেও তেমনই।

পাঞ্জাবী ছেলেটির কথা বলো। একটি সিগারেট ধরিয়ে অমু বললো।

ছেলেটির কাছে আমার কখনও কিছু চাইতে হয়নি। ও বুঝতে পারতো নিজে থেকেই, আমার কখন কী দরকার ! কখন আমার পারফ্যুম্ ফুরিয়ে গেছে, কখন আমার উইকএন্ডে একটু কাছাকাছি বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে করছে, কখন লং-ড্রাইভে যেতে ইচ্ছে করছে ও সবই বুঝতে পারতো। কখন আমার মাথা ধরেছে বা কখন আমি বিরক্ত হয়েছি তাও ও আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারতো।

ছোকরা নিশ্চয়ই খুব ফাঁকিবাজ ছিলো। দুর্বারের মতো অত খাটতে হলে আর পাংশ্রীর পরিশ্রম আর মাথাধরা নিয়ে নিজের মাথা খাটাবার সময় থাকতো না। কী বলো?

একদমই ভুল কথা। আর অমুদা, আপনি ওকে "ছোকরা" বলবেন না।

কেন?

"ছোকরা" কথাটার মধ্যে একধরনের অপমান এবং তাচ্ছিল্য জড়ানো আছে।

আছে বলেই তো বলেছি। প্রিসাইসলি, সেই কারণেই।

এটা অন্যায়।

একটুও নয়। যে তোমাকে ভালোবেসেছে সে আমার শত্রু। প্রয়োজনে তার সঙ্গে আমি ডুয়েলও লড়তে পারি।

হেসে উঠলো তোড়া জোরে। পথ-পাশের গাছ-গাছাল, চতুর্থীর চাঁদ নড়েচড়ে উঠল যেন হাসিতে। ঠিক সেই সময়ে একটা কালো বেড়াল হঠাৎ ডানদিক থেকে বাঁদিকে গেলো পথ পেরিয়ে সামনে দিয়ে।

ও মাঃ গো! বলে জড়িয়ে ধরল তোড়া অমুকে মুহূর্তের জন্যে।

তারপরই লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিলো।

বললো, বিচ্ছিরি। অলুক্ষণে। বাঘের মতো দেখতে। কীরকম ভুতুড়ে-হলুদ চোখ।

বুদ্ধদেবটা থাকলে ভালো হতো। অমু বললো।

ওঁরা তো আসবেন পঁচিশে শুনেছি। ছাব্বিশে কী একটি অনুষ্ঠানে।

হুঁ।

আমাকে ডাকেনি কমল।

উনি কি সত্যিই শিকার-টিকার করেছেন কখনও?

কার কথা বলছ?

বুদ্ধদেব গুহর।

জানি না। তবে ও নিজে বলে, শহরে শিকার হলো না বলে প্রায় শিশুকাল থেকেই বনে জঙ্গলে ঘোরে।

একটু চুপ করে থেকে বললো, কেন? তুমি বুদ্ধদেবের লেখার ভক্ত?

একদম না। এখানে কিছু বোকা বোকা মহিলা আছেন, তাঁরা খুব ভক্ত। আসলে সাহিত্যের কিসসু বোঝেন না।

এবারে আমার কথাটির উত্তর দাও। বুদ্ধদেব-ফুদ্ধদেব ভুষিমালের নাম এনে আমার কনসেনট্রেশান নষ্ট কোরো না। আমি কিন্তু সত্যিই ডুয়েল লড়তে পারি সেই ছেলেটার সঙ্গে।

তোড়া বললো হাঃ। আপনি আমাকে ভালোবাসেন একথা বিশ্বাস করবো? আপনি আসলে একটি ফ্লার্ট। সকলকেই আপনি দেখান যে, ভালোবাসেন। আপনি জীবনে একজনকেও ভালোবেসেছেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। আসলে আপনি নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

কী জানি! বুঝে উঠতে পারলাম না এখনও।

আমি ওকেও, মানে ঐ ছেলেটিকেও ঠিক ভালোবেসেছিলাম কিনা জানি না। জানেন অমুদা।

ভালোবাসা ব্যাপারটা তো এককথার নয়। কত্ব রকম থাকে ভালোবাসার। প্রত্যেক বিবাহিতা মহিলারই এক বা একাধিক প্রেমিক থাকা ভালো কিন্তু। সব দিক বিচার করেই বলছি।

জানি না। তবে ওর কথা এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়। চিঠিও লেখে বম্বে থেকে মাঝে মাঝে। আমাকে বলে, লিখলে যেন অফিসের ঠিকানাতে লিখি। এখন বিয়ে করেছে তো। স্ত্রী সব চিঠি খুলে পড়েন।

একবার লিখেছিলো, "ভাবী, ভেবেছিলাম বিয়ে যদি কখনও করি তো তোমার মতো মেয়েই বিয়ে করবো। আমার বৌ বাইরে থেকে চেহারা-ফিগারে প্রায় তোমারই মতো। কিন্তু আর কোনোই মিল নেই। জীবনটা বরবাদ হয়ে গেলো। ডিভোর্স করার মতো মনের জোর, সমাজকে তোয়াক্কা না করার জোর, আমার নেই। ছেলেটা এসে গেছে। ওর কী দোষ! ওর মুখ চেয়েই পারবো না। তবে সোনিয়া, আমার বৌ হয়তো পারবে। ওর চরিত্র নুড়ির মতন। পাহাড়ী নদীর নুড়ি। মাটি লাগে না। ঘাস, পাতা, কাদা কিছুই লেগে থাকে না তাতে। সে কোনোরকম পিছুটান ছাড়াই গড়িয়ে যায় নদীর স্রোতের সঙ্গে এক বাঁক থেকে অন্য বাঁকে। আমার স্ত্রীর এক প্রেমিক আছে। হরবিন্দর। ছেলেটা ভালো। বিয়ে করলে ও ও মরবে। সোনিয়া বহুলতো নদী। সোঁতা নয়। প্রেম করা এক আর বিয়ে করা অন্য। তবে ছেলেকে আমার কাছে রেখে দিতে রাজি থাকলে আমি কালই সোনিয়াকে ডিভোর্স দিয়ে দেবো। শুনছি, উকিলের বাড়ি যাওয়া-আসাও করছে। খবর শিগগিরই হবে। খবর হলে জানাবো। মন ভালো লাগে না। তোমার যে ফোটো কখানি আছে তাই মাঝে মাঝে একা বাড়িতে বসে দেখি। ভালো আছো তো ভাবী?"

ওর চিঠি পড়ে বড় মন খারাপ হয়ে যায়, আপনার কবিতা পড়ে যেমন হয়। জানেন, প্রত্যেক চিঠির শেষে ও লেখে; তোমার চিরদিনের খিদমদগার। ও উত্তীয় যেন আমার। আমি শ্যামা। একবার ওর এখানে, মানে জামশেদপুরে, ট্রান্সফার হয়েও আসার কথা হয়েছিলো। পরে শুনেছিলাম বলতে লজ্জা করছে কথাটা যে, দুর্বারই কলকাঠি নেড়ে তা বানচাল করে দেয়। আমার স্বামী আসলে উদার নয়। খুব কম স্বামীই উদার। ঔদার্যের মুখোশ পরে থাকেন সবাই।

বজ্রসেন কেউ আসেনি জীবনে তাহলে?

একটু চুপ করে থেকে বললো অমু। সিগারেটের ধুয়ো ছেড়ে।

নাঃ। যার জন্যে সব ছেড়ে ভেসে চলে যাওয়া যায়, তেমন পুরুষ এই জন্মে দেখলামই না! সে সব পুরুষ স্বপ্নেই থাকে। ভাগ্যিস।

সামনের বাড়িতে বোধহয় কোনো পার্টি-টার্টি আছে। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। অমু বললো।

বাঃ। এটাই তো হিতুদার বাংলো। আপনারই অনারে তো পার্টি।

আমার অনারে পার্টি কথাটা শুনলে কেমন সুড়সুড়ি লাগে।

তা লাগলেও কথাটা সত্যি। আপনি তো অনারেবল্ বটেই।

কারা আসছেন ?

তা হিতুদা নিশ্চয়ই অনেককেই বলেছেন।

এই রে।

কেন ? এই রে কেন ?

যাদের চিনি, শুধু এখানেই নয়, সবখানেই, তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে পারি না। সময়ের এতোই অভাব। সত্যিই অভাব। তাই জানা-চেনার পরিধি আর বাড়াতে ভালো লাগে না। অথচ জেনুইনলি আমি মানুষ জন ভালোবাসি। গল্প করতে মজা পাই। মানুষেরা, মনে হয় স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে আমাকে পছন্দও করেন। তবু শুধুই সময়াভাবেই গুটিয়ে রাখি নিজেকে। অন্যে, অসভ্য অসামাজিক এমন কী অভদ্রও বলেন। দুঃখও কম পাইনি জীবনে নানা জনের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ করতে মন চায় কিন্তু আমার অপারগতার কথা আমি জানি আর ঈশ্বরই জানেন। প্রতিবাদ করিনি, করি না কারণ, করলে অন্যকে আহত করা হয়। সব অসামাজিকতা, অভদ্রতা, অসভ্যতার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই বয়ে বেড়াই। এতোসব কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। কাউকে। বললেও বোঝে না কেউ। তোমাকে বললাম। হয়তো তুমি বুঝবে।

তোড়া দারুণ হাসি-খুশি মজার প্রাণবন্ত এই পুরুষটির বুকের মধ্যে কোথাও যে পাথর-চাপা কিছু আছে সে সম্বন্ধে বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে পারলো। এই প্রথমবার দুঃখও হলো মানুষটার জন্যে। যে-মানুষটা এখানে তিনচারদিন এসে ওঠার পর থেকে তার মধ্যে সম্পূর্ণতার সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন যাঁরাই মিলিত হয়েছেন তার সঙ্গে তার সত্তাও যে অখণ্ড নয় এ কথা জেনে মন খারাপ হয়ে গেলো। দুঃখ নেই, এমন মানুষই বোধহয় নেই। তবে প্রত্যেকেরই দুঃখের রকম আলাদা আলাদা।

ভাঙাচোরা আছে যে অমু ঘোষ-এর হৃদয়েরও ভিতরে একথা হৃদয়ে উপলব্ধি করে বড়ই মন খারাপ লাগতে লাগলো তোড়ার। আবার আনন্দও হলো। সকলের বুকেই যখন পাথর-চাপা দুঃখ থাকে তখন এই মানুষটাই বা অন্যরকম হবে কেন ? তোড়ার এবং অগন্য নারীপুরুষের দুঃখের সেও ভাগীদার হোক। তাছাড়া এতবড় কবি দুঃখ ছাড়া কবিতা লিখবেনই বা কি করে ? দুঃখ ছাড়া কি কিছু হয় ? তোড়া যখন গান গাইতো এবং মোটামুটি ভালোই গাইতো তখন একথা বুঝেছিলো। কখনও কখনও বাথরুমে গায় এখনও। নগ্ন শরীর, সাবান, শ্যাম্পুর ফেনা, খোলা কলের একটানা ঝরঝরানি, বাগানের বুলবুলির শিস তাকে যখন ক্ষণকালের জন্যে উন্মনা করে তোলে তখন তোড়া গান গায়। গান গাইবার পরিবেশ চাই। শোনবার মতো আগ্রহী মানুষ চাই। দুর্বার গান একেবারেই ভালোবাসে না। এমনকি ওর সামনে কেউ গান গাইলে ও বিরক্ত হয়।

মনে পড়ে গেলো তোড়ার, ওদের বাড়ির বেডরুমের দরজায় চাপা পড়েছিলো একটি টিকটিকি। সে তিল তিল করে দেওয়ালের একই জায়গাতে ঝুলে থেকে শীর্ণ হতে হতে হতে একদিন প্রায় উবেই গেল। তেমনই গেছে তোড়ার গান।

হঠাৎই, একেবারেই হঠাৎ, বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছাড়াই বুকের মধ্যেটা দুমড়ে উঠলো তোড়ার এই দীর্ঘদেহী, অসুন্দর মানুষটির জন্যে। হিতুদার বাড়ির সামনে পেঁছে গেছে এখন ওরা। মধ্যে থেকে অ্যালসেশিয়ান ডাকছে গম্ভীর গলায় ঘাউ ঘাউ ঘাউ করে। গেটেও কুকুরের ছবি। লেখা আছে 'Beware of Dogs' বিখ্যাত কবি অমু রায়ের মুখের দিকে মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের কৃত্তিম বাদামী ঔজ্জ্বল্য এবং মানুষের পদদলিত চাঁদের ম্লান নীলচে আলোয় তাকালো তোড়া একবার। তারপর বললো, চিঠি লিখলে চিঠির জবাব দেবেন তো? অমুদা?

ঘোর ভেঙে অমু বললো, নিশ্চয়ই। আমি প্রত্যেককেই জবাব দিই চিঠির। তোমাকে দেবো না? তবে লেখার কিছু থাকলেই লিখো।

"আমি ভালো আছি। আপনি কেমন? এখানে গরম পড়িতেছে। নমস্কার জানিবেন।"

এইরকম লিখো না।

যদি ভালো থাকো তো কতখানি ভালো আছো এবং কতখানি নেই এবং কেন নেই তাও জানিও। যদি গরম পড়ার কথা লেখো, তাহলে পলাশ শিমুল ফুটলো কিনা এবং কোকিল ডাকছে কিনা তাও জানাতে ভুলো না। কথা সাজালেই চিঠি হয় না; হৃদয়ের পাঞ্জার ছাপও যেন তাতে থাকে। বুঝেছো!

অমু ঘোষের ডাইরি

সব গোলমাল হয়ে যায়। মন যা বলতে চায়, মুখ তা বলে না। তবু যত কথা তা, মুখই বলে। সারাদিন।

বিষ্ণু দের বই ছিলো না। "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার"। আমি নাম রেখেছি অগ্নিশিখা। কোনোদিন একটি কবিতা লিখবো। অগ্নিশিখা তোমাকে নিয়ে।

বেশ লাগলো অনেক অনেকদিন পর চাঁদের আলোয় নানা ফুলের গন্ধ ভরা পথে কারো পাশাপাশি হাঁটতে; এমন মানুষ, যে নিচু স্বরে কথা বলে, যাকে দেখে মনে হয় সে উচ্চস্বরে কর্কশভাষায় কখনও ঝগড়া করতে জানে না। যে গরমের দুপুরবেলায় তার পুরুষ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে তাকে বড় গাছের মতো ছায়া দেয়। কলাই-এর ডাল, ঝিঙে-পোস্ত আর সুক্‌তো রেঁধে খাওয়ায়। আর শীতের রাতে যে বিরিয়ানি পুলাউ আর বটি কাবাব তৈরি করে অম্বর আতর লাগানো ফল্‌সা রঙ মালিদার নিচে নিজের শরীরের সব উষ্ণতাটুকু জিইয়ে রেখে অপেক্ষা করে, দুয়ার-দেওয়া ঘরে রাতের খেলার সাথীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হবার জন্যে।

বেশ বলেছিলো অগ্নিশিখা।

বিয়েটা একটা চুক্তি। এগ্রিমেন্ট। সব মেয়েই অবশ্য বলে একথা। ছেলে মেয়ে এসে যাওয়ার পর তা আর ভাঙা যায় না।

কথাটা ঠিক। অমুও বিশ্বাস করে কথাটা। তবে উইলেরও "কোডিসিল" হয়। উইলও তো একটা চুক্তি। নিজের সঙ্গে নিজের। এগ্রিমেন্টের সংশোধনী হয়। পুরোনো দলিলকে না ছিঁড়েও। এ-কথাটা নিজে যতটা বোঝে অন্যেকে ততটা বোঝাতে পারে না। বোঝাতে চায়ও না। জোর করে কাউকে কিছু বোঝানো উচিতও নয়। যে যতটুকু বোঝে, তার পক্ষে যা ভালো বলে বোঝে; সেটুকু বোঝাই ভালো। নইলে বোঝা, ভারী বোঝা হয়ে ওঠে।

বেশ মেয়েটি অগ্নিশিখা। বুদ্ধিমতী। কিন্তু সেই বুদ্ধি প্রকাশের জন্যে কোনো ছটফটানি নেই। বুদ্ধিমানের চোখে বুদ্ধি চাপা থাকে না। ধরা তাকে পড়তেই হয়।

জমাটি শীত। বাইরে এখন গোলমুড়ি ক্লাবের পাহাড়ের সমান উঁচু ভিতরে বড় ক্লাব হাউসের চত্বরে বড় বড় গোল আলোর মালায় মনে হচ্ছে যেন গোয়ালিয়রের রাজপ্রাসাদ। বাড়িটা চমৎকার। বন্দোবস্তও চমৎকার। কিন্তু হলে কী হয়! যে মানুষদের ভার একে সুষ্ঠুভাবে চালানোর, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করেন না। বেয়ারা থাকে না। বাবুর্চি থাকলেও খারাপ রান্না করে। নিয়মানুবর্তিতা আছে ঘড়ির কাঁটাতেই শুধু। চরিত্রে নেই; উদ্যমে নেই। মানুষই এক একটি দেশের চরিত্র, সুস্থতা, সাচ্ছল্য নিরূপণ করে।

সেদিন গোপেন এই ক্লাবেই ডিনার খাওয়ালো অনেককে। রবি মুখার্জী ও ডঃ গৌতম দাশগুপ্তকে সস্ত্রীক বলেছিলো আসতে। আরো অনেককে। আমাকে তো বলেছিলোই। অর্ডার করেছিলো চিকেন ফ্রায়েড রাইস, বোনলেস চিকেন আর কী কী যেন। একজন বার-বেয়ারা মেক-শিফ্‌ট বার-এ দাঁড়িয়ে হুইস্কী খেয়ে নিজেই 'আউট' হয়ে গেলো। খাবার যখন সার্ভ করলো তখন চক্ষুস্থির হয়ে গেলো। এমন চিকেন ফ্রায়েড-রাইস আর বোনলেস-চিকেন পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই খাইনি। এমনকি আমার সেজপিসীর মতো পৃথিবীর খারাপতম রাঁধুনীও পরম চেষ্টাতেও অমন বিচ্ছিরি রান্না করতে পারতেন না। বেচারা গোপেন! মুখ কালো করে বসেছিলো। পুরো নীলডি এবং গোলমুড়ি ক্লাবের ইজ্জত রক্ষার ভার যেন ওরই একার! ও বেচারা কী করবে! সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে গেছে। এই ভূত ছাড়াবার ওঝার দরকার সারা দেশে। কবে যে সে আসবে! এই পার্টিতেই কল্যাণ আমার হাতে আড়ালে ডেকে একটি কবিতা দিলো।

কোথাও কি ছাপাতে বলতে হবে?

না, না। আপনারই জন্যে। এমনিই।

কবিতাটি গোলমুড়ি ক্লাবের বারান্দাতে দাঁড়িয়েই পড়ে ফেললাম। অভিভুত হয়ে গেলাম।

কবিতার নাম দিয়েছে "ঝড়"।

"এখানে ভীষণ খরা, প্রচণ্ড গরমে
সকলের ওষ্ঠাগত প্রাণ।
একঘেয়ে গুমোটের চাপে
শত্রু কুকুরেরা স্বরে স্থবিরতা পেল।

নিথর গাছের পাতার মত
ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলো স্থির হয়ে আছে,
চাইবার কিছু নেই, দেবারও না কিছু—
একঘেয়ে বিষণ্ণতা, দুঃখ নিয়ে দিন।
এমন সময় সে এলো ঝড়ের মত!

হাওয়ার দাপটে গাছগুলো টলোমলো,
ধুলো ওড়ে, চারিদিক আবছা আঁধার।
শত্রু কুকুরেরা এ ওর ঘাড়ে পড়লো ঝাঁপিয়ে;
নিস্তব্ধতা ছারখার হলো অজস্র শীৎকারে।

তবুও এ ঝড় চিরস্থায়ী নয়।
যেমন এল আচম্বিতে তেমনি চলে যাবে
অন্য একদিন, অন্য কোনো দিকে হাওয়া দেবে
শুকনো আরে ধূসর প্রান্তরে।

শুধু এরপর বৃষ্টি যেন আসে—
গুমোটের পাতাগুলো ঋতুস্নান সেরে
স্পন্দন এনেছে দ্যাখো ফসিলিত গাছে
শিকড়েরা সব যার যার গহ্বরে নেবে গেছে।'

এই ঝড় কি অমু নিজে? ভেবে, নিজের মনেই খুশি হলো খুব। এবং একটু শঙ্কিতও যে হলো না এমনও নয়। ব্যস্ত ডাক্তার অথচ কবি। পুলিশ অথচ ভদ্রলোক। ভাবা যায় না!

ঘুম পাচ্ছে বড়। যোগেন আর রিতার বাড়িতে অনেকই রাত হয়ে গেলো। মালুরো নামিয়ে দিয়ে গেলো। খাদ্য পানীয় দুইই বেশি হয়েছে। ভালো ঘুম হবে না। এবং না হলে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখব।

কিন্তু কাকে?

অগ্নিশিখাদের বাড়ির আউট হাউসের সামনে চড়ে-বেড়ানো লোম-উঠে-যাওয়া লাল মুরগিটাকে? না, ছবির বসবার ঘরে টাঙানো অস্ট্রিয়ার টিরল্ প্রভিন্স এর নিসর্গ দৃশ্যকে? নাকি কোনো রক্তমাংসের নারীকে? কাকে?

স্বপ্ন না দেখাই ভালো। কোনোরকম স্বপ্নই। কারণ, মনে থাকে না। সুন্দর স্বপ্নগুলিও মুছে যায়। অথচ স্মৃতি থেকে যায় বুকে অস্পষ্ট ব্যথা হয়ে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বারান্দার চেয়ারে বসে রোদ পোয়াচ্ছি। টেনিসের হাড কোর্টের পাশের ঝাউবনে বুলবুলি শিস দিচ্ছে। এমন সময় গবু এলো আমার ডিসট্যান্ট কাজিন।

বউ কোথায় ?

তৈরি হচ্ছে। এক ঘণ্টা টাইম দিয়ে এসেছি। যাবার সময় তুলে নেবো।

যাবি কোথায় ?

আজ শনিবার যে ! গবু বললো। চলো অমুদা, আজ লাঞ্চ খাবো মা আর ক্রিকেট দেখব। দারুণ ম্যাচ আজ।

কার সঙ্গে কার খেলা ?

ফাদার্স ভার্সাস সানস্। লিমিটেড ওভারের খেলা, লাঞ্চ এ বিরিয়া অ্যাণ্ড বীয়ার। তুমি আমার গেস্ট। অবশ্য আরও অনেকের সঙ্গেই দেখা হ যাবে।

চলো বেরিয়ে পড়ি। বাজারে গিয়ে পান খাওয়াই তোমাকে। তারপ ওষুধও কিনতে হবে। টেল্কো দেখেছো ভালো করে ?

আমার দেখার উৎসাহ নেই।

কেন ?

অনেক দেখেছি। সব দৃশ্যই মনে হয় আগে দেখা। সব দ্রষ্টব্য।

নতুন কিছু দেখাতে পারিস যা কখনও দেখিনি ? যা দেখে অন্য কো কিছুর কথা মনে হবে না ?

মনে মনে বললাম, 'কোনো গাছ, ফুল, পাখি বা নারী ?

না। ওষুধ তো কিনতে হবে। নাকি ? ফোনে বললে যে !

হ্যাঁ।

এতো ওষুধ খাও কেন ?

এও এক অভ্যেস। চাকরির মতো। বিবাহিত জীবনের মতো।

ভুপেনবাবু কি বলেন জানো ?

কে ভুপেনবাবু ?

আরে ভুপেনবাবু গো ! দে'জ মেডিকেলের।

ও। তা কী ? কী বলেন ? কী ব্যাপারে ?

যেমন ওষুধ তৈরি করার সময় লিখে দেওয়া হয় ম্যানুফাকচারিং ডেট অ এক্সপায়ারি ডেট আমাদের যিনি বানিয়েছেন তিনিও ওমান তারিখ লি দিয়েছেন অদৃশ্য কালিতে, কপালে। যেদিন যাবার সেদিন যেতেই হবে।

অমু হেসে উঠলো। বললো, বেশ বলেছেন। হক্ কথা।

দুতিনটি গাড়ি আসার শব্দ হলো গোলমুড়ি ক্লাবের গেট পেরিয়ে।

গবু বললো, বাঃ বাঃ। এযে দেখছি লেডিজ স্পেশ্যাল। তুমি দেখা অমুদা ! মেয়েরা তোমাকে এতো পছন্দ করে কেন বলোতো ? এই বয়সেও ?

শোন্ গবেট! শুধুমাত্র মেয়েরাই নয়, মেয়েদের স্বামীরা এবং বাবারাও করে নইলে তাঁদের অমতে কি আর এঁরা আসতে পারতেন? তবে পছন্দ. মেয়েরা আমাকে আদৌ করে না। আমিই মেয়েদের পছন্দ করি। বললে কি হবে, তোদের মতো কাঠখোট্টারা তো গান, সাহিত্য, ছবি এ সবের কদর করিস না। একদিন যা ছিলো কিন্তু আজকের এই গরিব নিগুর্ণ, রোজগারহীন, নিরূপ বেকাঠ কবিরও কিছু দাম যে আছে এতো মায়েদের, স্ত্রীদের, বোনেদের কাছে তা, নিজচোখ দেখে রাখ! পাখিপিসীকে চিঠি লিখিস যে তাঁর বকা ভাইপো টাকায় নেই। তোর মতো অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হলে কী হয়। নিজের বৌকে আজ দুধেভাতে রাখতে পারি না বটে অন্য অনেকের বৌ-মেয়েরা এই পোড়াকাঠ কবিকে অশেষ খাতির যত্ন করে।

তাইতো দেখছি।

জীবনের হিসাব ঠিকই মেলে। বুঝলি গবু। একদিকে কম থাকলে অন্যদিকে বেশি হয়। যাকে বিধাতা মেধা দেন না, তাকে সিধে দেন কুলীন ব্রাহ্মণের মতো। যাকে রূপ দেন না, গুণ দেন কিছু। কনসোলেশান প্রাইজ হিসেবে। যাকে অর্থ দেন না তার উপরে যশ ছিটিয়ে দেন সামান্য। পূত গঙ্গাজলেরই মতো। আমাকে ঈর্ষা করিস না। তোর বৌদির নিরন্তর গঞ্জনা-বাক্য, তাকে সুখে না-রাখতে পারার অনুযোগ, অভিযোগ, যদি এই সব ভালো মানুষদের (তার মধ্যে তোর স্ত্রী ও পড়েন) অকৃত্রিম স্বার্থহীন ভালোবাসার সামান্যসময়ের জন্যেও পূর্ণ হয়ে ওঠে তাতে নিজের চোখ টাটান না। কবিরা বড় দুঃখীরে। সব কবিই! সব গাইয়েই। সব শিল্পীই। দুঃখের সঙ্গে ঘর করারই আরেক নাম শিল্পসৃষ্টির পরিবেশ। এই দুঃখটার রকম, নানা রকম। কারো দুঃখ ভাত কাপড়ের। কারো দুঃখ অন্য কিছুর। এই অন্যকিছুর রকমও অনেক। তবে দুঃখটা খাঁটি হওয়া চাই। দুঃখ খাঁটি না হলে কবিতা বা ছবিও জাল হতে বাধ্য। কবিদের হো হো হাসি আর ক্বচিৎ বেলেল্লাপনার কথাই ফেরে তোদের মুখে মুখে। তার প্রাত্যহিক একাকীত্ব, তার গভীর দুঃখ তাকে যে প্রতিক্ষণ ক্যানসারের মতো কুরে কুরে খেয়ে যায় নিঃশব্দে, এটা খুব কম মানুষই বোঝে। আমার মতো একজন মধ্যবয়সী, আর্থিক দিক দিয়ে অসফল, নিরূপ নিগুর্ণ লোককে ঈর্ষা করলে ঈশ্বর তোকে ক্ষমা করবেন না গবু, এ কথাও বলে দিলাম।

আর লেকচার দিও না তো। এই জন্যেই আমি এই আর্ট-কালচারের লাইনের লোকগুলোকে অ্যাভয়েড করি। চলো, বললাম রোদে বসে বীয়ার খাই। ভালো লাগলো না। শুরু করলে মনুমেন্টের তলার লেকচার। একী! অমুদা! তোমার চোখ ছলছল করছে যে। একী ছেলেমানুষী করছো?

অমু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আমি যে কবি। তাই। আমি তোর মতো বিচক্ষণ অ্যাকাউন্ট্যান্ট নই। তাই। তোরা আমাদের বুঝবি না। বুঝবে, ঐ যারা আসছে ঐ শ্রেয়ারা, শ্রমণারা, জয়িতারা।

কেন?

মেয়েদের মনের গড়নটাই অমন। নরম। স্পর্শকাতর। ভালোবাসা কাঙাল। যতই ভালোবাসা থাক না এই নিগর্ুণের ভাণ্ডারে। ওরা যেমন বেগুন বা মাছ কেনার সময়ও বেছে কেনে, ভালোবাসার বেলাতেও ওরা বাছাবাছি করে। বেগুনে বেগুন-পাতুড়ি হয় বলেই যে-কোনো বেগুনে পাতুড়ি রাঁধতে রাজি হয় না ওরা। ভালোবাসার স্বীকৃতিও মেয়েরা যেমন করে দিতে জানে তেমন করে আমরা পারি না। সে জ্বরগ্রস্থ কপালে হাতের পাতা ছুঁইয়েই হোক কী কিছু রান্না করে খাইয়েই হোক বা এক কলি গান শুনিয়েই হোক। মেয়েরা না থাকলে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, সব ফুল, সব পাখি, সব সৃষ্টি অনাদৃত হয়ে মাটিতে লুটোতো। ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন সাহিত্য-কলা-সংগীত সমালোচক বাস করেন। যাঁরা শুধু ওঠানো-নামানোর সমালোচনায় পারদর্শী দুরভিসন্ধিসম্পন্ন সমালোচক, ওরা তেমন সমালোচক নয়। সৎ সমালোচক।

কি গো! তোমরা সকলে মিলে এই সকালবেলা চড়াও হলে? ব্যাপার কি?

অমু বললো, ওদের সকলকেই একসঙ্গে।

কালকের পিকনিক-এর কথা মনে করিয়ে দিতে এলাম। আপনার য ডিম্যাণ্ড দেখছি এখানে, হয়তো মনেই থাকবে না। ডাইরীতে লিখে রাখুন দাজুদার অর্ডার।

খুবই মনে আছে। যতদিন জামশেদপুরে আসছি ততদিন থেকেই দলমা পাহাড়ে যাবার ইচ্ছে। শুনেছি, সুন্দর বাংলোও আছে উপরে। পূর্ণিমার আগের দু'তিনদিন যদি কখনও থাকা যেতো! বড় দলে নয়। খুব কম লোকের সঙ্গে। গান শুনতাম। আর কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। হবে না কখনও, না? এ জীবনে? জীবনের বাকিও তো খুব বেশি নেই।

বড় বাজে কথা বলেন। জয়িতা ধমকে বললো।

চেষ্টা কেন? কবিতা লেখার?

শ্রেয়া বললো।

চেষ্টাটুকুই তো সার। কবিতা তো আর রসগোল্লা নয় যে ইচ্ছে করলে বানিয়ে ফেলা যায়। অনেক অনেক কাগজ ছিঁড়ে, অনেক অনেক শব্দ ও লাইন কেটে তবেই একটি কবিতা হয়। তাও নিটোল কবিতা নয়। নিটোল কবিতা এখনও একটিও লেখা হয়নি পৃথিবীতে। হয়তো কখনও হবে।

সরী অমুদা। জয়িতা আবার বললো, বাংলোর রিসার্ভেশান পাওয়া গেলো না। এ যাত্রা থাকা হবে না দলমাতে। আপনি ধূমকেতুর মতো এলেন আর চলেও যাবেন। এতো শর্ট নোটিস্-এ হয় না। তাছাড়া, পরপর ছুটি পড়েছে তো। আমরা এমনিই পাহাড়চুড়োয় গিয়ে পিকনিক করবো।

তাতেই আমি খুশি।

অমু বললো।

তারপর বললো, আমি তো ধূমকেতুই। তবে ক্ষতিকারক নই। এইটুকুই তফাত।

ছবি বললো, কখনও আগে জানিয়ে এলে···

আগে আমি নিজেই জানতে পাই না। মনের মধ্যের মন কখন যে কোন-দিকে আমাকে টানে, তা জানতে পেলে তো গবুর মতো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টই হতাম। ওহো! তোমাদের সঙ্গে ওর আলাপই করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার পিসতুতো ভাই। লতায়-পাতায়।

আছে। আছে। টেলকো এবং টিনপ্লেটের সবাই সবাইকে চেনে। মানে, বিশেষ করে নীলডিতে যাঁরা থাকেন। মালু বললো। তারপর বললো, পিসতুতো ভাই থাকতে আপনি ক্লাবে বন্দোবস্ত করতে বললেন যে! আমাদের কারো বাড়িতে তো থাকলেনই না!

পিসতুতো ভাই থাকলেও থাকতাম না। কোনো পরিবারের মধ্যে থাকলে স্বাধীনতার অনেকখানিই জমা দিতে হয়। আর স্বাধীন হতেই তো আসা!

একে তো চিনলাম না।

অমু বললো।

ছবি বললো, চেনবার জন্যেই তো নিয়ে এলাম। খুব ভালো গান গায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত। ওর নাম মোমা।

আমি আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। আপনার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' পড়ে। আপনি জবাবও দিয়েছিলেন।

মোমা বললো, অমুকে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খুব সুন্দর চিঠি লেখো তুমি। আমার কবিতার চেয়েও ভালো।

ছবি বললো, আপনি গান ভালোবাসেন তাই আমি জোর করেই ধরে আনলাম ওকে। গান শোনাবে। লজ্জা পাচ্ছিলো আসতে।

শোনাও।

শোনাবো? বলেই, মোমা গান শুরু করলো।

অবাক লাগলো অমুর। খালি গলায় এক কথাতেই গান শুরু করার মতো মেয়ে আগে কখনও দেখছে বলে মনে পড়লো না। মেয়েদের যত লজ্জা সব গানের বেলাতেই। গানটি আগে শুনেছে বলেও মনে পড়লো না। চমৎকার গলা। খুঁতহীন গায়কী।

"সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে—
গান হায় ডুবে যায় কোন কোলাহলে॥
পাষাণে রচিছে কত কীর্তি ওরা সবে বিপুল গরবে,
যায় আর বাঁশি··· পানে চায় হাসিছলে॥
বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি,
তুমি শোনো মোর গানখানি॥
আঁধার মথন করি যবে লও তুলি গ্রহতারাগুলি
শোনো যে নীরবে তব নীলাম্বর তলে॥"

বাঃ। কার কাছে শেখো তুমি?

বাড়িতেই শিখি। আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে।

তাঁকে আমার নমস্কার দিও। আর তোমাকেও ধন্যবাদ, গান বাছার জন্যে। এই শীতের সকালে যদি তুমি হঠাৎ কোনো বর্ষার গান গেয়ে বসতে তবে তোমার গলা আর গায়কীর কোনো দামই থাকতো না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে গান নির্বাচনও শিক্ষার মধ্যে পড়ে। তাই না?

মোমা মাথা নাড়ল।

গবু বললো, আমিই অমুদার একমাত্র আত্মীয় জামশেদপুরে। এখানে এসেছে, লোকমুখে শুনেছিলুম। কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা আমার দাদাকে এমনই গায়েব করে দিলেন গুপ্তধনের মতো যে, তাকে খুঁজে বের করতেই আমার পাঁচদিন লেগে গেলো।

ওরা সকলে হেসে উঠলো।

অমু বললো, এমন আত্মীয়কে তোর অস্বীকারই করা উচিত। আসলে কী জানিস? যারা আত্মার কাছে থাকে তারাই হলো প্রকৃত আত্মীয়। তোর সঙ্গে রক্তসূত্রের আত্মীয়তা। প্রত্যেক মানুষ কচুরিপানার মতো জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে যাদের সঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে তারাই হয়ে যায় আত্মীয়। আর রক্তর আত্মীয়রা দূরে সরে যায়। এটাই নিয়ম।

আমরা ওঁকে গায়েব করিনি। উনিই গুণ করেছেন আমাদের।

ছবি বললো, পুরোনো কথার জের টেনে।

এই পোড়াকাঠে যে এমন অসীম ক্ষমতা রাখে আমাদের অমুদা, তাতো আগে জানা ছিলো না।

গবু বললো।

অমু হেসে বললো, না দেখলে তো বিশ্বাস করতিস না। তোদের পাড়ার অনুরাধাকে মনে আছে? তাকে নিয়ে কলেজ স্ট্রীটের কফি-হাউসে কী দামামাই না বাজতো ছেলেদের বুকে বুকে! অনুরাধাকে নিয়ে কলেজের দিনগুলোতে কতো কবিতাই লিখেছিলাম। আর সে বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে বলে আমাকে বিয়ে তো করলোই না এমনকি কোনরকম পাত্তাই দিলো না। আজ সে থাকলে এই কবির মান-সম্মান-দাপট দেখে কেমন আঙুল কামড়াতো বল?

সকলেই অমুর কথায় হেসে উঠলো।

গবুও কথায় কম যায় না। বললো, তোমাকে বিয়ে করেনি বলে অনুরাধা হয়তো আঙুল কামড়াতো কিন্তু তোমাকে বিয়ে করেও তো আমার রানীবউদি কম আঙুল কামড়াচ্ছে না। সে খবর তো আমরা রাখি।

হো হো করে হেসে উঠলো অমু। এবং অন্য সকলেও।

অমুর হাসিটা শুধুই হাসি ছিলো, না তাতে কান্নাও মিশেছিলো; তা ঠিক বোঝা গেলো না।

ছবি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়েছিলো অমুর মুখে।

ভালো বলেছিস। অমু বললো। বেচারী রানী। ওর কপালটাই মন্দ। নইলে এমন ছন্নছাড়া কবিকে কেউ ভুলেও বিয়ে করে?

ছন্নছাড়া তো ছিলে না। নিজেই হয়েছো। দুঃখ সেটাই।

অমু লজ্জা পেলো অত লোকের সামনে কথাটা গবু বলাতে।

বললো, আর্থিক অবস্থার হের-ফেরতো হয়ই! আজ যে ছন্নছাড়া, কাল সে আমীর, আজ যে আমীর কাল সে ছন্নছাড়া। গবুরে, গবেট ; আমার দেবী যে লক্ষ্মী নন, তিনি যে সরস্বতী। তাঁর মুখ চেয়েই সব সয়ে নিয়েছি। তাছাড়া ছন্নছাড়ার সুখের রকমটাও তো নিজ চোখেই দেখে গেলি তুই।

গবু বললো, এবার চলো উঠি। বউ তো তৈরি হয়ে বসে থাকবে। আমার বাড়িতে একদিন যাবে তো, না কি? নইলে আমার বউয়ের কাছে কিন্তু বে-ইজ্জৎ হয়ে যাবো। ইতিমধ্যেই বলেছে, এতো বড় কবি! উনি তোমার ভাই না ছাই।

বড় কবি যে তা জানলো কি করে?

বাঃ। বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপনে তোমার নাম বেরোয় যে।

তবে তো নির্ঘাৎ বড় কবি! ঠিকই ধরেছে। তা নিশ্চয়ই যাবো। কী যেন নাম তোর বউয়ের? জ্যোৎস্না, না?

থাক। নামটা তাও মনে রেখেছো এ-কথা শুনলে জ্যোৎস্না খুশি হবে।

এখানে অনেক জ্যোৎস্না আছে।

জয়িতা বললো।

থাকবেই। চাঁদ থাকলেই জ্যোৎস্না থাকবে। এবং অনেকই থাকবে। আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই।

মালু বললো।

তা চাঁদটা কোথায়?

গবু বললো। অমুদাকে যদি আপনারা চাঁদ বলেন, বলতে হবে আপনাদের চোখের গোলমাল আছে।

শ্রমণা বললো, চাঁদ দেখার চোখ সকলের থাকে না। কবিতাও কি সবাই বোঝে? বিশেষ করে আধুনিক কবিতা?

গবুও হিসেবরক্ষক। সহজে ছাড়বার পাত্র মোটেই নয়। সে বললো, কবিতার রস আমিও এক-আধবার চিপে খেয়ে দেখেছি। সেটি সুপানীয়ের মধ্যে আদৌ পড়ে না। বাসকপাতার রসের মতো লাগে অনেকটা। "আধুনিক কবিতা" পাগল ছাড়া কেউ লেখে না। পাগল ছাড়া কেউ পড়ে না। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করবো যে, কবির রস কোনোদিনও খেয়ে দেখিনি। তাও আমার এই দাদাটির মতো পোড়া-কাঠ কবির। চেলাকাঠের রস কেমনই বা হতে পারে? চিরতা-টিরতার মতই হবে।

বাঃ। কে বলবে যে তুই অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তোর তো বেশ রসবোধ আছে রে গবু!

না থাকার কি? রসের একচেটিয়া ইজারা তো টিনপ্লেট কোম্পানি বা জামশেদজী টাটা তোমাকেই একমাত্র দিয়ে যাননি।

গবুর কথায় সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

তারিখটা কবে? মানে আমার বাড়িতে খাওয়ার তারিখটা? এখুনি ফাইন্যাল করো। গবু উঠে দাঁড়িয়ে আঙুলে গাড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বললো।

সেটা সম্বন্ধে তুই ছবি আর জয়িতার সঙ্গে কথা বলে নে। আমার লোকাল গার্জেন হলো ছবি। কিছুটা জয়িতাও। ওরাই বলতে পারবে ব্রেকফাস্ট অথবা আফটারনুন টী অথবা লাঞ্চ কিংবা ডিনার কোন্ সময়ে আমি ফ্রী? আমি এখানে ভি-ই-আই-পি। কতজন এ. ডি. সি দেখছিস না!

তাহলে আপনারাই বলুন। একটু আহতস্বরেই বললো গবু। আমার কিন্তু সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার স্ত্রীকে এবারে গিয়ে না নিয়ে এলেই নয়। তারপর অমুদাকে নিয়ে যাবো।

কোথায় নিয়ে যাবেন ওঁকে?

মাঠে। ফাদারস ভার্সাস সানস্ ক্রিকেট ম্যাচে।

সে তো আমরাও যাবো। এখনও তো দেরি আছে।

তা আছে। কিন্তু ভেবেছিলাম, দাদাকে একটু টেলকোর টাউনশিপটা দেখাতে নিয়ে যাবো।

দেখাবেন কাকে? সেদিন রাতে নির্জনে ডিনার খাওয়ার জন্যে 'হাড্‌কো' লেক-এ নিয়ে গেছিলাম আমরা অনেকে মিলে। অমুদা বলেছিলেন বেশ ফাঁকা জায়গায় জঙ্গলে বসে একটু গল্প করবেন। আমাদের স্বামীদের সঙ্গে একটু গা-গরম করে নিয়ে তারপর ওই হ্রদের পাশেই ডিনার।

ছবি বললো।

তারপর?

তারপর আর কি? আমাদের সকলের তো বটেই, পুরো টেলকোরই ইজ্জৎ উনি মাটি করে দিলেন।

কেন?

বললেন কি জানেন?

ছবি চোখ বড় বড় করে বললো।

কি?

বললেন, একী হিতু! তুমি কি না শেষে এই শীতের রাতে একটি কমোডের পাশে নিয়ে এলে আমাকে তোমাদের বিউটি-স্পট হ্রদ দেখাবে বলে! আর এ কী রকম জঙ্গল! চার পাঁচ গাছা গাছ লাগানো শুধু।

ওঁর কথা শুনে আমরা সকলে হেসে বাঁচি না। দুঃখও হলো। আমাদের 'হাড্‌কো'র এমন অসম্মান কেউই করেননি আগে।

গবু বললো, আপনারা বউদি, মেনে নিলেন কেন অমুদার কথা? যা-তা বললেই হলো! একবার দিনেরবেলা গিয়ে দেখোতো! ক'পাত্র চড়িয়ে ছিলে 'হাড্‌কো' দেখার আগে সেটা বলো?

ছবি ও অন্যান্যরা গবুর কথা বলার ধরনে একটু যেন ব্যথিত হলো। মনে হলো ভাবটা যেন, ভাই হতে পারেন; কিন্তু গুণীর সম্মান দিতে জানেন না।

এবারও অম্বু কিন্তু জোরে হেসে উঠলো। বললো, গুণে মদ যারা খায়, তারা তোর মতো অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। কবি নয়।

গবু হেসে উঠলো। তারপর পা বাড়িয়ে বললো, আমি তাহলে এগোই।

জয়িতা বললো, হ্যাঁ। ওখানেই দেখা হবে। ওঁকে আমরাই নিয়ে যাবো।

গবু, যাব বলেও গেলো না। এতোজন সুন্দরীর সঙ্গ ছেড়ে কারই বা যেতে ইচ্ছে করে ?

না। তোমাদের সঙ্গেও আমি যাবো না। তোমরা সবসময় এমন খাতিরের চাপে রেখেছো এই অনভ্যস্ত আমাকে যে, আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। সত্যি বলছি। আমি একটু একলা থাকি। একটু হাঁটি বরং গল্ফ লিংকস্ এ। তোমরা বরং যাও এখন।

বাঃ। আপনি যাবেন কি করে ? চিনবেন কি করে ? তাছাড়া এখানে তো ট্যাক্সি পাবেন না !

শ্রেয়া বললো।

ছবি বললো, তাহলে আপনাকে দুর্বার আর তোড়াই নিয়ে যাবে। যদিও একটু দূরে থাকে ওরা। তবে ক্লাব থেকেই ফোনে বলে দিচ্ছি। ওরা খুশিই হবে।

না। না। কাউকেই নিয়ে যেতে হবে না। আমার এক বন্ধু আসবে একটু পরে। তাকেই বলব খেলার মাঠে নামিয়ে দিতে।

কে বন্ধু ?

সালদানা।

কে ? মিঃ সালদানা ? তিনি তো আমাদের বস্।

চেনো নাকি তুমি ?

গবু বললো, উত্তেজিতগলায়। এবারে সত্যিই চলে যেতে হবে।

নিশ্চয়ই চিনি। সালদানা খুব ভালো কবিতা লিখতো একসময়। একটি কবিতার প্রথম লাইন এখনও মনে আছে আমার "ওয়াহ্, কিয়া আচ্ছা মাওসম্ হেগা।"

আমি কেটে পড়ি মানে মানে। পাঞ্জাবী কবিতা আর বাঙালী কবিতার মাঝে পড়ে প্রাণটা যাক তা আমি চাই না।

গবু বললো।

কিন্তু কতোটা যে কবিতার ভয়ে আর কতটা যে সালদানার ভয়ে ও কেটে পড়লো, তা ঠিক বোঝা গেলো না।

গবু চলে গেলো।

সত্যিই আসবেন সালদানা সাহেব ?

ছবি শুধলো।

হ্যাঁ। তাই তো বলেছিলো।

তবে আমরা সকলে যাই। আপনি তাহলে ওঁর সঙ্গেই চলে আসবেন।

দেরি করবেন না কিন্তু। খেলা কিন্তু শুরু হবে আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টার মধ্যেই। জয়িতা বললো।

প্রথমে গিয়ে হবেটা কি? খেলা জমুক।

বাঃ। সালদানা সাহেব নিজেও তো খেলবেন।

অমু বললো, তাহলে বোধহয় ও টেইল-এন্ড এ ব্যাটিং করবে।

মালু বললো, টস-এ কারা জিতবে আর প্রথমে কারা ব্যাটিং করবে তা জানবেন কি করে?

আরে, বাবাদের আর ছেলেদের মধ্যেই তো ম্যাচ। আসলে তো রোদ-পোয়ানো। তার আবার অতো!

অমু বললো।

তা অবশ্য ঠিক।

ছবি বললো।

তোমরা কেউ কিন্তু সালদানাকে বোলোনা আমার কথা।

অমু বললো।

উৎসুক গলার জ্যোৎস্না শুধালো। কেন?

কারণ আছে।

কী কারণ?

আমি যেদিন চলে যাবো, সেদিন বলব।

কী সব হেঁয়ালি করেন, মানে বুঝি না।

ছবি বললো, অনুরাগ আর অনুযোগ মিশিয়ে।

বুঝবে।

আমরা তাহলে সকলেই যাচ্ছি। আপনি দেরি করবেন না কিন্তু।

না। বলে, অমু উঠে দাঁড়ালো। এবং ওদের প্রত্যেককেই গাড়ি অবধি এগিয়ে দিলো। ওদের গাড়িগুলো লাল কাঁকরে ঝড় তুলে চলে যেতেই অমু ফিরে এসে চেয়ারে বসলো। ভাবলো, একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললো বোধহয়। সালদানা সাহেব যে ওদের বস, সে শুনেছে কাল হিতুরই মুখে। কোনোদিনও চেহারাও দেখেনি। আফটার অল ছোট্ট জায়গা। বড়সাহেবকে নিয়ে মিথ্যাচারটা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতেও পারে। তাছাড়া এখন ম্যানেজই বা করবে কি করে? দোষ অবশ্য পুরোটাই অগ্নিশিখার। সে বলেছিলো, ঠিক দশটাতে আসবে। আসেনি। আজকে সকলে যে অমুকে মাঠে নিয়ে যাবে এ কথা জেনেশুনেও আসেনি। এটা অবিবেচনা। শুধুমাত্র অগ্নি-শিখারই জন্যে সকলকে, সকলের আন্তরিক উষ্ণতাকে সরিয়ে দিয়ে একা হতে হলো। এখন যদি না আসে তবে · । এই বয়সে কারো আসার অপেক্ষায় মেট্রো বা লাইট হাউস বা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকাও পোষায় না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই অগ্নিশিখার ছোট্ট গাড়িটা ঢুকলো ক্লাবের গেটে। গাড়ি-টাড়ি বিশেষ চেনে না অমু। তবে মারুতি চেনে।

অগ্নিশিখা অগ্নিশিখারই মতো কমলা পাড়ের শাড়ি পরেছে একটি। শাড়ি-

ফাড়ি চেনে না অমু। ও কাছে এলে, দেখলো একটি ব্লাউজ পরেছে যে তার রঙও গাঢ় কমলা। দূর থেকে কবুতরের পায়ের মতো গোলাপি বলে ভুল হয়েছিলো। চওড়া বারান্দাটা যেন ঝলমল করে উঠলো। অগ্নিশিখার সদ্যস্নাতা সুগন্ধি ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে দিল হাজার হাজার অসময়ের শেফালি ফুল।

অমু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার জন্যে অনেকগুলো মিথ্যে বলতে হলো অনেককেই।

কাকে কাকে ?

কৌতুকের চোখে চেয়ে বললো তোড়া।

অমু লক্ষ করলো যে চোখে কাজল দিয়েছে অগ্নিশিখা। তাতে তার রূপ অপ্রতিরোধ্য হয়েছে আরও।

ছবিকে, জম্লিতাকে, মালুকে এবং আমার পিসতুতো ভাই গবুকে এবং আরো অনেককেই।

ওঃ। ভারী তো ! মিথ্যে বলার আরেক নামই তো কবিতা। সব কবিরাই মিথ্যেবাদী। ঠিক আছে।

একটু চুপ করে থেকে বললো মিথ্যে তো আমিও বলে এলাম আমার স্বামীকে। দুর্বার ওজু ও লিটল সাসপিসাস্।

রিয়্যালি ? হাউ ডাজ ইট ম্যাটার ? এট লিস্ট, নট টু মী !

কিছু মিথ্যা বলা ও সামান্য মিথ্যাচার করা বেঁচে থাকবার জন্যেই জরুরি প্রয়োজন। ন্যূনতম প্রয়োজন। কিছু সত্যি বলতে গিয়ে যে অশান্তি ও ঝামেলার ঝড় ওঠে তা অ্যাভয়েড করাই ভালো।

অমু বললো।

তা ঠিক। তবে এখন ভাবছি, মিথ্যেটা বললাম কেন ? বড় কোনো পাওয়া, গভীর কোনো সুখের কারণে মিথ্যাচারী হলেও না হয় বুঝতাম। আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব তার জন্যেই মিথ্যেচারী হতে হলো। এইটেই দুঃখের। আমি যদি স্বাবলম্বা হতাম তাহলে নিজেকে এরকম বাঁদী-বাঁদী মনে হতো না। নিজস্ব সম্বলহীন নারীর কাছে বিয়েটা নিছকই একটা এগ্রিমেন্ট নয়; এক ধরনের দাসত্বই।

আমার সঙ্গে গল্প করার সুখটা যে বড় কিংবা গভীর নয়, তোমার কাছে এবং আমার কাছেও, তা নিশ্চিতভাবে জানলে কি করে ?

তা অবশ্য জানিনি। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে খুবই ভালোবাসে। বিশ্বাসও করে। তাই ছোট লাগে মিথ্যে বলতে। অথচ বিশ্বাস যে করে এই বিশ্বাসটা পুরোনো গৃহভৃত্যকে বিশ্বাস করারই মতো। যার কাছে আলমারির চাবি, বাড়িঘর সব নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দিয়ে বেরুনো যায়, কারণ সে কখনও চুরি করবে না যে, এ কথা জানা আছে। এটা কি বিশ্বাস ? বিশ্বাসের মধ্যে তো একধরনের শ্রদ্ধাও মিশ্রিত থাকে। থাকা উচিত অন্তত। এতোদিন ভাবতাম ওর এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধাও আছে। আপনি আসার পর দেখছি যে, তা ঠিক নয়। ও আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে দেখছে আমি কী করি তা নিয়ে। পোষা

পাখির শিকল খুলে যেমন মালিক নতুন করে নিশ্চিন্ত হতে চায়, সে দাঁড়ে ফিরে আসে কিনা!

ছোট লাগলে, মিথ্যে বলা উচিত হয়নি। তোমার ফিরে যাওয়াই উচিত।

ফিরে যাব মানে? আমি কি আপনার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি? ঘর ছেড়ে?

আমার সঙ্গে পালাবার মতো দুর্মতি যেন কোনো নারীরই না হয়। যে নিজেই পালাতে পারেনি তার নিজের পরিবেশ, জীবনের ছোট্ট পরিসর, তার ধূলিমলিন নৈমিত্তিক নিত্যতার দানা আর জল-ছড়ানো খাঁচা থেকে, তার সঙ্গে পালানোটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু তুমি মিথ্যে বলে আমার কাছে এলেই বা কেন? আমারও ছোট লাগছে নিজেকে।

ভাবছি। এখনও নিজেই ঠিক জানি না। জানেন অমুদা, যে বয়সে কারো সঙ্গে প্রেমে পড়াটা স্বাভাবিক, সে বয়সে প্রেম করার সুযোগ আসেনি। তাই প্রেম জিনিসটা যে কেমন তা জানতে ভারী ইচ্ছে করে। যে এস্কিমো সূর্য কখনওই দেখেনি সে সূর্যের দেশে এসে শেষ বিকেলের সূর্যও হয়তো দেখতে চায়।

প্রেম তো কোনো জিনিস নয়, অগ্নিশিখা। প্রেম এক ধরনের শূন্যতা, যা শুধুই পূর্ণতার আশাটুকু বয়ে নিয়ে আসে। যাকে হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায় না, ঠোঁট দিয়ে চুমু খাওয়া যায় না, যাকে মুঠোর মধ্যে ধরা যায় না, তার নামই প্রেম। আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখো। মনে হবে আকাশ নীল। কিন্তু আকাশের সত্যিই তো কোনো রঙ নেই। মহাশূন্যকেই নীল বলে মনে হয়। তাই না?

আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন।

কখনও কখনও। তেমন কোনো মানুষ পেলে বলতে পারি। একথা আগেও বলেছি। এমন মানুষ, যাকে এসব বলা যায়। সকলকে সব কথা বলা যায় না। বলা উচিত নয়।

আপনি কেন আমাকেই বেছে নিলেন? আমার "তোড়া" নামকে ছুঁড়ে ফেলে নিজের নামে কেন ডাকলেন? ভারী বিপদে ফেললেন আপনি আমাকে। আমার যে কেবলই অগ্নিশিখা হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে এখন। আপনার দেওয়া নামকে সার্থক করে তোলার জন্যে। দেদীপ্যমান হয়ে ওঠার এক তীব্র বাসনা লক্ষ করছি আমি আমার ভেতরে। আমার সমস্ত শরীর-মনে। নাম বদলে দিলে যে একজন মানুষও বদলে যায়, তা আমি নিজে এমন করে না জানলে বিশ্বাসই করতাম না। আমার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে, যা আদৌ দাহ্য ছিল না, তাতে হঠাৎই অগ্নিশিখা থেকে ছড়িয়ে-যাওয়া আগুন লেগে গেছে অমুদা। আমি কী করি এখন?

একটু চুপ করে থেকে অগ্নিশিখা বললো, গায়ে আগুন লাগলে মেয়েরা কেন মরে আর ছেলেরা কেন বেঁচে যায় বলুন তো? জানেন আপনি?

না। কেন?

অবাক হয়ে বলল অমু।

মেয়েরা তাদের শাড়ি, সায়া, ব্রাউজ খুলে ফেলতে পারে না। সংস্কারের বশেই। আর পারে না বলেই তাদের সারা শরীরে থার্ড-ডিগ্রী বার্ন ছড়িয়ে যায়। প্রেমও একরকমের আগুন। একধরনের অগ্নিশিখা। যা আপনার কাছে নিছকই এক খেলা, তাই আমার কাছে মরণ।

যে প্রেম মরণের কথা মনে করায়, তাকে আগুন-লাগা জামাকাপড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলাই উচিত।

উচিত তো অনেক কিছুই। কিন্তু জীবনে সব উচিতকর্ম তো করা যায় না, করা হয়ে ওঠে না।

তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবে ?

আপনাকে দেখছি। একটু ভালো করে দেখি! এখুনি আবার কেউ এসে পড়বে। অন্য কোনো নারী। মেয়েরা ভীষণ ঈর্ষাকাতর হয়। মেয়েরা মেয়েদের চোখের ভাষা যেমন করে পড়তে পারে, তা আপনাদের ধারণাই নেই।

কী দেখছো ?

দেখছি, যে-মানুষের কলম থেকে এমন কবিতা বেরোয়, যে-মানুষ গুছি ভরে বছরের পর বছর সাজিয়ে তোলা তোড়াকে প্রথম দেখাতেই বিস্রস্ত করে দিয়ে আচম্বিতে অগ্নিশিখা করে তুলতে পারেন তাঁর বহিরঙ্গর আড়ালে কে আছেন ? তাঁকে দেখা যায় কিনা। চেনা যায় কি না ; তাই দেখছি। আপনার নাম হওয়া উচিত ছিলো স্ফুলিঙ্গ।

কবির মধ্যের কবিকে কখনও দেখতে যেও না, চিনতে যেও না অশি। শঙ্খচুড় সাপের গর্তেতে হাত দিতে নেই। কিছু দেখা ও চেনার আছে এ সংসারে যা হৃদয় দিয়ে, শুধুমাত্র বোধ দিয়েই ছোঁওয়া যায়। ছোঁওয়া উচিত। দূর থেকেই। তাই কোরো।

আপনি কেন এলেন এখানে ?

বুঝতে পারছি যে অনেকই কারণে আসাটা আমার অন্যায় হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি। এবারে তো এসে পড়েইছি। এটুকু কথা দিতে পারি যে, আর কখনোই আসব না। ভবিষ্যতে। আমি কারোরই অসুবিধার কারণ হতে চাই না। কারোরই না।

তোড়া অমুর সামনের চেয়ারে বসে পড়ে অসহায় হতাশ গলায় বললো, সত্যিই আর আসবেন না ?

হয়তো।

তবে এবারেই বা এলেন কেন ? আমার জন্যেই কি আসবেন না আর ? দোষী শুধু আমিই ?

জানিনা, কেন এলাম ? জামশেদপুর হঠাৎ আমাকে ডাক দিলো। হয়তো তোমার কুর্চিবনের হাতছানি, সোনঝুরির ঝুরু ঝুরু ; মনটা হঠাৎই বড় উচাটন হয়েছিলো।

কার জন্যে ?

বিশেষ কারো জন্যেই নয়। কখনও কখনও এমন হয়। অশরীরী আত্মা যেমন করে প্ল্যানচেটে আসে, হঠাৎ আসে ; এসে নানা কথা বলে আবার হঠাৎই চলে যায় তেমনই অশরীরী কোনো বোধ কোনো বিশেষ জায়গায় আমাকে ধাওয়া করিয়ে নিয়ে যায়। প্ল্যানচেটের আত্মারই মতো। তার কাজ শুধু পেঁছিই দেওয়া। তারপর ফিরে যেতে হয় শূন্যমনে, আশাভঙ্গতার গাঢ় ভারী বোধ বুকের মধ্যে নিয়ে। এমন বহুবারই হয়েছে আমার। নিজের মনের অশান্তি, ক্ষুন্নিবৃত্তির সামান্যতা-মাপা নিত্য অসম্মান, জীবনযাত্রার গ্লানি, দারিদ্র্যের কষ্ট, এই সব ভোলবার জন্যে দৌড়ে এসেছি বারেবারে কোথাও না কোথাও। নিজের শূন্যতাকে পূর্ণ করবার আশা নিয়ে। অথচ যখনই ফিরতি ট্রেনে উঠেছি তখনই আবিষ্কার করেছি যে, আমি দীনতর, রক্তাক্ত ; জানো, অশি, সুখকে এবং প্রেমকেও প্রেম সুখেরই এক বিশেষ রকম বলেই বোধ হয়, দৌড়োদৌড়ি করে পাওয়া যায় না কখনোই। স্থিতপ্রজ্ঞের মতো স্থির হয়ে বসে থাকলেই সুখ বা প্রেম সবই ভোরের পাখির মতো ছটফট করতে করতে তোমার কাছে এসে পায়ের কাছে বসে। কোলে মুখ ঘষে। শীতের সকালের রোদের মতো স্নিগ্ধ উষ্ণতায় ভরে দেয়, হৃদয় মনের সব খানা-খন্দ, শীত ; যেমন আমাকে দিয়েছে ভরে এই মুহূর্তে। হয়তো দিয়েছে তোমাকেও। এই মুহূর্তে তোমার মুখোমুখি বসে আছি আমি। প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ হয়ে। আমরা দুজনে ইচ্ছে করলেই আমার ঘরে গিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে পারি। এমন কি দুজনেরই আপত্তি না থাকলে চরম আদরও করতে পারি একে অন্যকে। কিন্তু হয়তো সহজে পারি জেনেই নিজেদের দুজনকেই অনেক কষ্ট দিয়েও তা না করতে পারাটাই বোধহয় প্রেম। তোমাকে ভালো লাগার সবটুকু আনন্দ, তোমাকে যতটুকু কাছে পেয়েছি তার চেয়ে আরও বেশি কাছে না-পাওয়ার সাধনারই মধ্যে। এইই প্রেম! অশি, আমার প্রেম, তোমার প্রেম, সকলের প্রেম।

আপনি না এলেই পারতেন অমুদা। দেখুন। আমার সারা শরীর কাঁপছে এই ঝাউবনের মতো থরথর করে : এই মুহূর্তে আমি এমন কিছু করে ফেলতে পারি, দিয়ে দিতে পারি আপনাকে এক্ষুনি যা কখনও কাউকে দিতে পাবার স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্নও আমি দেখিনি। কোনোদিনও দেখিনি।

তোমার ভয় নেই।

আমার নেই। আপনার আছে।

তোড়া দেখলো, এই আপাত অসুন্দর মানুষটার মধ্যে কোথায় যেন এক গভীর সৌন্দর্য লুকোনো আছে। মাঝে মাঝেই ঝিলিক তোলে তা ; বুঝিয়ে দেয়, কেন এতো মানুষে ভালোবাসে মানুষটাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে তোড়ার মুখে চেয়ে থেকে অমু বললো, ভয় নিশ্চয়ই আছে। তবে নিজেকে নয়। তুমি যা আমাকে দিয়েছো আজ সকালে, সেদিন চাঁদের রাতে, নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে, তার অমর্যাদা যাতে না হয় সেই ভাবনাটুকুই ভয়। পাছে তুমি, আমি চলে যাবার পর একবারও ভাবো যে, মানুষটা আমাকে ঠকিয়েই গেলো, আমার মুহূর্তের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ

নিয়ে গেলো ; আমায় সেই ভয়। পেছনের দরজা দিয়ে যে চোর ঢোকে কোনো নারীর মনের বা শরীরের ঘরে, বা সিঁদ কেটে, সে বুক ফুলিয়ে সামনের দরজা ভেঙে ঢোকা ডাকাতের সম্মান কোনোদিনও পায় না। তোমাকে ভেঙে তোমার একটি টুকরো নিয়ে লোভী কুকুরের মতো পালানোকে আমি ভালোবাসা বলি না। সন্ধ্যাতারার মতো, যতদিন বাঁচব, ততদিন দূরে থেকে তোমার দিকে এই সুন্দর পৃথিবীর সব স্নিগ্ধতা নিয়ে চেয়ে থাকবো। মনে মনে বলবো, অগ্নিশিখা, ভালো থেকো। তোমার শরীরের সঙ্গে আমার শরীর জড়িয়ে রেখে যতটুকু শুভার্থী হওয়া যায় তোমার, আমি তার চেয়ে তোমার অনেকই বড় শুভার্থী। আজ বুঝবে না। একদিন বুঝবে। কোনোদিন।

জানেন, ওর কথা মনে পড়ছে খুবই। মানে, দুর্বারের কথা। তোড়া বললো। আমি যদি আজ সকালের নির্জনে ওকে মিথ্যে কথা বলে আপনার কাছে মনে মনেও কিছু প্রত্যাশা করে এসে থাকি তাও কি অন্যায় নয়, চুক্তিভঙ্গতা নয় ?

চারধারে চেয়ে দ্যাখো। আমার মুখে চেয়ে দ্যাখো। এখানে কোনো ঘাতক নেই। বিশ্বাস অথবা শ্লীলতা অথবা ন্যায় সবকিছুই অম্লান অটুট থাকবে এই সকালে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। শুধু তোমার কেন, কোনো মানুষের ঘর ভাঙারই ইচ্ছা নেই আমার। তেমন শিক্ষাও নেই। তোমারও নেই। তুমি নিজেকে পুরোপুরি না জেনেই মিথ্যে ভয় পাচ্ছো। আমি অন্যকে ভাঙতে শিখিনি শিশুকাল থেকেই। নিজেকে কি করে ভাঙে তা নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি। চিরদিনই অন্ধকারকে ভাঙতে গিয়ে ভুল করে আলোই ভেঙেছি বারবার।

কিন্তু আমি তো চাই। আমি জানি, আমি চাই। আমি জানি কেন···

আমিও চাই। হয়তো তোমার চেয়ে অনেকই বেশি তীব্রতার সঙ্গে চাই। যা চাই, যা পেতে পারি, তা নিইনা বলেই তুমি আমাকে এক ধরনের ভালোবাসা বেসেছো। এবং জানি, আমি চলে যাবার পর আরও বেশি করে বাসবে। তোমার নির্জন অবসরের মুহূর্তগুলির অনেকখানিই ভরে থাকবো আমি। থাকবে আমার ভাবনা, আমি জানি। আমার কবিতার বইও। তোমার মতো ভালো গাইতে জানলে তোমায় গানও শুনিয়ে যেতাম। না থেকেও থেকে যেতে পারতাম তোমার এবং তোমাদের কাছে। আমার গানের মধ্যেও।

ভাগ্যিস জানেন না গান!

কেন ? ভাগ্যিস কেন ?

জানলে, আপনি না থাকলে, হয়তো অনেক বেশি দুঃখ পেতাম আপনার গান শুনে।

এতোই খারাপ গাইতাম ? তাই বলছো ?

কৌতুকের হাসি হেসে বললো অমু।

অগ্নিশিখাও হেসে ফেললো। অথচ ওর দুচোখে জল।

বললো, সবসময় ইয়ার্কি করলে ভালো লাগে না।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়। দেখি দেখি, মুখ ঘুরিও না, আমার দিকে তাকাও। তোমাকে ভালো করে দেখি একটু। তুমি একটি রিয়্যাল পাগলি।

দুর্বার। বেশ নামটি তোমার স্বামীর। মানুষটিও চমৎকার। স্বগতোক্তির মতো বললো অমু। স্বভাবটির মধ্যেও ওর নামের সার্থকতা আছে। ওর মুখের মধ্যে চাপা একধরনের নিষ্ঠুরতাও আছে। কখনও কি তা প্রকাশ পায়?

চুপ করে রইলো অগ্নিশিখা।

তারপর বললো, দুর্বারের প্রসঙ্গ আসছে কেন? আপনার স্ত্রীর নাম তো রানী! শুনেছি। আমাদের বিয়ে হয়েছে, একটি সন্তান হয়েছে বলেই কি আমার এবং আপনার জীবন শুধুমাত্র দুর্বার এবং রানীময়ই হতে হবে? ওই বৃত্তর বাইরেও কি কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের? থাকতে পারে না?

সাধারণত থাকে না। থাকে না, কারণ এই বৃত্তে বিশ্বাসের জন্যে যতটা নয় তার চেয়েও অনেক বেশি কারণ এই বৃত্তর বাইরে পা ফেলার সময়, মানসিকতা বা সাহস আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষেরই থাকে। সকালে দাঁতমাজা বা বিকেলে চা খাওয়ারই মতো এই বৃত্তর নাগপাশের অভ্যেস অজানিতে আমাদের পিষ্ট করে ফেলে। কেউ কেউ বাইরে এসে দাঁড়ায়ও কিছুক্ষণ। কোমর ভেঙে যাওয়া সরীসৃপের মতো মাথা তোলে, লেজ দোলায়; কিন্তু চলচ্ছক্তিহীন। পরক্ষণেই লেজে জ্বলন্ত-তারাবাজী বেঁধে-দেওয়া কুকুর-কুকুরীরই মতো ভয়ে দিশেহারা হয়ে পুরোনো, ব্যবহৃত, মলিন বৃত্তর সহজ সুখের নিরাপত্তার ঘেরের মধ্যে তারা সবাই দৌড়ে যায়। স্বাধীনতা ও মুক্তির তাপ সকলের সহ্য হয় না, তা যতই সাময়িক হোক না কেন। দৌড়ে যদি ফিরতেই হবে তবে বৃত্তর মধ্যেই সহজ সুখ ও নিরুপদ্রব শান্তির দানা খুঁটে খাওয়া, রমণ-সুখী পোষা-কবুতরের মতো নিজের নিজের বৃত্তর মধ্যেই বক্‌বকম করে ঘাড়ের রেশমী পালক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোই ভালো। সকলকেই যে বৃত্তর বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে তার মানেই বা কী! দাসপ্রথা থেকে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে আজকের মহান ভারতীয় গণতন্ত্র এ সবই তো চুক্তিরই জিনিস। প্রকৃতার্থে বিদ্রোহী হয়েছে বা হতে পেরেছে ক'জন? বলো?

আপনার মতো বাজে কবি দেখিনি। আপনি কি প্রেমের উপর থিসিস তৈরি করছেন? আমার সামান্য প্রশ্নটাকে বড়ই ঘোলা করে দিলেন আপনি।

তা নয়। বলেইছি তো। এতো সব কথা যতখানি তোমাকে শোনাবার জন্যে বললাম তার চেয়ে অনেকই বেশি বলছি নিজেকেই শোনাবার জন্যে। আমার মনের গভীরে অনেকই প্রশ্ন আছে। বার বার প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিয়ে প্রাঞ্জলভাবে বোঝার চেষ্টা করি নিজেকেই। ভাবনার গভীরে ডুব দিয়ে দেখি, তা মনোমতো হলো কিনা!

আপনি কি ডুবুরি?

কবিরা তো ডুবুরিই। দিন-রাত মাস-বছর মনের গভীর অতলান্তে আমাদের স্কুবা-ডাইভিং। যখন কোনো কবিকে দ্যাখো একা বসে সিগারেট খাচ্ছেন তখন ভেবোনা যে, তিনি আলস্যর প্রতিমূর্তি। গঞ্জনা দিও না তাঁকে, যেমন

তাঁর পরিবারের অনেকেই দেন। তাঁর ভিতরে নিরন্তর ভাঙা-গড়ার, ডুব-দেওয়া চিত-হওয়ার নানারকম অনামা প্রক্রিয়া চলেছেই। কবিদের মতো কঠোর পরিশ্রমী, ওভারটাইম-না-পাওয়া, শ্রমিক-আইনের দায়বদ্ধতাহীন এবং সবরকম প্রাপ্তিহীন শ্রমিক খুব কমই আছেন। কবিরা এদেশে উপহাসেরই পাত্র। কিন্তু কবিদের সবচেয়ে বড় উপহাস তাদের নিজেদেরই প্রতি। তাই তাঁরা কবি।

এতো সব বড় বড় কথা বুঝি না।

বোঝো ঠিকই। শুনলে ভয় করে বলে বুঝতে চাও না। নিজের জন্যে ভয়, দুর্বারের জন্যে ভয়, নিজের ছেলের জন্যে ভয়। এবং হয়তো কবিদের ভবিষ্যৎ-এর জন্যেও ভয়। তাও বুঝি।

ওসব কিছু নয়। আমার সময় নেই। আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনারই কাছে। কবিদের তরফে আপনার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে নয়। তাছাড়া আমার এক্ষুনি ফিরেও যেতে হবে। ওকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে বাড়ি যাব। আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেছে। তারপর ছেলেকে নিয়ে খেলার মাঠে। সময় বড় কম।

সত্যিই সময় বড় কম। সকলেরই। সকালে ছবি, মোমাকে নিয়ে এসেছিল। সে গাইলো রবীন্দ্রনাথের একটি গান। 'সময় কারো যে নাই'। আগে শুনিনি। চমৎকার লাগলো। তারপর একটু চুপ করে থেকে অমু বললো, যদি তাড়া থাকে তো যাও।

আর একটু বসি।

কেন? বসবে কেন? তাড়া থাকলে যাও।

আপনাকে ভালো লাগে বলে বসবো।

তবে বোসো।

একটা কবিতা শোনাবেন? এখানে কিছু লেখেননি? ভেবেছিলাম, আপনি আর আমি চুপ করে বসে থাকব একটু। কিন্তু এতো কথা হলো!

দোষ আমার নয়। সকালে এলে না কেন! কত মানুষ যে এলো সকাল থেকে।

লেখেননি কিছু?

না। বাইরে এলে আমি এক লাইনও লিখতে পারি না। তবে কাল রাতে একটি পদ্য লিখেছি।

পদ্য তো কবিতাই। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন।

শক্তি ঠাট্টা করে বলেন। নীরেনদা, শঙ্খদা, সুনীল, শক্তি ওঁরা সত্যিকারের বড় মাপের কবি। ওইসব ঠাট্টা ওঁদের মুখে মানিয়েও যায়। কিন্তু অমু ঘোষের পদ্য নিছক পদ্যই।

তবু, শোনান না।

না। আমার পদ্য শোনাবো না। কবিতা যখন লেখা শেষ হয় তখন তাকে খুন করে মর্গে এনে রাখতে হয়। তারপর কাটা-ছেঁড়া, শব-ব্যবচ্ছেদ করে তার জীয়নকাঠি মরণকাঠির হদিস করে কবির নিজস্ব মন্ত্রবলে কবি

প্রাণ দেন আবার সেই কবিতাকে। তারপরই তা পড়াবার বা ছাপাবার যোগ্য হয়ে ওঠে।

তবু শোনান। দুই-জীবনের মধ্যবর্তী মর্গের কবিতাই।

তুমি আজ আদৌ কবির অনুরাগিণীর মতো কথা বলছো না। শোনাচ্ছি তোমাকে, তবে আমার কবিতা নয়। লালা মিঞার শায়েরী থেকে।

তিনি কে ?

তিনি কে, তা আমিও জানি না। তবে বইটি পেয়েছিলাম কলেজ স্ট্রীটে। কবিতা অবশ্য একে বলে না। তবে আমার পড়তে ভালো লাগে। বলার কথাগুলির সঙ্গে আমার না-বলা কথার খুব মিল আছে বলে। একটু বসো। ঘর থেকে আনি।

অমু ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর ঝোলাঝুলি হাতড়ে বইটা বের করে পেছন ফিরতেই দেখে অগ্নিশিখা। ঘরের মধ্যে ! আগুন ! আগুন !

মুখে সে কিছুই বললো না। কোনো কোনো ব্যাপারে মেয়েরা আদৌ মুখর নয়। কিন্তু ওর দু-চোখ ভর্তি কথা ছিলো।

অমু তাকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করালো। অগ্নিশিখার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো।

বললো, গলা টিপে মারবেন বুঝি ?

কথা না বলে, অমু অগ্নিশিখার দুটি হাত নিজের দুটি হাতে নিলো। তারপর বললো, চোখ বোঁজো।

অগ্নিশিখা সমর্পণ করলো নিজেকে সমস্ত সম্পূর্ণতায়। কবির কাছে। না, না। কবি নয় ; কবিতার কাছে। অমু প্রথমে তার কণ্ঠায়, গলায়, কানের লতিতে এবং তারপর তার দু চোখে বার বার কিন্তু ধীর স্থির হয়ে চুমু খেলো। শেষ চুমু খেলো তার স্তনসান্ধিতে। বুকে-মাখা অচেনা পাউডারের গন্ধে, ভুলে-যাওয়া পারফ্যুমের গন্ধে, চুলের তেলের মিষ্টি ভেজা-ভেজা গন্ধের আবেশে অমুর যেন ঘুম এসে গেলো।

অগ্নিশিখার শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছিলো। দেওয়ালে ভর দিয়ে সে শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে পড়েছিলো আস্তে আস্তে। অমু তাকে কোমরের কাছে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে একটি তীব্র গভীর চকিত চুমু খেলো তার ঠোঁটে। হঠাৎ কালবৈশাখীর মতো উথাল-পাথাল করে উঠলো বড় বড় নিঃশ্বাসে তার বুক। পরক্ষণেই দু হাতে জোরে অমুকে জড়িয়ে ধরলো। অমু অগ্নিশিখার উত্তেজনা প্রশমিত হবার সময় দিলো। থরথরানি থেমে এলো। যেন বৃষ্টি থামলো কাঠটগরের বনে।

অমু বললো, অস্ফুটস্বরে ; আমার অগ্নিশিখা !

তোড়া কাঁদছিলো।

অমু বললো, চলো, বাইরে গিয়ে বসি।

না। আমি বাইরে যাবো না।

অগ্নিশিখা বললো, গাঢ়, নিচু স্বরে। বললো, পাজি, অসভ্য ! তারপরই।

বলেই, দু হাতের নরম হালকা মুঠি দিয়ে অমুর বুকে করাঘাত করতে লাগলো অবিরত। জোরে জোরে।

অমু অগ্নিশিখাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। অগ্নিশিখার হাত দুটি থেমে গেলো। পরম সোহাগে সে তার মুখ রাখলো অমুর বুকে। অমুর সমস্ত শরীরে একটা বনবেড়াল দাপাদাপি করছিলো। পুরুষের কষ্টের রকমটা অন্য। তা বলে তাদের কষ্টও কিছু কম নয়। কোনো মেয়েই এ কথাটা বুঝলো না কোনোদিন!

অমু বললো, ফিসফিসে গলায়, তুমি ছেলেমানুষ হতে পারো। আমি নই অশি। লক্ষ্মী মেয়ে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বলেই, দরজা খুলে বারান্দায় এলো। দরজা খুলেই দেখলো সেই মহিলা বসে আছেন। সে রাতে আলাপ হয়েছিলো পার্টিতে। কী যেন নাম মহিলার! ভুলে গেছে। মিসেস কী যেন। মুখটি মনে আছে, কারণ, ভোলা মুশকিল বলে। আগ্রাসী!

কতক্ষণ?

অমু বললো।

এই একটু আগে।

বলেই বন্ধ দরজার মধ্যে দিয়ে তাঁর এক্স-রে আই দিয়ে তাকিয়ে বললেন, ভিতরে কি কেউ আছে?

হ্যাঁ।

কে?

একজন···

মহিলা?

হ্যাঁ।

কি করছেন আপনার ঘরে?

ভদ্রমহিলার স্ক্যাণ্ডালাস গলায় তাঁর রাগ ও বিতৃষ্ণা ঝরে পড়লো।

অমু বললো, কবিতার বই খুঁজছেন।

কবিতার বই? খাটের তলায়? না খাটের ওপরে?

এই মহিলাকে অমুর প্রথম দর্শনেই ভালো লাগেনি। ওঁর স্বামী জামশেদপুরের (নীলডির নন) মস্ত একজন কেউকেটা লোক। ব্যবসায়ীও হতে পারেন। ঠিক মনে নেই। সচরাচর লক্ষ্মী আর সরস্বতী সহাবস্থান করেন না কোনোখানেই। এখানেও করেননি। মহিলা মস্ত বড় গাড়ি চড়েন, দামী শাড়ি পরেন, দেখতে অনেকেরই চোখে সুন্দরী। বাড়িতে ডেকে একদিন চাইনীজ খাওয়াবেন অমু এবং অমুর খাতিরে অন্যান্য অনেককে। সেদিন বলছিলেন। সুতরাং একজন গরিব বাঙালী কবি তাঁকেই সবচেয়ে বেশি পাত্তা দেবেন, এ বিষয়ে তাঁর নিজের কোনোই সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তোড়াকে কবির সঙ্গে এক ঘরে আবিষ্কার করাতে তাঁর মেজাজের তখন ঠিক ছিলো না।

দরজাটা আস্তে খুলে তোড়া ঘর থেকে বেরোলো। ওর শাড়ি বিস্রস্ত, চোখের কাজল লেপ্টে গেছে। চোখে জল।

উনি তীক্ষ্ণ মেয়েলি চোখে তোড়ার দিকে তাকালেন।

অমু বললো, কই ? বই কই ?

বোকার মতো তাকালো অগ্নিশিখা। হাতে-নাতে ধরা পড়া বামাল চোরের মতো।

অমু বললো, সেণ্টার-টেবলে রেখে এসেছি। নিয়ে এসো।

মহিলা বললেন, আই থিংক ইউ নীড আ ওয়াশ টু ব্যাডলি। মুখ চোখ ধুয়েই আসুন।

তোড়া ঘরে ঢুকে যেতেই মহিলা বললেন, তোড়া না ?

অমু মাথা হেলালো।

শকুনের চোখে সবই ধরা পড়ে।

তোড়া বইটা দিয়ে গেলো আরেকবার এসে। উনি যে এই অবস্থায় ওকে দেখে গেলেন তার ফলটা ঠিক কীরকম দাঁড়াবে পুরো নীলডি অঞ্চলে, তা বেশ বুঝতে পারছিলো তোড়া। বুক ফেটে কান্না আসছিলো ওর। ওই পাজী লোকটা!

কবি! অথচ তেমন কিছুই ঘটলো না। না, কিছুই না। যদি বুঝতো যে···। দুর্নাম তো সমানই হবে।

শুনুন। একটা কবিতা পড়ি।

অমু বললো।

কার লেখা ?

লালা মিঞা।

তিনি আবার কে ?

মুর্শিদাবাদের লালগোলায় বকরীর ব্যবসা আছে। কিন্তু পদ্যও লেখেন।

ট্র্যাশ। আমার সময় নেই সময় নষ্ট করবার। বড় কবিদের কোনো কবিতা শোনালে শুনতে পারি। নিদেনপক্ষে আপনার। কিন্তু ঘরে যে কবিতাটি লিখলেন সেটি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ঘরে কবিতা ?

হ্যাঁ। তোড়া তোড়া ফুল দিয়ে···

অমু গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো, আমার ধারণা ছিলো আপনি কবিতা সত্যিই বোঝেন। এখন দেখছি তরজাই আপনার বিষয়। বা কবিয়ালদের লড়াই।

আই ফীল ইনসালটেড। ওমলেটে বেশি লঙ্কা দিয়ে দেওয়াতে তোড়া বেচারির পাগলের মতো অবস্থা হয়েছিলো। ঝালে চিৎকার করতে করতে লাফাচ্ছিলো। তাই···

অমু স্বগতোক্তির মতো সাফাই গাইলো।

আই সী। ঝাল খেলে লাফানোই তো স্বাভাবিক।

পদ্যটি কি শুনবেন ? সম্ভবত আপনাকে নিয়েই লেখা।

আমাকে নিয়ে মানে ?

ভদ্রমহিলা নড়েচড়ে বসলেন।

মানে, লালা মিঞার কবিতা পড়ে অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছে।

পড়ুন তাহলে।

এক সেকেণ্ড, অশি, মানে তোড়া আসুক।

তোড়ার নাম অশি না কি ?

না না। তোড়ার নাম অশি হতে যাবে কেন !

মুখ ফসকে ?

হ্যাঁ। মুখ ফসকে।

তোড়া এলো। মুখের দাগ ধুয়ে এসেছে ঠিকই কিন্তু মুখের ভাব একটুও ধুতে পারেনি।

শুনুন। অমু বললো, শোনা তোড়া।

"সদ্য আলাপ হলো সেদিন
প্রথম চাওয়ায় লাগলো ভালো
ম্যায়ফিলেতে অনেক হুরী
কিন্তু তুমি একাই আলো।

মানে ? কার কথা বলছেন। অমুবাবু আপনি ?

আমি কিছুই বলছি না। লালা মিঞা বলছেন।

আই সী। ক্যারী অন প্লীজ।

"করিয়ে দিলো এক সে সুজন
মিঞার সঙ্গে আলাপ তোমার
ভাবেনি সে বারেক তরেও
মিলবে দু চোখ হঠাৎ দোঁহার

মিঞার ইয়ার অনেকই দোষ
মধ্যে তাহার প্রধান এটাই
লাগবে ভালো কোথায় কাকে
খুদ জানে না, দুঃখ সেটাই।
শুরু হলো ফিসফিসানি
পুটুর-পুটুর ফুললো পেট
হাসলো মিঞা আপন মনেই
নিন্দুকেদের ভেজলো ভেট।
এই দুনিয়ায় হঠাৎ যদি
কাউকে কারো লাগেই ভালো
দেরী না সয় নারী জাতির
ঠিকরে বেরোয় মনের কালো।
তাইতো আজই বলছে মিঞা

ভয় পেওনা প্রিয় গো মোর
বাসোই ভালো অথবা পাও
দুনিয়া ঠিকই তুলবে শোর।
ভালোবাসার সয় না আওয়াজ
শব্দ বিনাই মুকুল ফোটে
মুকুল ফোটে, মুকুল ঝরে
মহক্-এ তার বোলতা জোটে।
বোলতা ছিলো পয়লা দিনে
আখ্‌রী দিনেও থাকবে জেনো।
কথা শোনো নতুন প্রিয়া
গন্ধে মাতো ; মুকুল চেনো।"

তোড়া চুপ করে চেয়েছিলো অমুর মুখের দিকে।

মহিলা বললেন, এটা কি কবিতা হয়েছে নাকি ? এতো অন্ত্যমিল ! নো-ওয়াণ্ডার ওই মিঞার বকরীর ব্যবসা।

অমু হেসে বললো, অমন করে বলবেন না। টিভি সীরিয়াল "তামস" নিয়ে সারা দেশে নানা মুনির নানা মত চলছে এখন। লালা মিঞাকে পাঁঠা বললে দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে জামশেদপুরে। আর জামশেদপুর তো রাওট-প্রোন এলাকাও।

তাহলে পাঁঠাকে পাঁঠা বলবো না।

এরই মধ্যে তোড়া বললো, আমি চলি অমুদা। চলি।

অমু কথা না বাড়িয়ে বললো, যাওয়া নেই। এসো।

বলেই বললো, আমার পিসীমা বলতেন। এমন সুন্দর কথা তো দেশ থেকে উঠেই যাচ্ছে বলতে গেলে। কী বলেন !

অমু এখন একটু নার্ভাস ফীল করছে। নিজের জন্যে নয়। তোড়ার জন্যে। এই মহিলা সারা শহরে কী না কী বলে বেড়াবেন কে জানে !

অগ্নিশিখার সুন্দর কোমল কমলাভ পাপড়িগুলোকে যেন কোনো প্রমত্ত বাতাস দলে দিয়ে গেছে। অথচ বাতাস আদৌ প্রমত্ত ছিলো না। ফুল যখন দলিত মথিত হতে চায় তখন তার নিজের ভিতরেই একটি স্বয়ংক্রিয় মিশ্রণ যন্ত্র কাজ করে নিঃশব্দে। মন্থন যা হওয়ার তা এক তরফের আভ্যন্তরীণ কক্ষে-কক্ষেই ঘটে যায়। বিশেষ করে মেয়েদের শরীরে, মনে। পুরুষ নিমিত্তমাত্র।

বেচারি তোড়া !

পার্ক-করানো গাড়ির দিকে আস্তে-আস্তে হেঁটে-যাওয়া তোড়ার দিকে একবার চেয়ে অমুর বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠলো। ও বুঝতে পারছে যে, সেই সর্বনাশা বোধের শিকার হতে চলেছে সে আবারও। বহুদিন পরে। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘকে ভয় পায়। সমুদ্রের নোনা খোলা হাওয়ায় দূরাগত সাইক্লোনের গন্ধ পাচ্ছে অমু। হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছে ঢেউ। তিমি মাছ, জলের রঙ গভীরতর করে জলরেখায় কান অবধি উঠে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ফোয়ারা

তুলে। বুকের মধ্যে "মর্বিডিক" আবার জাগছে। বিপদ। খুব বিপদ! এই বিপদ যে কী সামান্যতা দিয়ে শুরু হয়, তা ভালোই জানে অমু। তাই এক বারান্দা রোদের মধ্যে বসেও ওর শীত করতে লাগলো।

প্রেমের মতো অসুখ আর কিছু নেই।

অমুর মা বলতেন প্রায়ই, তাঁর মৃত্যুর আগে আগে. "আমার কানের মধ্যে কী যেন শাঁ শাঁ শব্দ হয়। কে যেন বাঁশি বাজায়। জানিস খোকন। এবারে যম ডাকছে। যেতে হবে।"

অমুকেও প্রেম ডাকছে। স্পষ্ট শুনেছে তার আওয়াজ। জিম করবেট-এর "বনশী"র ডাক। এবারে মরতে হবে। সমুদ্র ফুঁসছে ভেতরে।

তোড়ার গাড়িটা চলে গেলো। অমু মনে মনে বললো, সাবধানে যেও, তোড়া। ভালো থেকো।

আমার হাজব্যান্ড পাঁচদিনের জন্যে ব্যাংকক যাচ্ছেন। ওড়িশার বর্ডারে আমাদের একটা ছোট্ট কাণ্ট্রি হাউস আছে। আপনি কি যেতে পারবেন আমার সঙ্গে? তিনটে দিন। শান্তি, পাখির ডাক, জঙ্গল. বেস্ট অফ ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ফুডস। সফ্‌ট বাট ফার্ম বেডস। ইলেকট্রিসিটি নেই। উই উইল হ্যাভ ক্যান্ডেললাইট ডিনার। এভরি নাইট।

অমু চোখ ছোটো করে তাকালো মহিলার দিকে। ভাবলো কিছুক্ষণ। এরকম প্রস্তাব কলকাতাতেও বহুবহুবার পেয়েছে। তখন শরীর প্রবল ছিলো। কাম আর প্রেম যে আলাদা তা বুঝতো না। মুখে কিছু বললো না অমু। কিন্তু তোড়াকে বাঁচাতে হবে। প্রয়োজন হলে নিজে মরেও। ভাবলো অমু, জীবনেরই মতো, মরণেরও কত রকম হয়! কিন্তু কথা না বলে, চুপ করেই রইলো।

উনি ব্যাপারটাকে আরও স্থূল করে বললেন, এবারে। দু হাত নেড়ে। উ্য নো! হোয়াট আই মীন? অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, পোলট্রী আছে, ডেয়ারী ফার্ম আছে।

আপনার কাণ্ট্রি-হাউসে কোনো ষাঁড় আছে?

ষাঁড়! হোয়াট অফুল ল্যাঙ্গোয়েজ।

হোয়াট ইজ আ ষাঁড়?

স্টাড-বুল্। ফর ব্রীডিং।

না তো। তবে গরু আছে দুটো। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন? ভেরী সিলী? যাই হোক, আমি ঠিক চারটের সময় এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবো।

কিডন্যাপ্ করবেন বলছেন?

ওলমোস্ট। আই গিভ আ ড্যাম্ বাই হোয়াট নেম উ্য কল্ ইট। সো লঙ উ্যই মেক ইট।

পরক্ষণেই বললেন, আই ফীল সো হ্যাপী বাউট ইট! কেউই বলতে পারে না আপনি কাণ্ট্রি-হাউসে তিনটে দিন আমার সঙ্গে থাকলে আমিও কোনোদিন "টিরিং-এ অমু ঘোষ" বলে কোনো বই লিখতে পারবো না।

না। তা অবশ্য কেউই বলতে পারে না। তবে মৈত্রেয়ী দেবীর একটি বহুপঠিত ভালো বই যদি আপনার অনুপ্রেরণা হয় তবে বলবো সে অনুপ্রাণিত কর্তব্য আপনার না করাই ভালো। অমু গম্ভীর গলায় বললো।

তারপর বললো, যদি লেখেনও, "টিরিং-এ অমু ঘোষ" কোনো প্রকাশক ছাপবেন না। এবং এক কপিও বিক্রি হবে না।

ছাপবো আমি নিজে। আর বিক্রি করার দরকার কি? প্রেজেণ্ট করব। যাচ্ছেন তো তাহলে?

কেন যাবো না? এমন অফার কেউ ছাড়ে? খাওয়া-দাওয়া, আপনার সঙ্গ; কম্পানি।

উৎফুল্ল হয়ে উনি বললেন, তাহলে আমি উঠি। এখুনি গিয়েই একটি গাড়ি পাঠাতে হবে সব বন্দোবস্ত করবার জন্যে টিরিং-এ।

টিরিং! ভারী মজার নাম তো!

পঞ্চাশোর্ধ মেমসাহেব চোখ দুটি গোল করে বিলোল ভাব হয়েছে ভেবে নিয়ে বললেন, তিড়িং-বিড়িং করার জায়গা হিসেবে টিরিং নামটা তো ভালোই। একেবারে বিহার আর ওড়িশার বর্ডারে। একধারে গেলে বাদামপাহাড়, রায়রাঙ্গপুর অন্যদিকে বড়বিল, বড় জামদা, রাউরকেল্লা। নট আ সোওল টু ডিসটার্ব আস দেয়ার। উ-উ-উ-উ···ভাবলেও আমার···

এবার চলুন। আমাকে একটু খেলার মাঠে নামিয়ে দেবেন?

হঠাৎ রসভঙ্গ করে বললো অমু।

নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে চলুন না! আপনার ঘরটা একটু দেখে আসি। আর উ্য কমফর্টেবল হিয়ার?

ফাইন।

চলুন। অমু কথা কেটে বললো।

আপনি তোড়াকে নিয়ে ঘরে কি করছিলেন? প্লীজ, এক্সকিউজ মাই আস্কিং দিস।

সত্যজিৎ রায়ের একটি ছোটদের বই বেরিয়েছে কিছুদিন আগে। নাম "তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম"। জানেন কি? ঘোড়ার ডিম বাঁধছিলাম তোড়া করে। তোড়াকে নিয়ে।

হাউ নটী!

বলেই উনি মুখে ব্রীড়াভঙ্গি ফোটাবার জন্যে এমনই এক ভাব করলেন যে অমুর দেখে মনে হলো তার দিদি শাশুড়ি কটকের গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজছেন। পারেনও কিছু মহিলা! সত্যি! অসীম তাঁদের ক্ষমতা, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই। এইরকম স্বভাবের সব বর্ষীয়সী মহিলাদের স্বামীদের নিয়ে থীসিস করতে আসবে বলেছিলো ডেরিক গবসন। মিজোরী থেকে। এলো না। আসা উচিত ছিলো।

উর্দিপরা সোফার গাড়ির দরজা খুলে দিলো। উনি ধন হয়ে বসলেন বিরাট গাড়িতে। অমুর পাশে।

অমু বললো, বাই এনি চান্স্ আপনি মিঃ সালদানাকে কি চেনেন ?

চিনি বইকি। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ তো আছেই। আমার সঙ্গেও আছে। তবে বোঝেন তো, ও'রা বড় বড় সাহেব। ও'দের দয়াতেই আমার স্বামীর ব্যবসা-পত্তর ; তাই দূরে দূরেই থাকি।

আমার জন্যে একটি কাজ করতে পারবেন ?

মোটে একটা ? বলুন কি কাজ ?

মাঠে নেমেই মিঃ সালদানার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবেন।

নো প্রবলেম।

অমু ভাবলো, যদি মিঃ সালদানা এখন ফীল্ডিং বা ব্যাটিং করেন তাহলেই চিত্তির হবে।

সামান্যই পথ। একটু গিয়েই গাড়ি পে'ছিলো মাঠে। সামিয়ানা টানানো হয়েছে। বাবা মায়েরা একদিকে আছেন। অন্য দিকে, ছেলেমেয়েরা বসে। মায়েরা ছেলেদেরই সাপোর্টার।

গাড়ি থেকে নেমেই ভদ্রমহিলা দৌড়ে গেলেন। অমু ইচ্ছে করেই খু'ড়িয়ে খুবই আস্তে হাঁটতে লাগলো। যাতে মিস্টার সালদানার সঙ্গে আলাপটা সকলের সামনেই না করতে হয়। তা হলেই তো সকালের বলা ডাহা মিথ্যেটা ধরা পড়ে যাবে। মিথ্যেটা না বললেই পারতো। অগ্নিশিখার জন্যেই বলতে হলো। ভবিষ্যতে অগ্নিশিখার জন্যে আরও অনেক মিথ্যা বলতে হবে। বুঝতে পারছিলো ও। মিথ্যের ঐ দোষ। একটা বললে তা ঢাকতে আরো দশটা বলতে হয়।

মিঃ সাল্দানা হাসিখুশি স্মার্ট ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশ কি তারও কম হবে। উনি ঐ মহিলার সঙ্গে অমুর দিকে এগিয়ে আসতেই সকলকে দেখিয়ে হাত তুলে হাই! বললো, অমু মিঃ সালদানাকে। সকলেই যাতে জানে যে, যেমন ও বলেছিলো, তেমনই উনি ওর পুরোনো বন্ধুই।

কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-বাদকের খাতির সর্বত্র। স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে। মিঃ সাল্দানা অমুর পরিচয় জেনে খাতির করে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অন্য অনেকেই পরিচিতদের মতোই এগিয়ে এলেন। নিজেদের জায়গা ছেড়ে উঠে এলেন সবাই ওর কাছে। হীতু, ছবির স্বামী বীয়ার এনে দিলো।

অমু বেশ "অ্যাট হোম" হয়ে যেতেই একটু ফাঁকা পেয়েই ও মহিলাকে ডেকে বললো আপনি না বললেন ওদিকের বন্দোবস্ত করতে যাবেন ? ঘিড়িং-এর ?

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মহিলার মুখ। বললেন, ঘিড়িং নয়, টিরিং।

হীতু বললো, এই মহিলাকে কোথায় পেলেন ? ও'র সঙ্গেই তো এলেন দেখছি! সাল্দানা সাহেব তো আপনাকে চিনতে পারলেন না! যখন বললাম আপনার কথা।

চেনেন যে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই এখন তোমাদের। ও

বরাবরই ঐরকম ভুলোমনা। ছেলেবেলা থেকেই। সবই ভুলে যায়। আর এখন তো অনেকই দায়-দায়িত্ব! এমনিতে পুরোনো সহপাঠীদের কি সকলেই মনে রাখতে পারে? মুখ দেখলেই তখন ফ্ল্যাশব্যাক হয়। তাই না?

তা ঠিক। হীতু বললো একেবারেই ঠিক বলেছেন! অমুকে বিশ্বাস করে। তাছাড়া সালদানা সাহেবকে না চিনলে অমুর মিথ্যা বলবার কোনো সঙ্গত কারণও ও খুঁজে পেলো না। অমু মিথ্যে বলবেই বা কেন!

ফাদার্স ভার্সাস সানস্-এর ক্রিকেট ম্যাচের আম্পায়ারিং দেখে অমুর মাথা ঘুরে গেলো। এই ভদ্রলোককে পাকিস্তানে যখন ইণ্ডিয়া খেলতে যায় তখন আম্পায়ার করে পাঠালে মন্দ হয় না। ছেলেদের ফীল্ডিং। কিন্তু একটা আউটও আম্পায়ার দিচ্ছেন না। কিছুতেই না। পরিষ্কার এল-বি-ডাব্লু, পরিষ্কার ক্যাচ। কিন্তু হলে কী হয়! সজোরে উনি মাথা এ পাশ ওপাশ করে যাচ্ছেন যত আপীলই প্রায় কাঁদো কাঁদো ছেলেরা করুক না কেন। আম্পায়ারের হাতে বীয়ারের বোতল। আর জবাবে "নো"। লজ্জা মান এবং ভয় এই তিনেরই মাথা চিবিয়ে না খেলে এরকম দোর্দণ্ডপ্রতাপ আম্পায়ার হওয়া যায় না।

খোঁজ নিয়ে জানলো অমু। ভদ্রলোক টেলকো হাসপাতালের ডাক্তার। মেডিসিনের নাম্বার ওয়ান। ডাঃ তাপস সরকার তাঁর নাম। খেলা আর কী দেখবে! খেলা ছেড়ে অমু মনোযোগ দিয়ে আম্পায়ারিংই দেখতে লাগলো। খেলা তো বহু জায়গাতেই দেখা যায়, এমন আম্পায়ারিং দেখার সুযোগ তো রোজ আসবে না!

তোড়া আর দুর্বার এতক্ষণে এলো। তোড়া কাছাকাছি আসতেই অমু বললো, চলো, একটু হাঁটি। সকাল থেকে বসে আছি এক নাগাড়ে। পা ছেড়ে যাবে। তারপর ভিড় থেকে একটু তফাত হতেই অমু বললো, তুমি একটুও ভয় পেও না। ঐ ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা দেখলাম একই রকম। আমি সকলকে যা বলব তা তুমি সাপোর্ট করবে শুধু। তারপর দেখো।

কী। কি বলবেন? কাকে? ভয়ার্ত গলায় শুধোলো অগ্নিশিখা।

দ্যাখোই না কী বলি!

লাঞ্চ-ব্রেক এ বিরিয়ানীর প্লেট এনে দিলো জয়িতা। হীতু আর দুর্বার আরও বীয়ার লাগবে কি না, তা যেচে গেলো। গবু আর গবুর বৌ, জ্যোৎস্না আগেই এসে কাছে বসেছিলো। অন্য জ্যোৎস্নাও ছিলো। পৃথা, জয়িতা। আরও অনেকে। জয়িতা তখন শুধোলো, ব্যাপারটা কি? আপনি আমাদের সকলকে তাড়িয়ে ঐ নোটোরিয়াস্ মহিলার সঙ্গে এলেন যে বড়! আমাদের বুঝি ভালো লাগছে না আর? উই ফীল ইনসালটেড!

সে কথা নয়! ব্যাপার কি, তা তোড়াকেই জিগগেস করো।

তোড়ার মুখ কালো হয়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু পুরোপুরি কালো হওয়ার আগেই অমু বললো, ভদ্রমহিলা মহা ঝামেলার সৃষ্টি করেছিলেন। ভাগ্যিস তোড়া ঠিক সেই সময়ই আমি আছি কি চলে গেছি তা দেখতে গেছিলো বাজার সেরে।

দূর্বার অবাক হয়ে বললো, তোড়াকে ; তুমি অমুদার কাছে গেছিলে ? কই ? বলো নি তো !

তোড়া সপ্রতিভ গলায় বললো, বলবার সময়টা দিলে কোথায় তুমি। তাছাড়া আমি কি কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্রী যে সবকিছুর জন্যেই তোমার পার্মিসান লাগবে ?

দূর্বার, তোড়ার উষ্মা দেখে অবাক হলো। বললো, আঃ…

অমু এবার নতুন করে অবাক হলো। প্রত্যেক মেয়েই জন্ম অভিনেত্রী। তারা ধরা পড়ে যায় শুধু অন্য মেয়েদেরই কাছে। কোনো পুরুষের সাধ্যই নেই যে, নারীর অভিনয় ধরে। স্বামীদের তো নয়ই ! চমৎকার।

তারপরে কি হলো বলুন ! ছবি বললো।

হবে কি আর ? ঐ মহিলার অথবা আমারও কপালটাই কিছু হওয়ার মতো নয়। আর কী ! উনি সবে আমার সঙ্গে একটু নিভৃতে ভালো করে আলাপ করার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন আর তক্ষুণি তোড়া দরজাতে নক্ করলো এসে। ধ্বক ধ্বক করে উঠলো বুক। ভিতরে আসতে বলতেই তোড়া ভিতরে এলো এবং উনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বাধ্য হয়েই তখন তোড়াকে চলে যেতে বললাম। বেচারি তো অপমানিত হয়ে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেললো। দূর্বার কিছুই বোঝনি তুমি তোড়ার মুখ চোখ দেখে ? স্ত্রীর মুখে একটুও মনোযোগ দিয়ে তাকাওনা কি ? ছিঃ।

দ্যাটস্ রাইট্। বুঝেছিলাম, অমুদা ঠিকই ! কিন্তু ভেবেছিলাম, প্রশ্ন করলে প্রশ্নটা যদি গোলমেলে হয়ে যায় ? আমাকে বললো, বাজার থেকে এলো। কিন্তু রাজেন আমার কলিগ, ফোন করেছিলো আমাকে। সে বললো, তোড়াকে গোলমুড়ি ক্লাব থেকে একটু আগেই বেরোতে দেখেছে।

বাঃ। এতো খারাপ না তুমি ! তুমি এমনি ভাবলে…। অমুদার কাছে গেলেই কি ? আমি যখন খুশি যাবো।

জয়িতা বললো, আঃ। কথাটাই ঘুরে যাচ্ছে অন্যদিকে।

প্রদ্যুম্ন বললো, আরে অমুদা আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে যা খুশি করুন। আমাদের আপত্তি নেই বিন্দুমাত্র। আমরাই যে প্রেমে পড়েছি অমুদার। তোমাদের আর দোষ কি ? আমরা সবাই তোমাদের অথোরাইজ করলাম। শুধু দেখো, যেন অমুদা ঐ মহিলার খপ্পরে না পড়েন।

আরে কথাটাই যে, ঘুরে যাচ্ছে। অমুদা, বলবেন তো !

জয়িতা এবার বিরক্ত গলায়ই বললো।

অমু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললো, কী আর কহিব সখী ! বড়ই বিপদে পড়েছি।

কি বিপদ ? খেতে খেতে সকলেই অমুকে ঘিরে ধরলো।

টিরিং-এর কান্ট্রি-হাউসে তিনদিন থাকতে হবে ওঁর সঙ্গে। ক্যাণ্ডেললাইট ডিনার খেতে হবে। পাখি ডাকবে। আঃ ! উই উইল হ্যাভ আ ওয়াণ্ডারফুল টাইম টুগেদার। তোমরা তো হাতের গোড়ার দলমাত্রেই আমাকে নিয়ে দলে·

বলেও রাত কাটাতে পারলে না। এতো ইচ্ছে ছিলো আমার! আর দ্যাখোতো সাধা লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলা যায়?

সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো। নেভার। নেভার। ঐ মহিলার সঙ্গে আপনাকে আমরা এক মিনিটও অ্যালাও করবো না। ওঁর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

কারো সম্বন্ধেই তো কিছু জানি না।

অমু বললো। হেসে।

কিন্তু না গেলে উনি চটে যাবেন না তো! চটে গিয়ে হয়তো বেচারি তোড়াকেই এক হাত নেবেন। যেহেতু অসময়ে গেছিলো আমার কাছে, তাই ওঁর রসভঙ্গ হওয়াতে রাগটা তোড়ার উপরেই বেশি।

তোড়াকে উনি কি করবেন? তোড়াকে আমরা সবাই চিনি। আমরা সবাই আছি না! তাছাড়া উনি স্ক্যান্ডাল-মংগারিং-এর রানী। সকলেই সেটা জানে। এমনিতেই প্রত্যেকের নামে যাতা বলে বেড়ান। পাঁচ পার্সেন্ট সত্যি পঁচানব্বই পার্সেন্ট মিথ্যা। এই তো মালু! তুইই বল?

মালু লজ্জা পেলো।

বলল, যাঃ। তোমরা না···একদম ভাল্লাগেনা ওঁর প্রসঙ্গ আমার।

পুথা বললো, মালুর ছেলের গায়ের রঙ কালো হয়েছে বলে উনি তার পিতৃত্ব সম্বন্ধে নানা বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

বুঝতে পাচ্ছি। অত্যন্তই বাজে মহিলা।

অমু বললো। কিন্তু, তা হলে আমি কি করব?

অমু অসহায়ের মতো বিরিয়ানীর হাড় চিবোতে চিবোতে বললো।

আপনার কিছুই করতে হবে না।

মহিলারা সমস্বরে বললেন। আপনার মতো কবিকে উনি টার্টার সস্ দিয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন এবেলা ওবেলা।

কিন্তু উনি যে বিকেল চারটেতে আসবেন। ক্লাব থেকে আমাকে নিয়ে যেতে। কোনো মহিলাকে এমন করে ফেরাতে নেই। ছিঃ।

আসাচ্ছি! সাড়ে চারটেতে মন্দিরার বাড়ি আপনার কড়াইশুঁটির কচুরির নেমন্তন্ন। দুবার আর তোড়া আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনার ঘরের চাবিটা যাওয়ার সময়ে আমাদের দিয়ে যাবেন। আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে চুপ করে বসে থাকবো চার-পাঁচজন। তারপর উনি যখন আসবেন তখন যা করবার, যা বলবার আমরাই বলব।

অমু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো। যাক বাবা! বাঁচা গেলো।

ডাইরি

বিকেলে মন্দিরাদের বাড়ি কড়াইশুঁটির কচুরি খেয়ে রাতে মালুদের বাড়িতে ডিনার খাওয়ার জায়গা ছিলো না আর।

এখন রাত। অনেক রাত। বিকেলে ওরা সকলে মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলো কি না কে জানে! মেয়েরা যখন কর্কশ হতে চায় তখন পুরুষদের চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে।

বাইরে নানারকম গন্ধ। কাঁটালের মুচির গন্ধ। আমের বোলের গন্ধ এখনও ভাসেনি হাওয়ায়। নানা ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে মুচির গন্ধ। হরজাই ফুল। গাছ পালা ঝাউ। তাদের গন্ধ।

বাইরে বারান্দাতে এতোক্ষণ আলো নিভিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু ঘর বারান্দার আলো নিভোলে কি হয় গোলমুড়ি ক্লাবের আলো ঝলমল ক্লাব হাউস স্বপ্নপুরীর মতো চোখের সামনে জেগে থেকে স্বপ্ন দেখতে দেয় না।

আমি তো একজন সামান্য কবি। আমার সামান্যতার মাপ আমি ভালো করেই জানি। কবিদের অনেকই কষ্ট। গদ্য লেখকদের মতো প্রাপ্তিযোগ তাদের ঘটে না। জনপ্রিয়তাও তাঁদের মতো নয়। মনে হয়, আনন্দবাজারেই একটি প্রতিবেদনে একবার পড়েছিলাম গদ্য লেখকদের জনপ্রিয়তা অনেকটা ফুটবলারদেরই মতো। অটোগ্রাফ-শিকারীরা তাঁদের ছেঁকে ধরেন। কদাচিৎ কিন্তু গভীর, অন্তর্মুখী পাঠক বা পাঠিকা খুঁজে খুঁজে একা কবিকে যখন খুঁজে বের করেন ভিড়ের মধ্যে থেকে তখন খাতাখানা বাড়িয়ে দিতেও তাঁর হাত কাঁপে। সই নিতে তো কাঁপেই। যেমন প্রকৃত কবি; তেমনই তাঁর প্রকৃত অনুরাগী।

আমি এখানে এসে যে এতো মানুষের ভালোবাসা, নিত্য সঙ্গ, সাহচর্য, আদর যত্ন পেলাম সেটা মানুষ হিসেবেই, কবি হিসেবে নয়। কিন্তু যে-আমিকে ওঁরা ভালোবাসলেন, সে-আমি তো আমার আসল আমি নই। আমার এই জ্বলজ্বলে মূর্তিটাই আমার আসল মূর্তি নয়। আমি বড় দুঃখী। কবিমাত্রই দুঃখী। হয়তো দুঃখের কিছুটা কল্পনা, কিছুটা বিলাস; কিন্তু অনেকটাই

সত্যি। হয়তো প্রকৃত কবি মাত্রই জানেন যে এই দুঃখর মধ্যে এক গভীর আনন্দও নিহিত থাকে। যিনি কবি, তাঁর পথ ভিড়ের পথের থেকে চিরদিনই আলাদা। যে অমু ঘোষকে নীলডির মানুষেরা কাছ থেকে জানলেন, সেই অমু, কবি অমু নয়।

কিন্তু আমি এই নিগুর্ণ নিরূপ অমু, এক মোটামুটি কবি, এখানে এবারে এসে যা পেলাম তার ঋণ শোধ করি এমন সাধ্য তো আমার নেই। জীবনের অনেক ঋণই শোধ করা যায় না। তবু, স্বীকার তো করা যায়। যায় বলেই, স্বীকার করি। অনেকে অবশ্য ঋণ "শিকারও" করেন। আমি পারিনি। সবাই সব পারে না। সব ভালো, সব খারাপ।

শ্রেয়া, শ্রমণা, জ্যোৎস্না; সোমা, পৃথা, ছবি এবং তোড়া। এবং আরও অসংখ্য মহিলারা বলেছেন, রোজই বলছেন, কবি নাকি অনেকই তাঁরা দেখেছেন, আমার মতো মুখর কবি তাঁরা আর দেখেননি। একথাটা আমার বাইরের আমিকে খুবই খুশি করেছে। সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ভিতরের আমিকে করেনি। আমি বুঝে গেছি যে, আমার এই জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে কবি হিসেবে, অন্তত বাংলা ভাষার কবি হিসেবে, আমি তত বড় নই। যাঁরা সত্যিই বড়, তাঁরা বাইরেও নির্জন; ভিতরেও নির্জন। এই নির্জনতার নিঃসঙ্গতার বোবা কান্না থেকেই জন্ম নেয় কবিতা। কবিতার মতো কবিতা।

তবু, যখন বড় কবি হতে পারলামই না তখন এতো মানুষের ভালোবাসাটা প্রত্যাখ্যান তো করতে পারি না। ভালোবাসাও তো একধরনের কবিতা। এখানের প্রত্যেক পুরুষ ও নারী, যাঁদের আমি কাছ থেকে দেখলাম, জানলাম, আমার প্রতি তাঁদের প্রত্যেকের ভালোবাসাও কবিতা। ভালোবাসার যেমন অনেকই রকম হয় ভালোবাসার কবিতারও হয়।

আমি এ কথা জেনে বড় শ্লাঘা বোধ করছি যে, আমার এই মান-সম্মান-আদর-যত্ন আমি বিত্তবান বা রূপবান বলে নয়। বিত্ত বা রূপ থাকলে এই ভালোবাসা হ্যাণ্ডিকাপে পাওয়া হতো। তার মূল্য নেই কোনো। যা পেয়েছি তা যে শুধু কবি-পরিচয়েরই জোরে এবং কবির মুখরতার জোরে এইটে ভেবেই বড় ভালো লাগছে।

আমি আজকে ভীষণই খুশি। যেমন জামশেদপুরের জন্যে এক শেষ রাতে মন বড় উচাটন হয়েছিলো বলে রানীকেও না বলে-কয়ে চলে এসেছিলাম তেমনই কাউকেই না বলে আমি কাল ভোরের ট্রেন ধরে ফিরে যাচ্ছি। কলকাতা। কী যেন নাম ট্রেনটার। স্টিল না ইস্পাত? গুলিয়ে যায় আমার।

আজ শেষ বিকেলে টেলকো বাজারে পান খাবার অছিলায় একবার গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কথাও বলে রেখেছি। অ্যাডভান্সও দিয়ে এসেছি। সে আসবে ঠিক সকাল পাঁচটাতে। তখনও অন্ধকার থাকবে।

হঠাৎ-আসারই মতো হঠাৎ-যাওয়াতেও একরকম মজা আছে। কষ্টও আছে। নিখাদ মজা বা নিখাদ কষ্ট বলে তো কিছু নেই। সবই মিলেমিশে আছে, থাকে। সব কিছুরই মধ্যে।

তাছাড়া আমাকে পালাতে হবে অগ্নিশিখারই জন্যে। আমি নিজেকে বুঝি। নইলে আরও দিনসাতেক এঁদের সকলের অতিথি হয়ে স্বচ্ছন্দেই থেকে যেতে পারতাম।

নির্জন হুহু হাওয়া সমুদ্র পারের সী-গাল্-এর বিধুর চমকানো ডাকের মতো, শীতের পড়ন্ত বেলায় ঝাঁটি জঙ্গলের মধ্যে কালি-তিতিরের উত্তেজিত চিঁহা চিঁহা রবের তীব্র বিষণ্ণতার মতো কৃষ্ণপক্ষর মধ্যরাতের নিথর সবুজাভ তারাদের রহস্যের গাঢ় বেদনার মতো আমার মন নিশ্চিত সুখের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই আজ করজোড়ে ছুটি চাইছে। ভালোবাসাবাসি ভালো; সমুদ্রের ঢেউ, জলের মধ্যে দাঁড়ানো কবির বুকের সামনে সেই ঢেউ এর নেচে যাওয়াও ভালো, ফুলের গন্ধ ভালো, পাখির ডাক ভালো, সবই ভালো; কারণ তারা এসে প্রত্যেকেই ফিরে যায় বলেই। কোনো সৌন্দর্যই পুরোনো হলে আর সৌন্দর্য থাকে না। জাপানী ক্যালেন্ডার বা নতুন শাড়ি ও পারফুমের গন্ধ ভরা নতুন বৌদিরই মতো। নীলাড্ডির মানুষেরা, তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা গভীর থাকতে থাকতে আমি নেচে যাওয়া ঢেউ এর মতোই সরে যেতে চাই। আর কখন-ওই আসবো না।

অমু ঘোষের মধ্যে যেমন একজন পুরোপুরি কবি বাস করে, বাস করে একজন অকবিও। যে বিদূষকের মতো মানুষকে হাসায়, যার মধ্যে কোনো আভিজাত্য নেই, যে রিকশাওয়ালা থেকে সালদানা সায়েব, সকলের সঙ্গেই এক মুহূর্তে বন্ধুত্ব করতে পারে; সকলকেই তার হৃদয়ের আসনে একাসনে বসায় নির্দ্বিধায়। সে কবি নয়। কবিরা মুখচোরা, লাজুক স্বভাবের হয়।

মুখর কবিদের মুখরতাও নীরব হবারই জন্যে।

আমি অমু ঘোষ, ভালো কবি নই। কিন্তু ভালো মানুষ। আমি জানি, অগ্নিশিখা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। হয়তো আরো কেউ কেউ বেসেছে। একেকজনের ভালোবাসার ভিন্ন ভিন্ন ধরন। কিন্তু অগ্নিশিখার ভালোবাসাটা অন্য কারো ভালোবাসার মতো নয়। দুর্বারও আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু একজন পুরুষ ও নারির মধ্যের ভালোবাসা, সম্পূর্ণতার জন্যে উভয় পক্ষের কারণেই স্বীকৃতির গন্তব্যে পেঁছবে বলে পরিপ্লুতি খোঁজে। অগ্নিশিখার কোরকের সুগন্ধি স্নিগ্ধতা আমি সঙ্গে করে নিয়ে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করবে নিজেকে যে আগুনে সেই আগুনের তাপ থেকে তাকে এই নির্মোহ মুখর কবিই একমাত্র বাঁচাতে পারে। এই মুহূর্তে দূরে সরে গিয়ে।

দুর্বার খুবই ভালো ছেলে। চমৎকার তাদের একমাত্র সন্তান। শান্ত। অগ্নিশিখার ভালোবাসা আমি পেয়েছি। আমার ঠোঁটে এখনও তার সিক্ত ঠোঁটের সিক্ততা সিরসির করছে। নাকে পাচ্ছি তার স্তনসন্ধির পাউডারের গন্ধ, স্নিগ্ধতার ঘ্রাণ। তার চোখের পাতায় যখন চুমু খেয়েছিলো অমু ঘোষ তখন অগ্নিশিখার চোখের পাতার নিচের মণি আর কণীনিকাও তার ঠোঁটের পরশের জন্যে তিরতির করে কাঁপছিলো। চাঁদের রাতে নির্জন পথে হাঁটার সময়, ওর

হাতের পাতার পিঠে চুমু খাওয়াতে অগ্নিশিখা বলেছিলো, অস্ফুটে "সাহেবদের মতো"।

আমি, অমু ঘোষ, বলব, অশি, আমি সাহেবদের মতো নই ; কবিদের মতো। জল্লাদের কাজ ফুলকে পিষ্ট করার। কবির কাজ ফুলকে ফোটানোর। অনেকই পেয়েছি আমি। অনেকই নিয়েছি।

এই স্তব্ধ শীতের রাতে, ক্লাবের নাইটগার্ড আগুন জ্বালিয়ে তার কুকুরকে পায়ের কাছে নিয়ে বসে আছে। তোমার বাড়ি কাছে হলে আমি তোমার ঘরের বন্ধ জানালার সামনে গিয়ে এখন দাঁড়াতাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ কল্পনায় তোমার কাছে থেকে ফিরে আসতাম। কিন্তু তোমাদের বাড়ি যে অনেকই দূরে!

আমি জানি যে, তুমিও এই মুহূর্তে জেগে আছো। লেপের নিচে। দুর্বারের হাত তোমার কোমরে জড়ানো। তোমাকে আদর করার পর দুর্বার অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তুমি তৃপ্ত হওনি। এই অতৃপ্তি তোমার নতুন। অশি, তোমার মধ্যে আমি এক নতুন অভাববোধ জাগিয়ে দিয়ে গেলাম। এই আমার দান। তোমাকে। যে নারীর মনের মধ্যে কোনোরকম অভাববোধ নেই তিনি শূকরীর মতো তৃপ্ত হয়ে হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছেন। তিনি নারী নন ; যন্ত্র।

শুধু শারীরিক মিলনের তৃপ্তিটুকুই নয়, তোমার সমস্ত পরিবেশ, তোমার অস্তিত্ব, তোমার বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছুকেই আমি আমার কবিতা লেখার আঙুলগুলি দিয়ে ছুঁয়ে গেলাম অশি। তোমাকে আরও অনেক কিছু না-দিয়ে তোমাকে দুঃখী করে গেলাম। তোমার মানবী সত্তাকে আমি জাগিয়ে গেলাম অগ্নিশিখা, যাতে তুমি জীবনে প্রকৃত অগ্নিশিখারই মতো নিভৃত, উজ্জ্বল নম্রতার নীরব আনন্দে ফুটে থাকো।

ভেবে দেখো, তোমাকে এর চেয়ে দামী আমি আর কীই বা দিতে পারতাম! তুমি যদি গান গাও তো এই দুঃখবোধ, তোমার মধ্যের এই অভাববোধ তোমাকে মস্ত বড় গায়িকা করে তুলবে কোনোদিন। যদি ছবি আঁকো তুমি, তো ছবি আঁকতে বসে তুমি আমার কথা ভাবতে ভাবতেই তুলি বোলাবে। ইজেলে। তুলি হবে তোমার পাতলা ঠোঁট আর ইজেল হবো আমি। নিরন্তর, অনাদিকাল ধরে আমরা পরস্পরকে কাছের, আরও কাছের করে পাবো। এই পাওয়া, এই কাছে থাকাই তো আসল ঘনিষ্ঠতা। তাই না?

আমি তোমাকে কোনোদিনও চিঠি লিখবো না। তোমার নীরব চোখের প্রার্থনা মঞ্জুর-করা অথবা আমারই চুরি করে খাওয়া চকিত চুমুরই মতো, আমার দু হাতের পাতার মধ্যে তোমার হঠাৎ ভালো লাগায় শিশিরের মতো গলে যাওয়ার মতো, তোমার জীবনে আমি ক্ষণকের স্মৃতি হয়ে থেকে যাবো অশি। ক্ষণিকের অতিথি হয়ে। যদি কোনো দুজ্ঞেয় কারণে আমাকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলে থাকো তাহলে সে-ভালোবাসাকে নিত্যতার, পৌনঃপুনিকতার পরশে

দাম্পত্য-সম্পর্কের মতো ব্যবহারে ব্যবহারে মলিন নিষ্প্রভ না করে নির্মল চির-নতুন করে রেখো। আনন্দম! আনন্দম! আনন্দম!

তুমিই একবার বলেছিলে, এবং একথা অনেক মেয়েই বলে, এখানের মালু, ছবি, পৃথা এরাও বলেছিলো, যে, যাকে ভালোবাসা যায় তাকে ভুলেও বিয়ে করতে নেই। কথাটা মানি। আমি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলব, যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে বিয়ে না করলেও কখনই তার সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত হতে নেই। এটা মেয়েদের কাছে আরও বড় ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না? মায়ার খেলায়? "আশ মিটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে"।

পুরুষের আশ মিটে গেলে পুরুষ তখন নবতর বিজয়ের খোঁজে বেরোয়। সব পুরুষই কবি নয় অমু ঘোষের মতো। আশ না মিটালেও অধিকাংশ পুরুষ আশাভঙ্গ হয়ে অন্যত্র যায়। তারাও ফেরে না। পুরুষ জাতের চরিত্র তীক্ষ্ণ এবং পক্ষপাতহীনভাবে বিশ্লেষণ করেই আমার মনে হয় যে, আমাদের পূর্বসূরীরা যতখানি বাঁদর তার চেয়েও বেশি কুকুর ছিলেন। অধিকাংশ পুরুষই ভালোবাসার কিছুই বোঝে না অশি। অমু ঘোষ বোঝে। এবং বোঝে বলেই তুমি যখন আজ ভোর-হয়-হয় শীতের রাতে তোমার স্বামীকে আলিঙ্গন করে শুয়ে থাকবে অভ্যাসবশে তোমার ওম্-ধরা লেপের নিচে, আমি তখন রওয়ানা হবো স্টেশনের দিকে। তোমার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষা আর প্রীতি আর ভালোবাসা এই নীলডির আকাশ-বাতাসে আবীরের মতো ছড়িয়ে দিয়ে যাবো, যাবার সময়ে। এবারে হোলির দিনে সেই আবীর মাখামাখি করে হোলি খেলো তুমি!

দেখতে দেখতে শীত চলে যাবে। বসন্তের কোকিল যখন কুহু কুহু করে ডাকবে তোমার বাগানে, আমের বনে যখন মুকুল আসবে, তখন মনে পড়বে আমার তোমার কথা। পড়বে না? যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে ঘুঘু সারা দুপুর ঘুঘুর র-র-র-ঘু—ঘুঘুরুঘুউউ করে একটানা ডাক ডেকে যাবে, দরজা-জানালা বন্ধ প্রায়ান্ধকার একা-ঘরে বসে, বাইরের 'লু' এর ধুলো আর ঝরাপাতা-ওড়ানো ঝরঝরানি শব্দ শুনতে শুনতেও আমার কথা মনে হবে তোমার। বর্ষার দিনের কুচিবন উথাল-পাথাল করা শাঁশিরশির হাওয়ার ফিসফিসানির মধ্যে তুমি যখন দুর্বারের জন্যে খিচুড়ি আর আলু ভাজা আর শুকনো লংকা ভাজা ভালো বাসায় নিজে হাতে রেঁধে তার সঙ্গে খেতে বসবে তখন তোমার মনে হলেও হতে পারে যে, তোমাদের খাবার টেবলের, জানালার পাশে আরও একটি প্লেট বেশি থাকলে মন্দ হতোনা!

কিন্তু যদি আর একটি প্লেট বেশি রাখতেও আমার জন্যে আমি কিন্তু এসে পড়লেও প্রথমেই বলতাম আরও একটি প্লেট নেই কেন? বন্ধের সেই ছেলেটি কোথায়? যে তোমায় ভাবীজী বলে ডাকে? যে তোমার উত্তীয়?

আমার অশি। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। হঠাৎ। এখন। এই বয়সে! এমন হঠাৎ ভালোবাসা যে হয়, হতে পারে; তা আমারও বিশ্বাসের বাইরে

ছিলো। তবু হলো। অবিশ্বাসকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। কখন, কার জীবনে যে কী ঘটে যায় তা আগের মুহূর্তেও আমরা জানতে পারি না।

আমি তোমাকে ভালোবেসে লজ্জিত অশি। আমার বয়স আরও দশ বছর কম হলে তোমার মতো কাউকে ভালোবাসার যোগ্যতা আমার থাকতো। অমু ঘোষ যে শুধুই একজন সাদামাটা কবি। যাদুকর তো সে নয় যে বয়স কমিয়ে দিতে পারে নিজের, কোনো দারুণ ভোজবাজীতে! কিন্তু ভালোবাসা যে কোনোদিনই যোগ্যতার বিচার করেনি। যোগ্যতা বিচার করে ঠিকুজি কুষ্ঠী মিলিয়ে রাজযোটক বিবাহ হলেও বা হতে পারে, ভালোবাসা কোনদিনই হয়নি। তবুও আমি বড়ই লজ্জিত তোমাকে ভালোবেসে। কারণ, তোমার অথবা অন্য কারো ভালোবাসা পাবারই যোগ্যতা আমার নেই। আমি জানি তা। আয়নার সামনে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করে। আমার কিছুই নেই। শুধু আমার মিডিওকার কলমটি ছাড়া। তুমি আমাকে ভালোবেসে হয়তো আমাকে নয়, কবিতাকেই সম্মান দিয়েছো আসলে। আমার কবিতাকেই নয় পৃথিবীর সব কবিদের কবিতাকে। আমি অধম বলে তুমি উত্তম হবে না কেন? উত্তম বলেই তো দয়া করে অধমকে ভালোবেসেছো!

ভালো থেকো অগ্নিশিখা। দুর্বার, তুমিও ভালো থেকো। ভালো থেকো বোম্বের টেলকোর সেই সুন্দর প্রাণবন্ত অদেখা ছেলেটি। ভালো থেকো শ্রেয়া, শ্রমণা, জ্যোৎস্না, ছবি, মালু, জয়িতা, পৃথা; সোমা। ভালো থেকো। বিবাহিতাদের স্বামীরা। ভালো থেকো অবিবাহিতাদের বা একা নারীদের প্রেমিকরা।

কাল সকাল আটটাতে দলমাতে যাবার জন্যে আমাকে তুলতে এসে যখন শুনবে তোমরা যে, আমি চলে গেছি তখন নিশ্চয়ই তোমাদের খুব রাগ হবে আমার উপর। বহুজনের কাছে শুনেছি যে, হাজার হাজার কাঞ্চন ফুলের গাছ আছে দলমা পাহাড়ে। এখন যদিও কাঞ্চন ফুল ফোটার সময় নয় তবু গাছগুলিই দেখে এসো আমার হয়ে। তাদের কবির আদর জানিয়ো। কিন্তু যখন আমার অদেখা পাহাড়ের চুড়োয় বসে শীতের রোদে চড়ুইভাতি করবে তোমরা, যখন ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠবে তোমাদের শরীর তখন ধীরে ধীরে বুঝতেও পারবে যে আপদ বিদায় হয়েছে, ভালোই হয়েছে।

কিছু আপদ থাকে, তারা যতক্ষণ কাছে থাকে; ততক্ষণ সম্পদ বলে ভ্রম হয়।

ট্যাক্সিটা যখন গল্ফ লিংকস-এর মাঠের মধ্যের পথ দিয়ে চলেছে তখন অমু হঠাৎ দাঁড়াতে বললো ড্রাইভারকে। ড্রাইভার অবাক এবং কিঞ্চিৎ বিরক্তও হয়ে দাঁড় করালো ট্যাক্সিটা। আলোয়ান মুড়ি দিয়ে-বসা-তার সঙ্গীকে বললো, বিড়ি ছোড়্‌বে এক।

অমু নেমে পড়ে ডানদিকে বাঁ দিকে তাকালো। বারবার। এখনও বেশ শীত। ক্লাবের আলোগুলো জ্বলছে! কিন্তু পুবের আকাশে ধীরে ধীরে ফুটছে আসন্ন সকালের অস্পষ্ট লালিমা।

হঠাৎই মনে হলো যেন নিঃশব্দে গাছতলিতে পাশে এসে দাঁড়ালো অগ্নিশিখা।

নিজেই পালিয়ে যাচ্ছেন? ভীতু? আমি যে পালাবো বলেছিলাম আপনার সঙ্গে। কাল সারা দিন, আজ সারা রাত শুধু এই কথাই ভেবেছি।

তোমার ভিতরের দিকে অনেক বাধা। পারবে না। যারা পালায় তারা বলে পালায় না।

চলুন অমুদা! আমরা পালাই, এই নিয়মবন্ধতা থেকে, এই দড়ি-ধরা সংসার থেকে। অন্য সকলের মতো না হয়ে চলুন আমরা ব্যতিক্রম হই।

তুমি একটি পাগলি।

পাশে পাশে অগ্নিশিখা হাঁটছিলো। এখন দু-একটি করে পাখি ডাকছে। পৃথিবী জেগে ওঠার আগে, সমুদ্রের বড় ঢেউ অতিকায় নীল পাটিসাপটার মতো পুঞ্জীভূত হবার আগে, হঠাৎ নীল নাগের মতো কুণ্ডলী ছেড়ে লাফিয়ে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে যেরকম থমথমে ভাব হয়, একধরনের বিপজ্জনক নৈঃশব্দ্য; "মবি ডিক" "সাবফেস্" এ উঠে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে যেমন নৈঃশব্দ; এখন তেমন। এই নৈঃশব্দে জীবন আর মৃত্যু মাখামাখি হয়ে থাকে।

অগ্নিশিখা বললো, আমার হাতটা একটু হাতে নিন অমুদা। আমার হাতের তেলোর পিঠে সাহেবদের মতো আর একটা চুমু খান। তারপর চলুন, আমরা দৌড়ে যাই ভোরের সূর্যকে ছোঁব বলে।

অমু হাত বাড়িয়ে অগ্নিশিখার নরম সুগন্ধি হাতটা ধরতে গেলো। ভোরের সোঁদা গন্ধ পথের শূন্যতা থেকে উঠে এলো ট্যাক্সি ড্রাইভারের বিড়িখেকো দুর্গন্ধ হাত। ট্যাক্সি ড্রাইভার অমুকে পাকড়াও করতেই এসেছিলো।

বলল, টিশান যানা হ্যায় কি নহী? টিরেন্ ফেইল হো যায় গা আপ্‌কি। গাড্ডি খুল্ যায়েগি।

অমু সম্বিত ফিরে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর ফিরলো ট্যাক্সির দিকে। অগ্নিশিখা কোথাওই নেই। নিজের মিথ্যে সত্তাকে নিজের প্রকৃত সত্তার চেয়ে বড় করে তুলে এখন ফিরে যেতে খারাপ লাগছে খুবই। ট্যাক্সিওয়ালাকে অমু বললো, সব খেলাতেই যে খেলুড়ে ফেল করে ইয়ার; তার ট্রেইনতো মিস্ হতেই পারে!

ট্যাক্সিতে উঠতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো।

অগ্নিশিখা এখন গাঢ় ঘুমে। নিশ্চয়ই। আহা ঘুমোক! ঘুমোক! অমুর কাছে থাকলে তাকে তুলোর মধ্যে করে রাখতো। তুলো কিনতে না পারলে সারা বসন্ত গ্রীষ্ম মাঠে ঘাটে বীজফাটা শিমুলের দিগ্বিদিকে উড়ে-যাওয়া তুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনতো। অগ্নিশিখাকে সে কোনোরকম কষ্টই দিতো না।

ট্যাক্সিওয়ালার সাকরেদ কটুগন্ধ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বললো, "সুবে সুবে পাগল পিসেঞ্জার উঠায়া উস্তাদ! দিন বহুতই খারাপ নিক্‌লে গা।"

অমু শুনে বললো, পাগল নেহি হুঁ ম্যায়।

অগ্নিশিখা এখন ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরলো। ভিতরের জামা পরেনি। ফিকে হলুদ রঙা ব্লাউজের সব বোতাম বন্ধ নেই। ব্লাউজের ভিতরে দুটি ফুল ফুটে আছে। নিভৃত নিটোল; পেলব সুগোল; সুডোল। ভরা-শ্রাবণের কদমের মতো। হলুদ, কোমল।

ততক্ষণে ট্যাক্সি নীলডির গাছ-গাছালি আর পাখিডাকা নির্জনতা ছেড়ে এক শিল্প নগরীর পথে এসে পড়েছে। ভোঁ বাজবে একটু পরে। হাজার হাজার রাত-জাগা মানুষ টিফিন ক্যারিয়ার সাইকেলে ঝুলিয়ে ঘরমুখো ছড়িয়ে যাবে পিঁপড়ের মতো কারখানাগুলো থেকে বেরিয়ে। খিদে পাবে কারো, কারো তৃষ্ণা; কারো কাম। নিবৃত্তি আর ক্ষিদে, ক্ষিদে আর নিবৃত্তি; এরই নাগরদোলায় দুলবে এরা।

আ গ্যায়া। ট্যাক্সিওয়ালা বললো।

হাঁটা হলো না এবারে অগ্নিশিখার সঙ্গে হাতে হাত ধরে। চুমু খাওয়া হলো না হাতের পাতের পিঠে।

ডাইরি

তিস্ রুপাইয়া।

ট্যাক্সিওয়ালা বললো।

চারধারে শোরগোল। হাঁকাহাঁকি। ডাকাডাকি। কত জায়গায় যাবার জন্যে হাজার মানুষের দৌড়োদৌড়ি। অথচ এদের বেশির ভাগেরই প্রকৃত কোনো গন্তব্য নেই। বৃত্তের মধ্যেই দৌড়ে বেড়াচ্ছে সারাটা জীবন।

তিস্ রুপাইয়া।

ট্যাক্সিওয়ালা আবার বললো।

কুড়ি টাকা কাল দিয়েছিলো। আরো ত্রিশ টাকা দিয়ে নেমে গেলো ব্যাগটা হাতে করে। স্টেশানে ঢুকে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটলো একটা। একটা সময় ছিলো যখন কখনও এসি ফারস্ট ক্লাস ছাড়া ট্রেনে চড়তো না অমু। এখন সেই অমু ঘোষ মরে গেছে। কোনোই দুঃখ নেই অবশ্য সে জন্যে। সত্যিই নেই। আর্থিক অবস্থাটা তার নিজস্বতাকে একটুও বদলাতে পারেনি। অথচ ও জানে যে, অধিকাংশ মানুষকেই এই হেরফের প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। এবং জানে বলেই ওকে যে প্রভাবিত করেনি তা জেনে আনন্দিত হয়।

চা খেলো এক কাপ। তারপর ট্রেন এলে, জানালার দিকের একটি সিট দেখে গিয়ে বসলো।

ছটা বাজছে। নীলডিতে এখন সকাল হয়েছে। দলমা রোড, ঝিলম্ রোড, ভিয়াস্ রোড, রাভি রোড, খড়কাই রোড সব রাস্তার বাংলোগুলিতেই জীবন জাগছে ভোরের পাখির মতো। অস্ফুটে। যেমন প্রতিদিনই জাগে। পিকনিকে যাবার প্রস্তুতিও চলছে কিছু বাংলোতে। আজ রবিবার।

ঠিক আটটাতে ওদের আসার কথা ছিলো। গোলমুড়ি ক্লাবে। আটটার সময় ট্রেনটা কোথায় পৌঁছবে কে জানে? ঘাটশীলা? না ঝাড়গ্রাম?

অমু ঘোষের বাঁদিকের বুকে একটু ব্যথা ব্যথা করে উঠলো। সঙ্গে ওষুধ নেই। কাল রাতেই ফুরিয়ে গেছে। বাঁদিকে কণ্ঠার কাছটাও ব্যথা ব্যথা করতে লাগলো একটু।

পিঠটা এলিয়ে দিলো সিটে অমু। ট্রেনটা ছেড়ে দিলো।

টাটানগর স্টেশান থেকে নীলুডির গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি কিছুই দেখা যায় না। বোঝারও উপায় নেই যে অমন সুন্দর একটি এলাকা আছে এই ইস্পাত নগরীতে।

বুকের মধ্যে ব্যথাটা ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্রতর হতে লাগলো। কাল সারা রাতই জেগেছিলো ও। ট্রেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন লাফিয়েই নদীর উপরের ব্রিজটা পেরুলো। সেই ঝাঁকুনিতে ব্যথাটাও যেন অসহ্য হয়ে উঠলো। কুঁজো হয়ে গেলো এতো মানুষের ভালোবাসা পাওয়া অমু ঘোষ। মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো। মনে হলো, এবার ফেরার সময় হলো। গবুর ভুপেন বাবুর কথামতোই "এক্সপায়ারী ডেট" এসে গেছে।

মেঘের মতো দলমা রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে লাইনের বাঁ পাশে। তার চুড়োয় ওঠার কথা ছিলো ওর। হলো না। সব চুড়োই এখন ওর কাছে আউট অফ-বাউন্ডস্ হয়ে গেছে। টিরিং-এর কান্ট্রি-হাউসে ক্যান্ডেল-লাইট ডিনারের লোভ দেখানো মহিলা জানেন না তা! মহিলা ব্রয়লার চিকেন চেনেন। প্রেম চেনেন না।

ট্রেনটা এবারে শহর ছাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লো। সকালের রোদ শিশিরভেজা বন-প্রান্তরে হাজার হীরের ঝিকিমিকি তুলেছিলো।

অমু সোজা হয়ে বসলো আবার। ঐ ঠান্ডাতেও জানালাটা কষ্ট করে খুলে দিলো। কিন্তু পরক্ষণেই অন্য যাত্রীদের আপত্তিতে বন্ধ করে দিতে হলো। এখনও বেশ ঠান্ডা বাইরে। সমস্ত শরীরে, মনে অমুরও শীত। উষ্ণতা ছেড়ে যাবার সময় এমনই হয়।

তবু ঐ এক ঝলক হাওয়াতেই বুকের কষ্টটা কমলো।

ট্রেন যত জোরে এগোতে থাকলো, গাছপালা মাঠ-বাড়ি-পাহাড়ও ততোই দ্রুত পেছিয়ে যেতে লাগলো। এখন আর ইচ্ছে করলেও অমু পেছোতে পারবে না। ফেরা যাবে না নীলুডিতে। হয়তো কোনোদিনই। ঐ নীলুডিতে।

এক দৃষ্টে বাইরে চেয়ে বসে রইলো অমু। কামরার বাইরেটা ক্রমশই উজ্জ্বল হতে থাকলো।

আর ওর ভেতরটা অন্ধকার।

কাঁকড়িকিরা

খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪৩

আমাদের এই কাকিড়িকিরা গ্রামটি বেশ। গ্রাম ঠিক নয়, আধা শহর। পোস্ট অফিস আছে, বাজার, দোকান, থানা ; হাসপাতাল। সবই আছে। অথচ গভীর জঙ্গলে। এ গ্রামে হিন্দুই বেশি কিন্তু সদরের হিসেবে মুসলমান অনেক বেশি হিন্দুদের চেয়ে। জঙ্গলে শাল, সেগুন, বহেরা, কুসুম, শিমুল ইত্যাদি কত গাছ আছে। বসন্তে কুসুমের পাতারা লাল সিল্কের মতো পাতার নিশান নিয়ে এক মাইল দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। পলাশ, শিমুলের আর অশোকের কৃষ্ণচূড়ার আর বোগেনভোলিয়ার রঙে ঝিম ধরে যায়। শিউলি ফুল কুড়িয়ে তার বোঁটা সেদ্ধ করে আমরা রঙ বানিয়ে পিচকিরী দিয়ে সেই রঙ খেলতাম।

এখানের বাসিন্দা বিহারী, বাঙালী, কিছু ওড়িয়া এবং বেশিই আদিবাসী। সাহেবও কিছু আছে। তবে বরাবর এই গণ্ডগ্রামে বেশি থাকে না। সার্কিট হাউস আর ডাকবাংলো দু'একদিনের জন্যে সরগরম করে তারা চলে যায়। দুটি স্কুল আছে এখানে। একটি হিন্দী মিডিয়াম ও একটি বাংলা মিডিয়াম। আমরা বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র। স্কুলের নাম শিউদেও প্রসাদ হাইস্কুল ফর বয়েজ। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে এই স্কুল বানানো হয়েছিলো। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই সিঁড়িগুলো বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো নড়বড় করে ঠক-ঠক শব্দ করে ওঠে। তবু এই স্কুল আর স্কুলের নানা ধরনের ছাত্র আর স্যারেদের সঙ্গে কয়েকটি ঘণ্টা দিনের মধ্যে কাটানোই ছিলো আমাদের প্রত্যেকের জীবনের এবং দিনের সবচেয়ে আনন্দঘন সময়।

হুলো এবং বমগার্টেন স্যার

সেদিন ক্লাসে ঢুকেই হুলো বললো, এই রিভে, এক পয়সা চাঁদা দিবি।

কিসের ?

মারবো এক গাট্টা। হুলো সর্দার চাঁদা চাইছে, দিবি। তার আবার অত কৈফিয়ত কিসের রে ?

ঠিক আছে।

কথা না বাড়িয়ে বললাম আমি।

আমার পরে যারাই ক্লাসে এলো তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই এক পয়সা করে চাঁদা নিলো হুলো। এই চাঁদা যে রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রমে যাবে না তা আমাদের সকলেরই জানা ছিলো। কিন্তু হুলোকে প্রশ্ন করে কেউই জান খোয়াতে রাজী ছিলো না। চাঁদার টাকাটা অবশ্য কিভাবে খরচ হয় সে সম্বন্ধে সকলের মনেই তীব্র কৌতুহল ছিলো।

হুলো এ নিয়ে পাঁচবার ক্লাস নাইনেই আছে ফেল করে। চেহারাও তার লম্বা চওড়া। পরনে একটি ছোট্ট হাফ-প্যান্ট। হাফ হাতা দিশী ছিটের শার্ট। বিদিশী জিনিস ব্যবহার করতো না হুলো। ডান হাতের বাহু থেকে কনুই অবধি নানা মাপের তাবিজ ও মাদুলি। তার দিদিমার সে চোখের মণি।

এর আগে যিনি হেডমাস্টারমশাই ছিলেন তিনি তাকে বলেছিলেন, এবার স্কুল ছেড়ে দাও।

হুলো বলেছিলো, পাশ করে সাহেবের আর ব্যবসায়ীর কেরানী হবার জন্যে সে পড়াশোনা করে না। কারো বাপের পয়সাতেও সে পড়ে না। পড়ে দিদিমার ক্ষেতি-জমিনের রোজগারে। অতএব স্কুল ছাড়া না ছাড়া তার ইচ্ছে।

মণি স্যার একবার দয়াপরবশ হয়ে তাকে ভূগোলে দশ নম্বর গ্রেস দিয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। হুলো মণি স্যারকে সকলের সামনেই বলেছিলো, "হুলো কারো দয়ার কাঙাল নয় স্যার। যেমন পরীক্ষা দিয়েছি তাতে পাশ আমি করতেই পারি না। করুণা চায় না হুলো কারোই। যেমন লিখবো তেমন নম্বর চাই।"

স্বাধীনতা-জ্ঞান, সে নিজের স্বাধীনতাই হোক, কী ব্রিটিশদের পদানত দেশের, অত্যন্ত টনটনে ছিলো হুলোর।

পেটো আমাদের গোলকীপার। তার গায়েও জোর কম নেই। সে বলেছিলো, জানলি কি করে তুই যে ভূগোলে ভালো পরীক্ষা দিসনি ?

জানি। ক্যাবলার মতো কথা বলিস না। পরীক্ষা দিলাম আমি। আর জানবি তুই !

কী করে জানলি ?

হুলো হেসে বললো, প্রশ্ন ছিলো, "আইসল্যান্ড কোথায়" ? এর জবাবে আমি লিখেছিলাম, পারভেংগঞ্জের পাত্রদের আইস-ফ্যাক্টরীতে।

"বিষুবরেখা কি ?"

তার উত্তরে আমি লিখেছিলাম, বিষ্ণু যেখানে মহাদেবের ঘাড়ে ছিঁপ করে দিয়েছিলেন।

"সাভানাল্যান্ড পৃথিবীর কোথায় কোথায় আছে ?"

আমার উত্তর ঃ কাঁকড়িকিরা জঙ্গলের পাদদেশে আর লেনিনের দাড়িতে।

এসব প্রশ্ন এবং উত্তর সবই ছিল অবশ্য নিচু ক্লাসের।

বলেই, মণি স্যার চলে গেলে, ও হেসে বলেছিলো, যে শালা মাস্টের আমাকে পাশ করায় তার টেংরি খুলে নেবো আমি।

হুলো, হুলোই। পৃথিবীর আর কোনো দেশে হুলোর মতো কোনো ছাত্র ছিলো কিংবা আজও আছে বলে আমি অন্তত জানি না।

হুলোর পরীক্ষার খাতা নিয়ে মাস্টারমশায়েরা তাঁদের কমনরুমে রীতিমতো গবেষণা চালাতেন মিটিং বসিয়ে, যেমন চালাতেন খুব ভালো ছাত্রদের খাতা নিয়ে।

অঙ্কর পরীক্ষার প্রশ্ন ছিলো, "শূন্যের গুণফল কি ? শূন্যকে অন্য যে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে তার ফল কি হয় ?"

উত্তরে, হুলো লিখেছিলো ; বাতাবী লেবু।

ইতিহাসের প্রশ্ন ছিলো একবার, "আকবরের বাবা কে ছিলেন ? তাঁর কি কি গুণ ছিল ?"

হুলো লিখলো, রোকীব মিঞা। ভালো তামাক সাজে এবং ফতুয়া বানায়।

আসলে আকবর আমাদের স্কুলের পাশের দর্জি। তার বাবার নাম ছিলো রোকীব।

স্বাস্থ্যর পরীক্ষায় একবার প্রশ্ন ছিলো, প্রভাতী ব্যায়াম কি কি ? এবং কোন ব্যায়ামে বুকের জোর বাড়ে ?

হুলো লিখলো, দাঁত মাজা, বাথরুম যাওয়া এবং খালি পেটে তিনখানা বিড়ি খাওয়া।

এসবের মানে এই নয় যে ও কিছুই জানতো না নিচু ক্লাস থেকেই। ক্লাস নাইন অবধি একবারও ফেল না করে উঠে নাইনে এসে ও ফিট করে গেলো। তখন ওকে দিয়ে ঠিক উত্তর লেখায় কার সাধ্য।

একবার আমাদের ড্রয়িং স্যার, ক্লাস টু কী থ্রীতে ঠিক মনে নেই, ব্লাকবোর্ডে একটি সিংহ এঁকে আমাদের বললেন, তোমরা সিংহর শরীরের যে কোনো একটি অংশ নিখুঁতভাবে আঁকো। আমরা কেউ কান আঁকলাম, কেউ পুরো মুখ, কেউ থাবা, কেউ লেজ। সকলেই খাতা দিয়ে দিলাম আঁকা হয়ে গেলে। হুলোর আঁকা আর কিছুতেই শেষ হয় না। লাস্ট বেঞ্চে বসে সে তার খাতায় ক্রমাগত কী যেন এঁকে যাচ্ছে আর ক্রমাগত রাবার দিয়ে মুছে যাচ্ছে। ঘষে ঘষে রাবার ক্ষয়ে এলো, পাতারও ছিঁড়ে আসার অবস্থা। এদিকে ঘণ্টাও পড়ে যায় আর কী! আর্ট স্যার বললেন, কী হচ্ছে কি হুলো?

হুলো বললো, আজ্ঞে আপনি যা বলেছেন তাই হচ্ছে স্যার। একটু মনোযোগ দিয়ে আঁকছি শুধু।

এতক্ষণ?

হুলো যা করে, ভালো করেই করে স্যার।

যখন ঘণ্টা পড়ে গেলো, আর্ট স্যার এবং আমাদের সকলের বিস্ফারিত চোখের সামনে হুলো তার খাতাটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আর্ট স্যারের টেবলে ফেলে দিয়ে বললো, এই নিন স্যার। এর চেয়ে ভালো আর কারো দ্বারাই হতো না।

আমরা সকলে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, রাবারের ঘষায় ক্ষত-বিক্ষত পাতার বুকে একটি ছোট্ট সোজা দাগ।

আর্ট স্যার বললেন, এ কী! কি আঁকলে তুমি এতক্ষণ ধরে?

হুলো মিটিমিটি চোখে চেয়ে বললো আপনিও ধরতে পারলেন না স্যার?

না।

এটি হচ্ছে সিংহের লেজের একটি চুল।

একটি চুল! স্বগতোক্তির মতো আর্ট স্যার নিজের চুল চুলকে বললেন।

ইয়েস স্যার।

হুলো বললো।

কিন্তু আজকের চাঁদাটা সকলের কাছ থেকে কেন যে নেওয়া হলো তা জানা গেলো না। আমাদের স্কুলে এক দুজন ছাড়া বড়লোক ছাত্র কেউই ছিলো না। ঐ এক পয়সা দিয়েই টিফিনের সময় কেউ ট্যাপারী খাবে, কেউ আমসত্ত্ব, কেউ বা আলু-কাবলি বা ফুচকা। তখন এক পয়সারও একটু দাম ছিলো। এতো জনকে অভুক্ত রেখে হুলো যে কোন মহান কর্ম করতে চলেছে খিদে ভুলে গিয়ে আমরা তা দেখবার জন্যেই উৎসুক হয়ে রইলাম।

ক্লাস বসবার একটু আগেই হুলো চলে গেলো। বললো, একটু পোস্টাপিসে যাচ্ছি। আমাদের স্কুলের লাগোয়াই ছিলো পোস্টাপিস। এই সময়ে পোস্টাপিসে হুলো কোন্ মহান কর্ম করতে গেলো আমরা বুঝতে পারলাম না। হুলো যখন ফিরে এলো তখন বমগার্টেন স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। ঐ স্যারের নাম ছিলো গোপালচন্দ্র দাশ। ওঁর বাবাও আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। 'কাউন্ট অফ শ্যাটো নয়ার' এমন গম্ভীরভাবে পড়াতেন যে আমরা যেন সেই বিদেশের দুর্গের পটভূমিতে দাঁড়ানো লম্বা দাড়িওয়ালা কাউন্টকেই দেখতে পেতাম। গোপালবাবুর

বাবা হঠাৎই মারা গেলেন। এবং স্কুলের যাঁরা পরিচালক তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর সদ্য বিয়ে পাশ করা ছেলেকে ও'রই জায়গাতে বহাল করলেন ইংরিজিই পড়াতে, যতদিন না উনি ও'র যোগ্য কোনো চাকরি খ্‌'জে নেন।

ভদ্রলোক গোপালচন্দ্র, লাজ্‌ক প্রকৃতির, ভালো মান্‌ষ এবং তখনও সবে বাবার শ্রাদ্ধ-করে-ওঠা ন্যাড়া মাথা নিয়ে ক্লাসে আসেন। বয়সে উনি হয়তো হ্‌লোর চেয়ে ছোটই ছিলেন। কিন্তু সে কারণেই হোক কী অন্য যে কারণেই হোক, প্রথম দিন থেকেই হ্‌লো সেই ছোট স্যারকে নস্যাৎ করতে লাগলো। উনি নাকি সদবের কোন্‌ না কোন্‌ বাঘা কলেজ থেকে পাশ করে এসেছেন। সায়েবদের মতো ইংরিজি বলেন।

আমাদের বললো হ্‌লো যে, এ'কে না তাড়ালে আমার নাম হ্‌লো বাঁড়্‌জ্যে নয়। আমাদের কিন্তু স্যারকে ভালোই লাগতো। হ্‌লো কেন যে স্যারের নাম এক অস্ট্রিয়ান ব্যারনের নামে রাখলো 'বম্‌গার্টেন' তা একমাত্র হ্‌লোই বলতে পারে। গোপালবাব্‌র গলার স্বরটিও ছিলো তাঁর বাবারই মতো গমগমে। সাদা খদ্দরের ধ্‌তি আর লম্বা ঝ্‌লের পাঞ্জাবি পরে আসতেন ভদ্রলোক। গান্ধীজীর ভক্ত ছিলেন নাকি! কে জানে! আমরা জানতাম যে গান্ধীজীকে হ্‌লোর বিশেষ পছন্দ হতো না। ঐ সময়ে এই ব্যাপারটার মতো সাংঘাতিক অপরাধ আর দ্‌টি ছিলো না।

হ্‌লো যখন পোস্ট অফিস থেকে ফিরলো তখন ক্লাস শ্‌র্‌ হয়ে গেছে। ইংরিজির স্যার পড়া থামিয়ে বললেন, হোয়ার হ্যাড উ্য বীন ?

হ্‌লো বললো, আমরা বাঙালীর ছেলে। অত ইংরিজি ফ্‌টোবেন না।

ইন ইংলিশ ক্লাস উ্য শ্‌ড স্পীক ওন্‌লি ইন ইংলিশ।

স্যার দ্‌ কাঁধ শ্রাগ করে ইংরেজদের মতোই ইংরিজি বললেন।

হ্‌লো বললো, আমরা ট্যাঁশ নই স্যার। আমরা বাংলা দিয়েই ইংরেজি বলি।

বলেই, নিজের জায়গায় না বসেই বললো, একট্‌ বাইরে যাবো স্যার ?

কোথায় ?

ছোট বাইরে।

স্যার তির্যক চোখে চেয়ে কী একট্‌ ভাবলেন। তারপর 'না' বলে এই সাংঘাতিক ছাত্রকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না ভেবে বললেন, কাম ব্যাক ইন আ মিনিট।

হবে না স্যার। পোনে দ্‌ মিনিট কমপক্ষে লাগবে স্যার।

কেন ?

অতখানি বারান্দা আপনার পেরিয়ে যাব স্যার, আপনার প্যাণ্টের বোতাম খ্‌লবো স্যার, তারপর স্যার আপনার ··

এনাফ্‌ ইজ্‌ এনাফ্‌। ন্যাউ উ্য গো।

বিরক্ত হয়ে বললেন 'কাউন্ট বম্‌গার্টেন' স্যার।

হ্‌লো চলে গেলো।

স্যার প্লাটফর্মের উপরে—পাতা চেয়ারে বসে টেবলের উপর দুটি হাত রেখে এবং দুটি হাতের পাতায় বই ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাদের পড়াচ্ছিলেন। আমরাও শুনছিলাম মনোযোগের সঙ্গে।

সামান্য সময় পরই হঠাৎ খোলা দরজায় একটি ছায়ামূর্তি দেখা দিলো। তারপর আমরা কিছু বোঝার আগেই আমাদের হতবাক করে দিয়ে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেলো। হুলো হামাগুড়ি দিয়ে বমগার্টেন স্যারের ঠিক পেছনে আস্তে আস্তে এসে পেঁছে গেলো এবং থেবড়ে বসে পড়লো মেঝেতে। বসে পড়েই, বাঁ হাতের আঁজলা-ভরা জলে ডান হাত দিয়ে নানারঙা ও নানারকম পোস্টাল স্ট্যাম্প, যে প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ও সিংহর লেজের চুল এঁকেছিলো, সেই রকম মনোযোগ সহকারেই বমগার্টেন স্যারের ঝুলে-থাকা পাঞ্জাবিতে সমানে সেঁটে যেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর স্যারের খেয়াল হলো যে হুলো 'ছোট বাইরে' সেরে আসেনি। তখন ক্লাসের মনিটর কনককে উনি পাঠালেন সরেজমিনে তদন্ত করে আসতে। ভালোমানুষ বেচারী কনক তার মাথা ডান দিক বাঁ দিকে একবারও না-ঘুরিয়ে হুলোর বাঘের মতো নীরব উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে ল্যাভাটরির দিকে দ্রুত চলে গেলো।

হুলো বসেছিলো স্যারের একেবারে পেছনে। স্যারের পক্ষে ওকে দেখা সম্ভব ছিলো না। সম্ভব ছিলো না তা বলবো না, কিন্তু আদৌ যদি আমরা আমাদের মুখ-চোখের ভাবে ওর উপস্থিতি কোনোক্রমে ফাঁস করে দিতাম। কিন্তু আমাদের কারো ঘাড়ে দুটি মাথা ছিলো না যে তা করি। হুলোর আদেশ মানে হুলোর আদেশ!

স্ট্যাম্পগুলো হুলো লাগাচ্ছিলো স্যারের পাঞ্জাবি তুলে তুলে যাতে পাঞ্জাবিতে একটুও টান না পড়ে। সব স্ট্যাম্প লাগানো হয়ে গেলে পেছন দিকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো হুলো ক্লাসরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলো যখন তখন আমরা ইংরিজি পাঠের খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গাতে আছি।

পরক্ষণেই কনকের সঙ্গে হুলো প্রবেশ করলো।

কাউন্ট বমগার্টেন স্যার বললেন, হোয়াট আর ঊ্য আপটু, ইয়াংম্যান?

হুলো বললো, আই ওন্ডার দ্যান ঊ্য। শো রেসপেক্ট।

ইংরিজিটা হুলো আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বলতো। ও খারাপ সেজে থাকতো। কিন্তু ইচ্ছে করেই ওরকম করতো।

হোয়াই ডিড ঊ্য টেক সাচ আ লঙ টাইম?

হুলো বললো, ঠাকুমা বুলুথর কলাই খাইয়েছিলো স্যার। আমার কিডনীতে স্টোন আছে তো! তাই বেশি…

বমগার্টেন স্যার বললেন, হোয়াই ডু ঊ্য কাম টু স্কুল? মাই ফাদার টোল্ড মী বাউট ঊ্য। দ্যা মোস্ট নোটোরিয়াস বয়।

হুলো নোটোরিয়াস কথাটা কানে না তুলে রেড-ইন্ডিয়ানদের মতো ইংরিজি বললো, ইয়েস! আই। মেরিটোরিয়াস।

হোয়াট ? মেরিটোরিয়াস !

বমগার্টেন স্যার বললেন।

হুলো বললো, ইংরিজিতে গালাগালি দেবেন না স্যার। ইংরিজি গালাগালিটাই আমি শুধু শিখেছি ইংরিজি-জানা বন্ধুদের কাছ থেকে। ওরা বলে, ঐটুকুই শেখায় নাকি ওদের স্কুলে। আর টাইবাঁধা, টোস্ট প্রোপোজ করা, ইস্ত্রী-করা জামা-কাপড় পরে আসা, কথায় কথায় 'থ্যাঙ্ক্ উ্য' বলা, বাবাকে ড্যাডী, মাকে মাম্মী, পিসী মাসীকে আণ্টি বলা, এই-ই সব। ইংরিজি গালাগালিতে আমিও তুবড়ি ছোটাতে পারি।

বমগার্টেন স্যার হতবাক হয়ে গিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক উ্য' বলা শেখাটা খারাপ ? ভদ্রতার তো কিছুই শেখো না তোমরা ?

হ্যাঁ, বলাটা খারাপ। আলবাৎ খারাপ।

কিছুক্ষণের জন্য ইংরিজি পড়ানো ভুলে চোখ কপালে তুলে বমগার্টেন স্যার বললেন, 'থ্যাঙ্ক উ্য ?' মাই গড ! থ্যাঙ্ক উ্য বলা কেন খারাপ ?

হুলো ডান প্যাণ্টের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে তার সঙ্গে একটা নোংরা ছেঁড়া কাপড় বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললো, একটু নেবেন নাকি স্যার ? ব্রেইন খুলবে।

বমগার্টেন স্যার হতবাক হয়ে গিয়ে বললেন, তোমারই মতো। নাস্টি। নাস্টি।

ঠিকই স্যার। শুভঙ্করীর আর্যা আর সাহেবদের বা দিল্লীর নবাবদের বাপ-ঠাকুর্দার আর তাদের কীর্তি-কলাপ তোতাপাখির মতো মুখস্থ রাখতে পারাটাই ব্রেইনের একমাত্র প্রমাণ নয়। যাক, এ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। 'থ্যাঙ্ক উ্য' বলা এই জন্যে খারাপ যে সেটা আমাদের কালচার নয়। আরেকটা কথা। আপনার বাবাও কিন্তু নস্যি নিতেন। সত্যিই ব্রেইন খোলে।

প্রায় অজ্ঞান হবার যোগাড় হয়ে বমগার্টেন স্যার বললেন, কী বললে তুমি, তোমাদের কী নয় থ্যাঙ্ক উ্য বলাটা ?

কালচার নয়। সংস্কৃতি ; সহবৎ নয় আমাদের।

আমাদের সহবৎ তাহলে কি ?

আমরাও অবশ্য থ্যাঙ্ক উ্য বলি। কিন্তু তা চোখ দিয়েই বলি। আপনি যখন কাউকে ফুলের তোড়া দেন।

আমি ?

আহা ! কথার কথা। কাউকে না কাউকে দেন তো, তখন তিনি কি তাঁর চোখ দিয়ে কিছুই বলেন না আপনাকে ? যখন ভিখিরিকে ভিক্ষা দেন তখন কোনো কোনো ভিখিরি বলে, 'জয় হোক' বাবা ! সেও তো থ্যাঙ্ক উ্যই ! নাকি ? আমরা একটা আলাদা দেশ, আলাদা জাত, আলাদা আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি সব। আমরা খামোকা ইংরেজ ব্যাটাদের নকল করে তোতাপাখির মতো "থ্যাঙ্ক উ্য" বলতে যাবোই বা কেন ?

বমগার্টেন স্যারের আক্কেল হুলোর মুখে : কথা শুনে গুড়ুম হয়ে গেলো।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি বললেন, চিবিয়ে চিবিয়ে, সাহেবদের মতো করে, ওয়েল! ওয়েল! আই সী! উ্য হ্যাভ আ পয়েণ্ট। আই উইল ডিসকাস দিস উইথ উ্য টুমরো।

হুলো আরেক টিপ নস্যি নিয়ে বললো, কাল থেকে আপনি তো আর স্কুলেই আসছেন না স্যার।

হোয়াট? কাল থেকে। কেন? এ কথা বলছো কেন? গো। গো। যাও তুমি নিজের সীটে গিয়ে বোসো। মিছিমিছি অনেক ডিসটার্বেন্স ঘটিয়েছো ক্লাসের।

হুলো নিজের সীটে গিয়ে বসার পরে বমগার্টেন স্যার একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বাই দ্যা ওয়ে হোয়াটস ইওর নেম?

হুলো, স্যার।

ডোণ্ট বী সিলি! হুলো কারো নাম হতে পারে না।

কেন হতে পারে না? আপনার এমন গুড়ে-পড়া নেংটি ইঁদুরের চেহারাতে যদি আপনার নাম স্যার গোপাল হতে পারে তবে…নাম দিয়ে কিছুই যায় আসে না স্যার!

নামের একটা গল্প আছে স্যার।

সে তো শেক্সপীয়রও বলে গেছেন।

এ দিশী গল্প স্যার। ওসব নয়।

কি গল্প শুনি।

একজন লোকের নাম ছিলো ঠনাঠনদাস।

কি নাম?

ঠনাঠনদাস স্যার। তার মা-বাবার কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিলো না স্যার।

মা-বাবাকে সম্মান করে কথা বলবে।

আরে আমার মা-বাবা আছেন থোরাই! সে তো ঠনাঠনদাসেরই না মা-বাবা হচ্ছেন স্যার!

হ্যাঁ। তারপর বলো।

দাঁড়ান স্যার। আরেক টিপ নস্যি নিয়ে নি। সুরজ ব্যাটার দোকানের নস্যি এমন মিইয়ে যায় আজকাল যে নেশাই হয় না। আর কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ না করলে নস্যি নিয়ে লাভই বা কী বলুন স্যার?

বলেই, নস্যির কৌটো বের করে আরেকবার জম্পেস করে নস্যি নিলো।

বললো, তা ঠনাঠনদাসের মনে তো মহাদুঃখ। এমন নাম নিয়ে বেঁচে থাকা না-থাকা সমান। তাই সে একদিন ঠিক করলো আত্মহত্যা করবে। ঠিক করে নিয়ে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে। বন পেরুলেই গঙ্গা-মাঈ। খুব উঁচু পার থেকে জলে ঝাঁপ মারবে। ঝপাং। জায়গাটা চুনারের কাছাকাছি। আপনি চুনার ফোর্ট কি দেখেছেন স্যার?

না।

এবার দেখে নেবেন স্যার। কাল থেকে তো হাতে অফুরন্ত সময়। জলটাও পেটের পক্ষে ভালো।

বড় বাজে কথা বলো তুমি। যা বলছিলে বলো।

হ্যাঁ, স্যার। তা যেতে যেতে ঠনাঠন্‌দাস দেখলো যে একটা লোক মরে গেছে। তার কুঁড়েঘরের সামনে খাটিয়াতে তাকে শুইয়ে রেখেছে চাদর মুড়ি দিয়ে। আর তার বৌ কেঁদে কাঁদছে এক হাতে খাটিয়ার পায়া জড়িয়ে আর অন্য হাতে তার পা জড়িয়ে। ঠনাঠন্‌দাস তখন অন্য যে চার-পাঁচজন আত্মীয় সেখানে ছিলো তাদের শুধোলো, লোকটার নাম ছিলো কি?

তা, তারা বললো, অমরনাথ।

ঠনাঠন্‌দাস বললো, মনে মনে বললো, লেহ, লট্‌কা! অমরনাথ যার নাম সেই কী না মরে গেল!

সে জায়গা ছেড়ে এগোলো ঠনাঠন্‌দাস। একটু দূরে গিয়ে দেখলো, ছেঁড়া একটা ফতুয়া আর নোংরা ছেঁড়া ধুতি হাঁটুর ওপরে কষে বেঁধে একটি রোগা লোক ঘাস কাটছে জঙ্গলের মধ্যে। দেখেই বোঝা গেলো যে বেচারী বড় গরীব। বোধহয় ঐ ঘাস বিক্রী করবে বাজারে। কাঁড়া ভইষের খাওয়ার জন্যে।

ঠনাঠন্‌দাস তার কাছে গিয়ে শুধোলো, আরে এ ভাইয়া। তোমার নাম কি গো?

লোকটা মুখ না তুলেই বললো, ধন্‌পত্‌।

ঠনাঠন্‌দাস ভাবলো, হায় ভগোয়ান! যার নাম কী না সাক্ষাৎ ধনপতি কুবের, আর সে এই গা-ছমছম জঙ্গলে বসে একা একা ঘাস কাটছে আঁটি করে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে কোনোক্রমে দিন গুজরান্‌ করবে বলে!

আরও একটু এগোতেই ঠনাঠন্‌দাস দেখলো একটা চৌমাথা। সেখানে একটি মেয়ে ছেঁড়া শাড়ি পরে তিনভাগা কুচো মাছ শালপাতার দোনায় নিয়ে বসে আছে। বিক্রীর জন্যে। ঠনাঠন্‌দাস কাছে যেতেই সে বললো, এক আনা ভাগা।

ঠনাঠন্‌দাস বললো, মাছ নেবো না। তোমার নাম কি বলো আগে? তুমি কি আমাদের গিরিধারী চাচার মেয়ে?

মেয়েটি বললো, আমার নাম লছ্‌মী। আমার বাবা মরে গেছে। বাবার নাম ছিলো মহাদেও।

বাচ্চলে! মহাদেবের মেয়ে লক্ষ্মী যার নাম, তারই কিনা এই হাল!

এই সব দেখেশুনে ঠনাঠন্‌দাস সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট-টার্ন করলো সেখান থেকে আত্মহত্যার মতলব ছেড়ে-ছুড়ে। বাড়িতে ফিরে আসার সময় মহানন্দে গাইতে গাইতে এলো পথে :

"অমরনাথ যো সো মর্‌ গ্যয়ে হ্যায়
ধন্‌পত্‌ কাট্‌তা হ্যায় ঘাস;
লছ্‌মী যো, সো মছ্‌লি বিক্‌তি হ্যায়

ভালাই ঠনাঠন্‌দাস।"

ক্লাসসুদ্ধু ছেলে হেসে উঠলো হুলোর গল্প শুনে।

বম্‌গার্টেন স্যার একটু মুচকি হেসে হুলোকে বললেন, টু ইওর সীট প্লীজ।

হুলোর কোনো বিশেষ সীট ছিলো না। আমাকে ওর কোমর দিয়ে এক হ্যাচ্‌কা ঠেলা মেরে আমার পাশেই বসে পড়লো।

একটু পড়ানোর পরই বম্‌গার্টেন স্যার পড়া থামিয়ে হুলোকে বললেন বাই দ্যা ওয়ে, তুমি ঐ কথাটি বললে কেন?

কোন্‌ কথা? স্যার?

কাল থেকে আমি স্কুলে আসবো না।

আপনি যে কাল অথবা আজই রেজিগনেশান দেবেন স্যার।

রেসিগনেশান? আমি? তুমি কী করে জানলে? হাউ ডেয়ার উ্য?

আমি ফেস-রীডিং করতে পারি স্যার।

ফেস-রীডিং?

ইয়েস স্যার।

ওকে, লেটাস গেট ব্যাক হোয়ায়ার উই ওয়্যার। বয়েজ...

ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। ভাঙা ধুলোভর্তি সিঁড়ি দিয়ে সব ছাত্ররা একতলায় নামছে হুল্লোড় করে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে। এরই মধ্যে বম্‌গার্টেন স্যার চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। পেছনে ফিরে দাঁড়াতেই ক্লাসসুদ্ধু ছেলে হো হো করে হেসে উঠলো। স্যারের সাদা পাঞ্জাবির পেছনে "বাই এয়ার মেল", "প্লীজ পোস্ট আর্লি টু ক্যাচ দ্যা মেইল", এক পয়সা, দু পয়সা, তিন পয়সার ডাকটিকিটে একেবারে ভর্তি।

সিঁড়িতে অন্যান্য নীচু ক্লাসের ছেলেরা স্যারের পাঞ্জাবি দেখে হাততালি দিতে লাগলো। অন্যান্য তিন-চারজন স্যারও ছিলেন। বেচারী স্যারে স্বল্পদিন হলো প্রথম ক্লাস নিচ্ছেন, মানুষটিও সত্যিই ভালো, পড়ানোও চমৎকার। যখন একতলার ল্যান্ডিং-এ নামলেন বম্‌গার্টেন স্যার, তখন দেখলাম তাঁর চোখে জল। খুবই দুঃখ হলো ওঁর জন্যে। আর রাগ হলো হুলোর উপরে।

বম্‌গার্টেন স্যার সত্যিসত্যিই স্কুল ছেড়ে দিলেন। পরদিন থেকে আর এলেন না। কোথায় যে হারিয়ে গেলেন ভদ্রলোক!

এই ঘটনাতে হুলোকে রাস্টিকেট করা হবে বলে কানাঘুষো শুনলাম। আমরা চুপচাপই থাকলাম। আজকাল হয়তো প্রত্যেক স্কুলেই এরকম অনেকেই হুলো আছে। জানি না আছে কিনা। এবং থাকলেও তাদের রাস্টিকেট করা মুশকিল। তবে হুলোর পেছনে কোনো রাজনৈতিক দল বা দাদারা ছিলো না। হুলো ছিলো একেবারেই একা। হুলোরই মতো। কোনো দাদা বা দলের আশ্রয় নেবার মতো কাপুরুষও ও ছিলো না। ও বলতো, দলে থাকে জানোয়ারেরা। মানুষ চিরদিনই একা। প্রত্যেক মানুষ। আমার মতো হোক কী অমানুষী মানুষের মতো মানুষই হোক।

তিন বছর আগে যিনি হেডস্যার ছিলেন তিনি হুলোকে একবার রাস্টিকেট করার চেষ্টা করেছিলেন। হুলো সন্ধ্যেবেলা তার বাড়িতে গিয়ে বলেছিলো : আমি আপনার স্কুলের টেবল-চেয়ার ঘণ্টারই মতো একটি অংশ হয়ে গেছি স্যার। অ্যান ইনসেপারেবল ফিক্সচার অফ দ্যা হাইস্কুল। যে ক'দিন দিদিমা বুড়ি বেঁচে আছে আমাকে পড়ে যেতেই হবে। সে বুড়ি পরীক্ষা-টরীক্ষা বোঝে না। আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে বুড়ি শক্ পেয়ে মারা যাবে। আমার তো আর কেউই নেই। আপনি জানেন।

হেডমাস্টারমশায় বলেছিলেন, মুশকিল তো সেটাই! তোমার গার্জেনকে ডেকে যে…

হুলো কথা কেটে বলেছিলো, স্যার আমিই আমার গার্জেন। তাই বলে যাচ্ছি, আপনি আমার পেছনে লাগবেন না। যতদিন এই হাইস্কুল থাকবে ততদিন আমিও থাকবো। আমি মরে গেলে স্কুলের সামনের তেঁতুলগাছের নীচে আমাকে পোড়াবেন স্যার। আমার পেছনে লাগলে ক্ষতি হয়ে যাবে।

হেডমাস্টারমশায় রেগে বলেছিলেন : আমার সংসারে কেউ নেই। অত ভয় আমায় দেখিও না। যা সঞ্চয় আছে তাতে একার পেট চলে যাবে। থাকবার মধ্যে এই একটি—

বলেই ডাকলেন, পিন্সি। ওমনি এক বাঘের মতো কালো কুকুর এসে হাজির। পিন্সি হুলোকে প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখে, হেডমাস্টারমশাই-এর আদেশে হুলোর পায়ের কাছে বসে পড়লো। হুলো হেডমাস্টারের কুকুরের কথা জানতো। প্যাণ্টের পকেট থেকে চারটে থিন-অ্যারারুট বিস্কিট বের করে লুকিয়ে দিলো অ্যালসেসিয়ান কুকুরটিকে।

আমাকে ভয় দেখিও না। কর্তব্যর কাছে অন্য কিছুই নয়। তোমার মতো ছেলে স্কুলে থাকলে অন্য সব ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে।

হেড মাস্টারমশাই জানলেও না যে হুলোর সঙ্গে পিন্সির ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে। হুলো মনে মনে বললো, ভালো মানুষের বাচ্চা ঘুষ খেয়ে সাপটে দিচ্ছে, আর কুকুরের বাচ্চা বলে কথা!

হুলো বলেছিলো, যারা নষ্ট হয় তারা নিজেদের জন্যেই নষ্ট হয় স্যার! যারা ভালো হয় তারাও নিজেদের জন্যেই। অন্য কেউই কাউকে ভালো বা নষ্ট করতে পারে না। আমার জন্যে আপনার স্কুলের কোনো ছাত্র ভালোও হবে না। খারাপও না।

যাও এবার। তোমার কাছে বক্তৃতা শুনতে চাই না। কাল স্কুলে পৌঁছেই তোমাকে রাস্টিকেট করার চিঠি সই করব আমি।

পরদিন হেডমাস্টারমশায় দশটাতে স্কুলে এসে পৌঁছলেন। তার পাঁচ-মিনিট পরই বেতের ধামায় অন্য ধামা চাপা দিয়ে তাঁর জন্যে একটা উপহার নিয়ে এলো একটা অচেনা ছেলে। ওটি দিয়েই সে দ্রুতবেগে চলে গেলো। হেডমাস্টারমশায় ধামা খুলে দেখলেন যে তাঁর প্রিয় কালো অ্যালসেসিয়ান কুকুরের পুরুষ্টু লেজটি তখনও তার মধ্যে নড়াচড়া করছে। একেবারে গোড়া

থেকে কাটা নিপুণ হাতে। তখনও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। সঙ্গে বাংলায় লেখা একটি চিঠি, "হেডমাস্টার, তোমায় আমিই রাস্টিকেট করলুম। পত্রপাঠ বিদেয় হও। নইলে-ল্যাজকাটা কুকুরও যাবে। ওষুধপত্র যা লাগাবার লাগিয়ে দিয়েছি। একমাত্র প্রিয়পাত্তর আর কোনো ক্ষতি হবে না।"

হুলো বিশ্বাস করতো, স্কুলে এলেই একধরনের লেখাপড়া শেখা হয়। জ্ঞান বাড়ে। নানা ধরনের ছেলের সঙ্গে মেশা যায়। নানা মাস্টারমশায়। মানুষের যা শেখার তা মানুষ অন্য মানুষের কাছ থেকেই শেখে, তাদের আচার ব্যবহার, চরিত্র দেখে ; যদি শিখতে চায়। খামোকা একগাদা বই মুখস্থ করে পরীক্ষা দেওয়া কেন ?

ভয় বলে কোনো জিনিস ওর চরিত্রে ছিলো না। ঐ একটা জিনিস যে কী তা তার শেখা হলো না, হবে না এ জন্মে। কোনো স্কুলই তাকে শেখাতে পারবে না। ভাবতাম, আমরা সবাই।

পণ্ডিতমশাই

কাঁকড়িকিরার হাইস্কুলের প্রতি হুলোর ভীষণ রকম ভালোবাসা ছিলো। হুলোর আরও একটা মস্ত গুণ ছিলো এই যে, নিজের গায়ে হাতির মতো জোর থাকলেও সে জোর সে কখনও অবলের উপরে খাটাতো না। এবং পথে ঘাটে স্টেশানে হাটে যেখানেই আমাদের স্কুলের কোনো ছাত্র বা মাস্টারমশায় বিপদে পড়তেন হুলো সঙ্গে সঙ্গে বিপত্তারণের ভূমিকা নিতো।

সংস্কৃতের পণ্ডিতমশায় ক্লাসে ঢুকতেন বেশ হালকা চালে। বেঁটেখাটো লাল টুকটুকে মানুষটি। হাঁটুর একটু নীচে ধুতি। পায়ে লালরঙা পাম্পসুর চটি। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের রাদু কোম্পানী থেকে সে চটি তাঁর কলকাতাবাসী শ্যালক প্রতি বছর উপহার দিতেন তাঁকে। নইলে কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। তার উপরে ফতুয়া। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা কদমফুলের মতো। হাতে সবসময়ই একটি বেত শোভা পেতো। চলার ছন্দে ছন্দে বেতটিও ছন্দোবদ্ধ ভাবে দুলতো। বেতস এবং সংস্কৃতজ্ঞান এ দুইয়ের এক মুহূর্তের জন্যেও ছাড়াছাড়ি ছিলো না।

আমাদের স্কুলবাড়িটা কাঁকড়ি বাজারের কাছ ঘেঁষা ছিলো। এমনিতেই কাঁকড়ি জায়গাটাই অতি ছোট। বাস-টাস যেতো আসতো না।

স্কুলের ভিতরে খেলার মাঠ, পুকুর, ব্যায়াম করার জায়গা, দারোয়ানদের থাকার ঘর ইত্যাদি আলাদা আলাদা ছিলো, কিন্তু স্কুল বাড়িটা ছিল বাজারে যাওয়ার পথের একেবারেই উপরে।

আমাদের ক্লাসে দুষ্টু ছেলেই বেশি ছিলো। এবং স্কুলটাকে স্কুল না বলে খোঁয়াড় বলাই ভালো ছিলো। মা বাবা কয়েক ঘণ্টার জন্যে দুরন্ত ছেলেদের আটকে রাখার জন্যে মাসে দু তিন টাকা মাইনে দিয়ে ছেলেদের সেই সব স্কুলে পাঠাতেন।

পণ্ডিতমশায়ের আমাদের সংস্কৃত শেখানোতে যতখানি উৎসাহ ছিলো, শিখতেও আমাদের উৎসাহ ঠিক ততটুকুই ছিলো। তাই পড়াশুনো ছাড়া ক্লাসে আর সবকিছুই হতো। মাঝে মাঝে হুলো এবং পণ্ডিতমশায় নস্য

বিনিময় করতেন। এন. সি. ভালো না পরিমল ভালো এ নিয়ে আলোচনা হতো। বাজারের কোন্ স্যাকরার দোকানে ভালো রুপোর কৌটো পাওয়া যায় তারও গল্প হতো।

হুলো বলতো, যে বছরে 'ম্যাট্রিক' পাস করবো সে বছরে আপনাকে একটা রুপোর নস্যির কৌটো দেবো স্যার।

পণ্ডিতমশায় হেসে বলতেন, ততদিন আমার এ মরদেহ ধরাধামে কি থাকবে বৎস? এ যে বড় দীর্ঘ তপস্যায় ফেললে আমাকে। সে দুর্ঘটনার আগে কি এই সুঘটন ঘটে না কোনো দৈব দুর্বিপাকে?

পরেশ নরেশ দুই ভাই ছিলো ভারী দুষ্টু। ওদের পদবী ছিলো পরামানিক। সকলে ওদের পরেপরা এবং নরেপরা বলে ডাকতো। স্বভাব ছিলো ভারী মিষ্টি। শুকনো মুখ কিন্তু সবসময় হাসিতে ভরা। পরেপরা আর নরেপরার এক নির্দোষ আনন্দ ছিলো, পণ্ডিতশায়ের ক্লাস হলেই তারা স্কুলঘরের লম্বা লম্বা ন্যাড়া শিক ধরে তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদর চড়ার মতো চড়তো আর নামতো। আসলে ওদের বাড়িতে অনেক খেজুর গাছ ছিলো। তাই বোধ হয় গাছে চড়া প্র্যাকটিস করতো।

পণ্ডিতমশায়কে প্রণব বললো, স্যার, দেখুন! পরেপরা নরেপরা কি করছে!

পণ্ডিতমশায় হেসে বলতেন, আরে করুক রে করুক! শাখামৃগ তো আমাদের সকলেরই পূর্বপুরুষ। দোষের মধ্যে ওদের দু ভাইয়ের পূর্বপুরুষের লেজ হয়তো অদৃশ্য দু এক পুরুষ হলো। আমাদের পাড়ায় গজেন আর ব্রজেন চক্রবর্তী বলে দুই ভাই আছে, বুঝেছো প্রণব। বয়সে তারা আমার চেয়েও বড়। তাদের দেখেও আমার অমন মনে হয়। বড় চঞ্চল প্রকৃতির তারা। শাখামৃগ থেকে সম্প্রতি প্রমোশন পেয়ে মানুষ না হলে অমনটি হয়েই না। সবসময়ই দুই ভাই চরকির মতো ঘুরছে। ওদের দেখে মনে হয়, সব যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি, যমরাজের দূতকে যেন দেখে ফেলেছে ওরা। সকলকে মাড়িয়ে পাড়িয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে অথচ কোথায় যে যাবে, কোথায় যে যাবার ছিলো; তাই জানা নেই।

পরেপরা নরেপরার আরও একটি দোষ ছিলো। ওরা জানালার শিক বেয়ে ক্রমাগত ওঠানামা তো করতোই তার উপরে মাঝে মাঝেই দোতলার স্কুলঘর থেকে বাজারের দিকে যাওয়া অথবা বাজার করে ফেরা মানুষের মাথায় থুথু ফেলতো। থুথু কীরকম করে উড়ে উড়ে নীচে পড়ে এঁকেবেঁকে তাই দেখেই ওরা দুভাই খুবই আনন্দ পেতো। পণ্ডিতমশায় বলতেন, সংস্কৃত ক্লাসে যদি কিছু বিজ্ঞানও শিখে ফেলে তাহলে ক্ষতিটা কি?

বিজ্ঞান কেন স্যার?

কেউ হয়তো জিগেস করতো।

পণ্ডিতমশায় বলতেন, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থুথুর উপরে। এই বোধহয় ওদের লক্ষ্যবস্তু। বলেই, জগাকে বলতেন, জগা, ক্লাসরুমের দরজাটা বন্ধ করে তোর ঐ গানটা শোনাতো।

কোন গানটা ?

আরে সেইটারে। যেটা প্রায়ই শোনাস।

জগা চোখ বন্ধ করে বাঁ হাতটা কানে লাগিয়ে ডান হাতটা নদের নিমাই-এর মতো তুলে দিয়ে এক লাফ মেরে শুরু করতো :

"অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু

গোদা, ওরে গোদারে-এ-এ-এ-এ-এ………

অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু।

কে আনিল ? কোথায় ছিলো ? গোদারে-এ-এ-"

এই আখরই চলতো ঘুরে ফিরে। প্রতিবারই স্বরের পর্দা এবং লয় উঠতো, বৃদ্ধি পেতো। যখন চরমে উঠতো গান তখন প্যারাপেটের ওপর বকবকম্ করা পায়রারা—দুষ্কোর বলে তাদের পাকা-করমচা-রঙা পা নিয়ে ঝটাপট্ করে ডানা নেড়ে উড়ে চলে যেতো পাণ্ডেজীদের বাড়ির আল্সের দিকে।

সেদিন হলো এক বিপত্তি। যখন জগা "গোদাবরী তীরে" গাইছে আর পণ্ডিতমশায় নাকে বড় এক টিপ নস্যি নিয়ে দিবানিদ্রায় মগ্ন এবং স্বপন তাঁর পদসেবা করে দিচ্ছে পাটাতনের উপরে ফ্ল্যাট হয়ে বসে ঠিক তখুনি বন্ধ দরজাতে দমাদ্দম ধাক্কা।

আমরা ভাবলাম, সাহেব স্কুল ইনসপেক্টর এসেছেন বুঝি। সাহেবের জাত ছাড়া লাথিতে এমন ভূকম্পন সম্ভব নয়। আসবেন আসবেন শুনছি বেশ কিছুদিন হলো।

মধু দরজা খুলে দিলো কাঁপা কাঁপা হাতে। দিতেই বিপত্তি। লাল টক্টকে রঙের এক ইংরেজ। খাকি পোশাক পরে, কাঁধে-বুকে ঝকঝকে পেতলের গয়না পরে লাল চোখে দাঁড়িয়ে আছেন।

সাহেব দেখে পণ্ডিতমশায় তো 'ইয়েস স্যার' বলে দিবানিদ্রা ছিঁড়ে ধুতির কোণ ছিঁড়ে তড়াক্ করে উঠে বসে তালতলার চটি দিয়েই ফটাস্ শব্দ করে অ্যাটেনশনে দাঁড়ালেন হাতজোড় করে। ছেলেদের বললেন, নমো করো বৎসরা ; নমো করো। এঁরাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, মা-বাপ।

তারপরই পণ্ডিতমশায় বললেন, এনীথিং আই ক্যান ডু স্যার ?

সাহেব বললেন, হোয়াটস্ গোয়িং অন হিয়ার ফকির ? আর উ্য আ ডিসাই-পল অফ গ্যাণ্ডি ?

সাহেব পণ্ডিতমশায়ের আধা-ন্যাংটো পোশাক দেখে তাঁকে গান্ধীবাদী ঠাউরেছিলেন।

ইয়েস স্যার।

না বুঝেই উত্তর দিলেন পণ্ডিতমশাই।

কথাটা বলেই সর্বনাশ করে ফেলেছেন বুঝতে পেরেই বললেন, নো স্যার। সার্টেইনলি নো স্যার।

দ্যাটস্ গুড।

পণ্ডিতমশায় আবার বললেন, হোয়াট ক্যান আই ড্যু স্যার ?

সাহেব নিজের মাথার টুপিটা খুলে পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়ে বললেন, হু হ্যাজ ডান দিস? হ্যাভ আ লুক! উ্য নেকেড বাবু।

পণ্ডিতমশায় সামান্যক্ষণ চেয়ে থেকেই বুঝলেন, এ বস্তু পরেপরা আর নরেপরার ফ্লাইং মিসিলু। ল্যান্ড করেছে এক্কেবারে সাহেবের টুপির উপর।

উরে: ফাদার!

পণ্ডিতমশায় বললেন।

উত্তেজনা মাত্রাতিরিক্ত হলে সংস্কৃতের সমস্ত জ্ঞান ভুলে গিয়ে ঐ অভিব্যক্তিটা ছিটকে বেরিয়ে আসতো জর্দার গন্ধর সঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের মুখ থেকে।

হোয়াট ফাদার? আর উ্য জোকিং উইথ মী? ডু্য উ্য নো হু আই অ্যাম?

ইয়েস স্যার।

হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধ ঘরকে চমকে দিয়ে হুলো বললো, ঐ ব্যাটা লাল বাঁদরকে অতো স্যার স্যার করছেন কেন স্যার?

তা কি করবো দ্রোণাচার্য? পণ্ডিতমশায় ঘাবড়ে বললেন।

হু্জ দ্যাট রাফয়ানু?

সাহেব বললেন।

ততক্ষণে হেডমাস্টারমশাই এবং অন্য বড় স্যারেরাও এসে গেছেন।

সাহেব আবারও বললেন, এবার বাংলাতে, এই গুন্ডা এখানে কি করিটেচে?

পণ্ডিতমশায় বললেন, পড়িটেছে।

কী পড়িটেচে?

স্যাংকৃট্ স্যার।

সাহেব হেডমাস্টারমশাইকে বললেন, উপরের মহলে লিখে তোমার স্কুলের অ্যাফিলিয়েশন ক্যানসেলু করে দেবো, গ্রান্ট বন্ধ করে দেবো।

হুলো বললো, দাও না করে। দাও তো ঘেঁচু, তার আবার চোখ রাঙানী! ঐ গ্রান্ট আমার দিদিমাই দিয়ে দেবে। মহান ইংরেজ সরকার! ফু:।

হেডমাস্টার সবিনয়ে বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না স্যার?

সাহেব বললেন, হোয়াট ইজ ফু:?

হেডমাস্টারমশাই বললেন, অ্যান এক্সপ্রেশান অফ রেসপেক্ট—লাইক উই গিভ ইন দ্যা কণ্ডশেল।"

হুলো স্বগতোক্তি করলো, ইফ উই আর আ ম্যান, দেন ইংরেজ প্যাঁদান।

উত্তেজিত হয়ে সাহেব বললেন, হোয়াট ডাজ হি সে?

স্যার, ওর একটু মাথার গোলমাল আছে। বয়স অনুপাতে বুদ্ধি হয়নি। ওকে ক্ষমা করে দিন স্যার।

হুলো সম্বন্ধে বললেন, হেডমাস্টার।

যারা থুথু ফেললো তাদের বিরুদ্ধে কি স্টেপ নিচ্ছো তোমরা?

ওরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে এখুনি।

নোও-ও। শুধু ক্ষমা চাইলে তো হবে না।

তাহলে ?

ওদের দশ ঘা করে বেত মারতে হবে। আমার সামনে। এই তো। বেত তো এর হাতেই আছে।

পণ্ডিতমশায়ের বেত যে শুধু দেখানোর জন্যে, মারার জন্য নয়, এ কথা আমাদের জানা ছিলো। অমন কোমল-হৃদয় সরল মানুষ বড় কমই দেখা যায়।

হেড স্যার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাহেব বললেন, লাগাও বেত। ওদের না মারলে আমি তোমাদের মারবো।

হুলো বললো, সকলকে স্তম্ভিত করে; মেরেই দ্যাখো না, তোমার চামড়া ছাড়িয়ে নেবো।

হোয়াট ইজ 'চামড়া ছাড়িয়ে নেবো' ?

সাহেব ভীষণ রেগে বললেন।

পণ্ডিতমশায় তাড়াতাড়ি বললেন, ওটা একটা ডিজীজের নাম স্যার। নেটিভদের হয়।

ডিজীজ ?

হেডমাস্টারমশাই বললেন, ইয়েস স্যার।

পরেপরা আর নরেপরা সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইলো। জুতোর উপর মুখ ঘষলো। সাহেব খুশি হয়ে বেত মারা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করলেন না। হেডমাস্টারমশাই, সাহেবকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে চা আর ছানাবজা খাওয়ালেন।

আমরা সকলে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম সাহেব স্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই ও আরও চারজন সিনিয়র স্যারের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে বট গাছতলায় দাঁড়ানো তাঁর ঝকঝকে কালো গাড়িতে চড়লেন। সাহেবের গাড়ির সামনে দুজন আর্দালি। তকমা-আঁটা, খাকি উর্দি গায়ে। এবং ড্রাইভার। তিনজনে চাপাচাপি করে বসেছে। পিছনে সাহেব একা। সাহেবের জন্য ক্লাস আর ড্রাইভার আর্দালির অন্য ক্লাস।

সাহেবের গাড়ি জোরে হর্ন বাজিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেলেই হেডমাস্টার-মশাই ও অন্যান্য স্যারের স্কুলে ঢুকলেন। হুলো যে ডামাডোলের মধ্যে কখন ক্লাস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছিলো তা আমরা কেউই লক্ষ করিনি। একটু পরই হুলোও ক্লাসে এসে ঢুকলো।

আমাদের সামনেই হেডমাস্টার মশাই পণ্ডিতমশায়কে কটু ভাষায় বকছিলেন ছেলেদের শাসন করতে না-পারার জন্যে। ওঁরা সকলে সোজা আমাদের ক্লাসেই এসেছিলেন।

পণ্ডিতমশাই তখন কাঁদছিলেন। বলছিলেন, শাসন আর কী করবো মদনবাবু ? পরেপরা নরেপরার বাড়িতে আপনি কখনও গেছেন ? বেচারারা দুবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না। জামাকাপড়ের অবস্থা তো দেখছেনই ! ওদের বাবা দূরে দূরে গ্রামে গিয়ে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিয়ে আসেন জমিদার জোত-দারদের। বিয়ে চুড়ো হলে পান কিছু। তাঁর নিজের কপালেও একটু

ভালোমন্দ খাওয়া জোটে বটে তখন, কিন্তু পরেশরা নরেশরা এবং ওদের ছোট আরও তিন ভাইবোন আর মা প্রায় না খেয়েই থাকে। স্কুলটাই ওদের প্রাণ। একটু আনন্দ করার জায়গা।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, স্কুল তো আনন্দ করার জায়গা নয়, শিক্ষার জায়গা। ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে তো! সত্যিই যদি স্কুলের অ্যাফিলিয়েশন চলে যায় তখন কি হবে?

কী আর হবে? মাসে পাঁচ টাকা করে পাই, তা আর পাবো না। এমনিতেই না খেয়ে থাকি, ওমনিতেও থাকবো। আটআনা মাস মাইনের ছাত্র আর পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারে যেমন শিক্ষা হতে পারে মদনবাবু তেমন শিক্ষাই বেচারারা পায়। তার চেয়ে বেশি আর কী হবে।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে পণ্ডিতমশায়কে কাঁদতে দেখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। তাদেরও অনেকের চোখে জল।

হুলো বললো, ঠিক বলেছেন। দুটাকা মাইনের স্কুলে আমরা যারা পড়ি তারা কি স্যার জজম্যাজিস্টর হবো? এদের সকলেই কি আর ক্লাস টেন অবধিও পৌঁছবে? মাইনে দিতে না পারার জন্যেই তো অনেকেরই পড়া ছেড়ে দিতে হবে। পণ্ডিতমশাই যদি পাঁচ টাকা মাইনে পান তাহলে তিনি ক্লাসে ঘুমোবেন না তো কি করবেন? দশটা টিউশনি করে তো তাঁর সংসার চালাতে হয়। আপনি স্যার কখনও গেছেন পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি? আমি গেছি। যজমানও আজকাল কমে গেছে। সাহেবদের দেখাদেখি অনেকেই কেশ্চানও হয়ে গেছে। মিশনের বাড়িতে গেলেই পাদ্রীসাহেব মন্তর পড়ে দিচ্ছে। কেশ্চান হলে অনেকই সুযোগ-সুবিধা। সংস্কৃতে পণ্ডিতমশায় আমাদের প্রত্যেককে পণ্ডিত করবেন কি পাঁচ টাকা মাইনেতে?

হেডমাস্টারমশাই বললেন, তুমি চুপ করবে হুলো?

করবো স্যার। তার আগে আপনি বলুন ঐ লালমুখো সাহেবটাকে আপনি অত তেলাচ্ছিলেন কেন? এ দেশের সাধারণ লোকে থুথু তো ফেলেই। পানের পিক ফেলে। খৈনির থুথু ফেলে। তা বলে সাহেবের মাথায় কি ওরা ইচ্ছে করে থুথু ফেলেছে? আপনি কিছু বললেন না কেন? ছেলেদের সামনে আপনি কিন্তু একটা ভালো উদাহরণ দিতে পারতেন। আপনাকে দেখেই তো ছেলেরা শিখবে! বিদ্যে দিয়ে হয় না কিছু। আসল হলো চরিত্র।

আমি কি বলবো? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ?

কুমীরের আমি বারোটা বাজাবো। সব খোঁজখবর নিয়ে এসেছি আমি।

কী! কি? খবর্দার। তোমাকে নিয়ে—

হেডমাস্টারমশাই আঁতকে উঠে বললেন।

আমি অন্যায় সমর্থন করি না।

কী অন্যায়? থুথু ফেলাটা অন্যায় না?

অসহায়ের গলায় হেডমাস্টারমশাই বললেন।

হ্যাঁ অন্যায়। কিন্তু সাহেবের এমন সাহেবীয়ানা দেখানো, স্কুলে চড়াও হয়ে এসে, এও অন্যায়। পরেপরা নরেপরার থুথু তো আরও কত দিশী মানুষের মাথায় পড়ে। তারা এলে কি আপনি তাদের ছুঁড়িয়ে দিতেন না? ছাত্রদের সামনে পণ্ডিতমশায়কে, আপনাদের সকলকে অপমান করা ঐ সাহেবের আরও বড় অন্যায়।

হেডমাস্টারমশায় মাথা নিচু করে নিলেন। বললেন, আমাদের স্কুলের কড়ি-বরগার মেরামতির জন্যে কিছু কাঠের দরকার ছিলো। কেনার পয়সা নেই। এই সাহেবেরই পায়ে তেল দিয়ে···

হুলোর সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেলো রাগে। ও বললো, স্যার, ইংরেজরা আরও তিনশো বছর আমাদের শাসন করবে। করা উচিত।

যাই করো হুলো, সাবধানে করো। স্কুল উঠে যাবে।

হেডমাস্টারমশাই বললেন।

স্কুলের কিছু হবে না স্যার।

তোকে গুলি করে মেরে দেবে।

পণ্ডিতমশাই বললেন অপত্যস্নেহে। তখনও তাঁর চোখে জল।

ছাড়ুন তো স্যার। তবে মারতে পারে। যদি কেউ বলে দেয়।

বলেই, আমাদের সকলের দিকে ফিরে বললো, এই মীরজাফরের জাতের ছেলেপিলেরা। তোদের মধ্যে যদি কেউ একটা কথাও কাউকে বলিস, মানে যে কথা এ ঘরে হলো; তাহলে যে বলবে তার লাশ বাঁকিড়াকিরার জঙ্গলে গুম্ হয়ে যাবে। শুনে রাখ্। আমি হুলো বলছি।

হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ বলে, হেডস্যার চলে গেলেন অন্য স্যারদের নিয়ে।

পণ্ডিতমশায় বললেন, অহো! বুকটা ভরে গেলো রে। হুলোরে!

বলেই, পণ্ডিতমশায় হুলোকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

হুলো বললো, কাঁদবেন না স্যার। আমরা অনেকদিন কেঁদেছি। এবারে চোখের জল না ফেলে চোখ দিয়ে আগুন ঝরাবার দিন এসেছে। আপনাকে দেখে আমরা শিখবো স্যার। আপনি আমাদের মাস্টারমশাই। আপনিই কাঁদছেন! না, না। এটা ঠিক নয়।

যে—সাহেবটি সেদিন পরেপরা আর নরেপরার উপরে খাপ্পা হয়ে আমাদের ক্লাসে চড়াও হয়েছিলেন সেই নতুন ডি. এফ ও. সাহেব এডমান্টন্। হুলো আর্দালির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এসেছে এডমান্টন নাকি প্রতি মাসেই আসবেন। সামনের মাসে সদর থেকে পুলিশ সাহেব গিলিগ্যানও নাকি আসবেন। হুলো সম্বন্ধে নাকি কী সব খারাপ রিপোর্ট দেবেন এডমান্টন সাহেব পুলিশ সাহেবকে।

বন্দেমাতরম্

হুলোর বাড়িতে আমার, প্রণবের, কনকের আর প্রীতির খিচুড়ি খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিলো রাতে। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। বাড়িতে মা, লক্ষ্মী পুজো করেছিলেন। তার একটু প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওদের জন্যে। পাথরের বাটিতে সিন্নী।

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। আমাদের এই জঙ্গল-পাহাড় ঘেরা সুন্দর গ্রাম কাঁকড়িকে ভারী সুন্দর দেখি আমি। দেশকে ভালোবাসা, দেশপ্রেম ওসব নিয়ে সকলকে আলোচনা করতে শুনি। অসহযোগ আন্দোলন, মন্বন্তর, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, নেতাজী এসব অনেক নাম শুনি। কিছু না বুঝলেও গা গরম হয়ে ওঠে। আমার বাবা ফরেস্ট অফিসে কাজ করেন। মাকে দিয়ে আমাকে বলিয়ে দিয়েছেন যারা 'দেশদ্রোহী' তাদের সঙ্গে যেন মেলামেশা না করি।

আমাদের এই কাঁকড়ি এমনই এক জায়গা যেখানে দেশপ্রেমী বা দেশদ্রোহী কিছুই নেই। লোকে যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই কাজ করে তারপর খায়-দায়, ঘুমোয়। কোনো বিশেষ কষ্ট বা বিশেষ আনন্দ কাঁকড়ির পানা-পুকুরের জীবনে ঢেউ তোলে না।

তবে, আমাদের এই হাইস্কুলের ছাত্র, আমাদেরই ক্লাসের ছাত্র হুলো আমাদের কাছে সবসময়ই উত্তেজনা আর অভাবনীয় সব ঘটনার উৎস হয়ে থাকে বলে আমাদের খুব ভালো লাগে।

হুলোর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর হুলো বললো, এই, তোরা বঙ্কিমচন্দ্রর আনন্দমঠ পড়েছিস ?

প্রণব বললো, সে কীরে ! সে বই তো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পড়তে মানা করে দিয়েছে।

ছাড়তো।

পণ্ডিতমশায়ের তালতলার চটি কিনতে জগুয়াকে পাঠিয়েছিলাম কলেজ স্ট্রীটে রাদুর দোকানে। জগুয়া অবশ্য তার নিজের কাজ নিয়েই গেছিলো। কোনোরকমে হেমদার কাছ থেকে একটা ছেঁড়াখোঁড়া কপি যোগাড় করে এনেছে।

কাউকে বলবি না কিন্তু, খুব খারাপ হয়ে যাবে। আমরা সমস্বরে বললাম, মাথা খারাপ। কাউকে বলবো না। কিন্তু আমাদের পড়তে দে একবার।

না, এ বই একা একা পড়বার নয়। তাছাড়া তোরা কার হাতে ধরা পড়বি, মারা পড়বো আমি। আজ নয়। কাল সন্ধেবেলা কাঁকড়িকিরার জঙ্গলে যে ভাঙা গড় আছে সেখানে চলে আসিস দিনের আলো থাকতে থাকতে। একসঙ্গে আসবি না। একা একা আসবি এবং আলাদা আলাদা পথে। যদিও এখানে পুলিশের টিকটিকি নেই কিন্তু দারোগা তো আছে। লাগাতে কতক্ষণ!

পরদিন সময়মতো আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। আগে-পরে। প্রণব বললো, এই গড় তো সাপের আড্ডা। আর জায়গা পেলে না তুমি!

সাপ সব ঘুমোচ্ছে এখন। এবার পুজো কত দেরিতে হলো না। কোনো ভয় নেই।

ফুটফুটে আলো চারিদিকে। চাঁদের আলোয় কাঁকড়িকিরার বন, পিলা নদী, প্রান্তর, ঝাঁটি-জঙ্গল সব ভেসে যেতে লাগলো। গড়ের উপরে বসে আমরা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। বাড়িতে বসে সৌন্দর্য দেখা যায় না।

হুলো বললো, আমাদের দেশটা কী সুন্দর! না রে!

কথাটা শুনে আমার গা ছমছম করে উঠলো। হয়তো অন্যদেরও। হুলো বললো, পুরো বই তো পড়া যাবে না, অল্প একটু শোনাই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে রে। কী যে ইংরেজদের মুটকি রানী ভিকটোরিয়ার গুণগান পড়িস ক্লাসে! এসব পড়ু। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমের "আনন্দমঠ", শরৎবাবুর "পথের দাবী"। দেখবি, পরাধীনতার জ্বালা গায়ে দাদের মতো চুলকোচ্ছে। আমরা তো মানুষ নই, সব লেড়েকুত্তা হয়ে গেছি। নইলে এতো অপমান সইতো আমাদের?

শোন্। বলেই, ফুটফুটে চাঁদের আলোতে, খালি চোখে হুলো পড়ে চললো:

আনন্দমঠের উপক্রমণিকাটা শোন্ আগে।

আনন্দমঠ

উপক্রমণিকা

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার, মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখনও মনুষ্য যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী,

কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব, অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

এইরূপে তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি ?"

প্রত্যুত্তর বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ। সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে ? আর কি দিব ?'

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি"।

আমরা সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। প্রাণের চেয়েও দামী কিছু যে আছে এমন কথা হুলো এই বই না পড়ালে আমরা জানতামও না।

হুলো বললো, কী বুঝলি ?

আমি বললাম, হুঁ।

অন্যরা নিরুত্তর রইলো।

হুলো বইয়ের পাতায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পাতা উল্টোতে লাগলো। তারপর বললো, এই। পেয়েছি। দশম পরিচ্ছেদ। এখান থেকে শোনাই তোদের একটু।

আনন্দমঠ

দশম পরিচ্ছেদ

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুই জনে, (মানে, ভবানন্দ আর মহেন্দ্র আনন্দমঠ এর দুই চরিত্র, বুঝলি, নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোকাতর, গর্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্তি সন্ন্যাসী আর নাই। সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি সৈন্যাধ্যক্ষর মুণ্ডধাতীর মূর্তি আর নাই। এখনই যে গর্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন সে মূর্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন নগ-নদীময় দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দেমাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে ?

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন—

"শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত—দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিল, আবার গাও।

ভবানন্দ আবার গাহিলেন।

"সপ্তকোটী কণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।"

মহেন্দ্র দেখিল দস্যু গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কারা?

ভবানন্দ বলিল, আমরা সন্তান।

মহেন্দ্র—সন্তান কি? কাহার সন্তান?

ভবানন্দ মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র—ভাল সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবানন্দ—আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহেন্দ্র—এই ত গাড়ি লুটিলে।

ভবানন্দ—সে কি চুরি ডাকাতি? কাহার টাকা লুঠিলাম?

মহেন্দ্র—কেন? রাজার?

ভবানন্দ—রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তাহার কি অধিকার? রাজার রাজভোগ।

মহেন্দ্র—যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহেন্দ্র বলিল, তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবানন্দ—অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজও দেখিলাম।

মহেন্দ্র—ভাল করিয়া দেখ নাই, একদিন দেখিবে।

ভবানন্দ—না হয় দেখিলাম। একবার বই ত দুইবার মরিব না।

মহেন্দ্র তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবানন্দ—মহেন্দ্র সিংহ! তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল দুধ-ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি তো দেখি না, সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দশা? কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়, কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুক্কুর খায়? মরা খায়? সকল দেশে রাজার সঙ্গে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের রাজা রক্ষা করে কই?

বাঃ, বাঃ, বাঃ। আমরা সকলে বলে উঠলাম। এরকম কোথায় হয় যা পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়?

খাদ্য : ঘুষ

বয়সের বিচারে হুলো আমাদের দাদা কেন, কাকাও হতে পারতো। কিন্তু সহপাঠী বলে সে আমাদের বারণ করে দিয়েছিলো যাতে আমরা ভুলেও তাকে দাদা বা কাকা বলে না ডাকি।

তার যা বয়েস তাতে তার ধুতি পরাই উচিত ছিলো। আমাদের ছেলেবেলায় ফুলপ্যান্ট পরার তেমন চল ছিলো না, বাঙালীদের মধ্যে। বড় ছেলেরা ধুতি, পাঞ্জাবি অথবা ধুতির সঙ্গে ছিটের ফুলহাতা শার্ট পরতো। পায়ে থাকতো পাম্পশু। চটিও পরতো। তবে কম লোক। পাম্পশু নানারকম হতো।

হুলো মানুষ হয়েছিলো তার বড়লোক দিদিমার কাছে। মা-বাবা ডাকাতের হাতে খুন হয়ে যান যখন হুলোর পাঁচ বছর বয়স। হুলো বলে, তার সব মনে আছে। সে তখন লেপের তলায় শুয়েছিলো বটে চোখ বুজে কিন্তু চোখ মিটমিটিয়ে সবই দেখেছিলো। তখন থেকেই ওর মধ্যে একধরনের নিষ্ঠুরতা জন্মেছিলো বোধহয়।

আমরা হেঁটে যাচ্ছি পথ বেয়ে, পথের পাশের গাছের ঘুঘু বা শীস দেওয়া বুলবুলিকে বিনা বাক্যব্যয়ে হুলো গুলতি দিয়ে মাথায় মেরে পটকে দিতো। শুধু তাই নয়, তারপর কাছে গিয়ে দুহাত দিয়ে টেনে তাদের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিয়ে পথের মধ্যে ফেলে দিতো। রক্ত ছুটতো ফিনকি দিয়ে। হুলো বলতো, বাঙালীর একটু রক্ত দেখা দরকার। বড্ড মেয়েলি হয়ে গেছে পুরো জাতটা!

মধু বলতো, খাবেই না যদি, তো মারলে কেন?

হুলো বলতো, আমি খাবো না তো কী, অন্য অনেকেই আছে খাবার। অন্যের অন্নসংস্থান করলাম। বুঝলি। দেশের লোকে পোকামাকড় ইঁদুর বাঁদর খেয়ে বেঁচে থাকে। শেয়াল হায়না শকুন কাক কেন, মানুষই আদর করে খাবে দেখিস। আমরা তো এখন সর্বভুক। সেদিন চামারটোলির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি চারটে বাচ্চা ছেলে শকুনদের হাত থেকে ইঁট মেরে মেরে ছিনিয়ে নিয়ে একটা কুকুরকে ঝলসে খাচ্ছে কাঁটাল গাছতলাতে বসে। এতো খিদে।

আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। আমি আর তুই-ই তো দেশ নই রে রিভে, দেশ মানে ওরাও। আমরা সবাই মিলিয়েই দেশ।

হুলোকে দেখে আমার মনে হতো ওর মধ্যে কী যেন ফোঁসে সবসময়। কিছুর প্রতিবাদ করার জন্যে ও যেন সময় আর শক্তি দুই-ই জড়ো করছে। জড়ো করে ঠিক কী যে করবে তা হুলোই জানে। ওর সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনে একধরনের বোবা সম্ভ্রম গাঢ় হয়ে উঠছিলো দিনে দিনে।

ক্লাসের অন্যান্য সব ছাত্ররাই গরীব বলে নিজে ও কখনই দামী জামাকাপড় পরতো না। খালি পা, কখনও একটা চটি, ছোট হাফপ্যান্ট (তখন 'শর্টস' কথাটা এ দেশে চালু হয়নি), ছিটের হাফ-হাতা জামা। শীতকালে তারই উপরে হয়তো কাঁথা বা একটা উদ্ভট ক্যাটক্যাটে রঙের আলোয়ান। ডান দিকের পকেটটাতে গুলতি থাকায় পকেটটা সবসময় ফুলে থাকতো। গুলতির হাতলটা বেরিয়ে থাকতো। বাঁ দিকের পকেটে থাকতো নোংরা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো আর নস্যির ডিবে। মাস্টারমশাইরা কেউ কেউ হুলোর চেয়েও বয়সে ছোট ছিলেন। ছোট না হলেও হুলো বিনা দ্বিধায় মাস্টারমশায়দের সঙ্গে নস্যি বিনিময় করতো। বিনিময় না বলে দান করতো বলাই ভালো।

হুলোর পরীক্ষা পাশের কোনোরকম ইচ্ছা বা সম্ভাবনা আছে বলে আমাদের, মাস্টারমশাইদের এবং হুলোর নিজেরও কোনোরকম সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু ওর শখ ছিলো বাংলা। বাংলা ভাষাকে ও যে কীরকম শ্রদ্ধা করতো, বাংলা ভাষায় যে ওর কীরকম পড়াশুনো ছিলো তা দেখে মাস্টারমশাইরাও চমকে যেতেন। পরীক্ষার খাতায় সে জ্ঞান দেখাতো না। বলতো, আমাদের এই পরীক্ষার, পড়াশুনোর সিস্টেমটাই বাজে। দেশ যদি স্বাধীন হয় তখন দেখবি শিক্ষা কাকে বলে তা সরকারী স্কুলের মাধ্যমে দেশের লোকে দেখিয়ে দেবে।

পরীক্ষার খাতায় সে ভালো লিখতো না বা লিখতোই না দুটো কারণে। যারাই বাংলায় প্রতিবার ফার্স্ট হতো, তাদেরকে দুঃখ দিতে চাইতো না ; দ্বিতীয়তঃ সিলেবাস ওর পছন্দ যে নয় তা দেখাবার জন্যেও। ও বলতো, এও একরকমের প্রতিবাদ। বলেই বলতো, কিন্তু বুঝছে কে!

ওর বাড়িতে, ওর ঘরে খুব সুন্দর একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলো হুলো। একা হাতে। ওর এক মামা যিনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সাহায্যে নানারকম বই আনাতো কলকাতা থেকে। বই ও সকলকেই পড়তে দিতো কিন্তু যেদিন ফেরৎ দেওয়ার কথা সেদিন না দিলে তার হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে দিতো। ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির উপরেও অনেক ভালো ভালো ইংরিজী বইও ছিলো। আমাদের ক্লাসে অনেক ছেলেরই হাতের তেলোয় দগদগে ঘা আর ঘা-এর শুকিয়ে যাওয়া কালো দাগ ছিলো।

গুন্ডা বলে, পড়াশুনোয় খারাপ বলে, আপাতদৃষ্টিতে অভদ্র স্বভাবের ছেলে বলে, বেপরোয়া বলে, সহবৎ জানে না বলে এবং আমাদের চেয়ে বয়সে অনেকই বড় বলেও আমাদের প্রত্যেকেরই তাকে এড়িয়ে যাওয়ারই কথা ছিলো। বাড়ি থেকে বারণও ছিলো। কিন্তু হুলোকে আমরা কেউই এড়াতে পারতাম না।

ওকে ঘৃণা করতাম না। ভালোও বাসতাম না। তবু ওর প্রতি একধরনের তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম। কে জানে! খারাপ বা অন্যরকম জিনিসে, মানুষেরও বোধহয় নিজস্ব আকর্ষণ কিছু থাকে।

আমাদের এই কাঁকড়ি গ্রামে বিড়িপাতা আর কাঠ ছাড়া আর কোনো ব্যবসা নেই। কিছু আছে লাক্ষা, আঠা, খয়ের, শাল আর মহুলান পাতা, মহুয়ার ফল, এইসব। জঙ্গলের লাগোয়া গ্রাম বলে ক্ষেতি জমিন করার অসুবিধা অনেক। জানোয়ারে খেয়ে যায়। তবু বাজরা, সাঁওয়া ধান, ধান, মকাই, সর্ষে এবং কিছু আনাজপাতি হয়। সদরের শহর অনেকই দূরে। এখানে ফরেস্ট অফিসও আছে। ডি. এফ. ও'র রেঞ্জ অফিস। আর ব্যবসাদারদের মধ্যে বড় ব্যবসাদার বলতে সবাই ইংরেজ কোম্পানীর ব্রাঞ্চ, ডিপো অথবা এজেন্সী। মাড়োয়ারী ব্যবসাদাররা সবে একে একে মাথা তুলছে। বাঙালীরা সবাই চাকুরে, হয় ফরেস্ট অফিসে, নয় এইসব কাঠ, বিড়িপাতা, তামাকপাতা, লাক্ষা, মধু, অভ্র, এইসব ব্যবসাদারের অফিসে। আমাদের প্রত্যেকের বাবারাই কেরানী। পূব অথবা পশ্চিম বাংলার যার যার ঘর ছেড়ে এখানে ওঁরা এসেছিলেন রুজীর তাগিদে। এই স্কুলের ছেলের বাবারা বিশেষ বিদ্বানও ছিলেন না। কেউ ম্যাট্রিক, কেউ নন-ম্যাট্রিক।

স্কুলবাড়িটা বানিয়ে দিয়েছিলেন বহুদিন আগে রাজা শিউদেওপ্রসাদ। বিহারী জমিদার। নিজেই নিজেকে রাজা বলতেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। এখনকার জমিদার বিরজুপ্রসাদের পিতামহ। এখন সে বাড়ি ভগ্নপ্রায়। কিন্তু কোনো স্কুল যে শুধু একটি বাড়ি বানিয়ে দিলেই চলে না, যেখানে মানুষ তৈরী হবে সেখানে যে নিয়মানুবর্তিতা, পড়াশুনো, মূল্যবোধ, ন্যায় অন্যায়ের স্পষ্ট জ্ঞান, এই সবকিছু সম্বন্ধেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় অতো সব জানা ছিলো না শিউদেওপ্রসাদের। স্কুলবাড়ি বানানোর যা খরচ সেই স্কুল চালানো বাৎসরিক খরচ দশ গুণ। কিন্তু বিহার সরকারের বছরে দুশো টাকা অনুদান আর ছাত্রদের আটআনা থেকে শুরু করে দুটাকা মাইনেতেই চলতো স্কুল।

হুলো বলতো, এ কী স্কুল নাকি! এ হচ্ছে পিঁজরাপোল। নয় খোঁয়াড়। যাই বল। আর আমি হচ্ছি তার সবচেয়ে পুরানো ষাঁড়।

ছাত্র ছিলো সবসুদ্ধু দুশো মতো। নিচের ক্লাসেই বেশি। উপরের ক্লাসে কম। স্কুলে, সত্যি কথা বলতে কী, শেখার মতো কিছুই তেমন আমাদের শেখানো হতো না। শেখার ইচ্ছাটাও যে আমাদের বেশি ছিলো তা বলবো না। তবে স্কুলের পরিবেশের মধ্যে কিছুটা সময় থাকলেও কিছু উপকার তো হয়ই। আমাদের মতো অতি-সাধারণ, সাধারণ মা-বাবার ছেলেদের হতোও কিছুটা। যার ইচ্ছা ছিলো সে শিখে নিতোও কিছুটা। পড়াশুনোর অসীম বিরাট জগৎ সম্বন্ধে একধরনের জ্ঞান, তা অস্পষ্ট হলেও তৈরী হতো মনের অবচেতনে। আমরা না জানলেও। আমাদের পণ্ডিতমশায় বলতেন, স্কুল-কলেজটা হচ্ছে

চৌকাঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ও তাই। আসল পড়াশুনোর জগতে ঢুকবি তারপরে। বুঝেছিস।

সদর থেকে যখন সাহেব ডি. এফ. ও. রেঞ্জ অফিস পরিদর্শনে আসতেন তখন সাজসাজ রব পড়ে যেতো এই ছোট্ট জায়গাতে। ঝকঝকে করে পালিশ করা কালো অস্টিন-এইট গাড়ি করে আসতেন হ্যামাক্ষ সাহেব। সাহেব খুব কড়া মেজাজের মানুষ। খুব ভালো মানুষ। মনে মনে চাইতেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক। কিন্তু নতুন ডি. এফ. ও. সকলেই বলে তিনি ভারী পাজী, এবং দিশী লোকদের দেখতে পারতেন না। সেই এডমান্টন। আমরা শুনতাম যে, এডমান্টন সাহেব ঘুষ খেতেন। ঘুষ খেতে কেমন যে লাগে তা আমাদের কারোই জানার কথা ছিলো না। আজকের মতো ঘুষটা তখন ভারতীয় আমলাদের অন্যতম প্রধান খাবারে পরিণত হয়নি।

একদিন মাকে আমার ছোট ভাই বিমলে বলেছিলো, মা! আজকে আমি ঘুষ খাবো। কী দিয়ে ঘুষ খায় মা? ভাত দিয়ে? না রুটি দিয়ে?

বাবার চোখ সরু হয়ে গেছিলো।

মা বলেছিলেন, সে কি কথা! কী সব যা তা বলিস!

হ্যাঁ, মা! এডমান্টন সাহেব যখন ঘুষ খান তখন খেতে নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে। আমি ঘুষ দিয়ে ভাত মেখে খাবো মা।

মা স্তব্ধ চোখে আমার চোখে চেয়েছিলেন অনেকক্ষণ। বিমলেকে বলেছিলেন, ঘুষ, খাবার জিনিস নয়।

তবে এডমান্টন সাহেব খান কি করে?

ওরা সাহেব, ওদের কথা ছাড়। ওরা তো গরুও খায়।

মা বলেছিলেন। মায়ের এই যুক্তিতে বিমলে শান্ত হয়েছিলো।

বাবা আমাকে কিছু না বলে ছাতাটা হাতে করে সামনে কোঁচা মারা ধুতির উপর হালকা খয়েরী জিনের কোট পরে আপিসে বেরিয়ে গেছিলেন, কালো বুট জুতো পায়ে।

হুলোকে এই ঘটনার কথা বলতেই হুলো বলেছিলো, তোর বাবাও ঘুষ খায়। এখানে যত চাকুরে বাঙালীবাবু আছেন সকলেই ঘুষ খায়। তার প্রধান কারণ কি জানিস? সাহেব কোম্পানী আর মাড়োয়ারী কোম্পানীরা যা মাইনে দেয় তাতে কারোই সংসার চলে না। আমাদের চরিত্র নষ্ট করে দেবার জন্যেই এই সিস্টেম ইচ্ছে করে বানানো।

তবে বাঙালী তো! মৌ-টুসকি পাখির মতো কলজে। বলেই, যেমন করে দু আঙুলে ও নস্যি ধরে, তেমন করে দু আঙুল জড়ো করে আমার বাবার কলজের মাপ যে কতো ছোট তা বোঝালো। তারপর বললো, তোর বাবা, শান্তুর বাবা, কুমারের বাবা বা প্রণবের বাবা যে ঘুষ খান তাকে ঘুষ বলে না।

কি বলে?

পান-খাওয়া।

পান-খাওয়া?

হ্যাঁ পান-খাওয়া। কোথাও বলে চা-খাওয়া। কোথাও বলে মশলা-খাওয়া।

কিন্তু এডমাণ্টন সাহেব তাহলে কেন ঘুষ খান? তিনি তো অনেক মাইনে পান।

এই তো! এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছিস। ঘুষ-খাওয়া রোগটা হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগের মতো। একবার ধরলে আর ছাড়ে না। ক্রমশ রোগ যত বাড়ে মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছেও তত বাড়ে। চরিত্র, মেরুদণ্ড সবটাই নষ্ট হয়ে গেলে সে মানুষই বল আর জাতই বল কিছুই টেঁকে না।

তবে বুঝলি রিভে, এই খাদ্য বন্ধ না করতে পারলে এর পরে সকলে দেশ স্বাধীন হলে দেখবি মুলো, কলা, বেগুন, কুমড়ো, সিকি-দুয়ানি ছেড়ে হাতী-গণ্ডার খেতে শুরু করবে আর তখনই হবে আসল কেলো। যাদের জন্যে এত সব ট্যাকসো-ম্যাকসো, সেনাপালন, শত্রু দমনের আশ্বাস, যাদের নাম করে সবকিছুই, তারা সেই দেশের মানুষেরাই দেওয়ালের টিকটিকির মতো শুকিয়ে মরবে না খেয়ে। এখনও খেতে পায় না, তখনও পাবে না। দেশ স্বাধীন যদি হয় কখনও তখন দেখিস।

একটু চুপ করে থেকে হুলো বললো, আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু কি জানিস?

হ্যাঁ। ইংরেজ।

আমি বললাম।

না রে! এই ঘুষ-ঘাষ। চরিত্রের এইসব ছ্যাঁদাগুলো। ফাঁকি-মারার অভ্যেস। ক্লাস-কাটার অভ্যেস। এই কাজ-না-করে মাইনে পাবার লোভ। অন্যকে ঠকানোর প্রবৃত্তি। দেখিস, ইংরেজরা চলে গেলে আমাদের সাধারণ মানুষদের অবস্থা আরও কতো খারাপ হবে! এখনও তাও এরা লাল চামড়া আর লাল পাগড়ির ভয়টা পায়। আর তখন? লুটপাট শুরু হয়ে যাবে চারদিকে। সারা রাজ্য জুড়ে। এই ফরেস্ট অফিসেই কি হয় দেখিস! এডমাণ্টন সাহেব একটি ডালি নিয়ে পঞ্চাশটা গাছ কাটার পারমিশান দিয়ে দেবেন হয়তো নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সাহস নেই। কারণ জানে যে, তার উপরেও ইংরেজ সাহেব আছে। যদি ইংরেজ জাতটার সকলেই ঘুষ-ঘাষ খেতো আর ফাঁকিবাজ হতো তবে ইংরেজ রাজত্বের এমন রমরমা হতো না। তাদের ইউনিয়ন জ্যাক পৃথিবীর যেখানে যেখানে টাঙানো আছে সেখানে সূর্য কখনও অস্ত যায় না তা জানিস?

নাঃ। জানতাম না।

পেছনে সততা না থাকলে, নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে, কঠোর পরিশ্রম না থাকলে কোনো জাতের পক্ষেই বড় হওয়া সম্ভব নয়। এ কথা মানতেই হবে। সে ইংরেজরা আমাদের শত্রুই হোক আর যাই-ই হোক।

হুলো একটু চুপ করে থেকে বললো, দেশ হয়তো স্বাধীন হবেও আর পাঁচ দশ বছরের মধ্যেই কিন্তু তখন দেখবি কিরকম কেলো হয়। দুশো বছর

কতগুলো ভীরু, ফাঁকিবাজ, চাবুক দেখে কাজ-করা মানুষ ইংরেজের বুটের নিচে চাপা পড়ে কুঁই কুঁই করেছে বটে, কাজটা ঠিকমতো করেছে প্রাণেরই ভয়, পেটে মরার ভয়ে। দেখবি রিভে, ওরা চলে যাবার পর যখন এইসব মানুষ নিজেরাই হাতে ক্ষমতা পাবে, নিজেরাই বড় সাহেব হয়ে বসবে ; তখন দেশের কী হাল এরা করে !

হুলো বিমর্ষ হয়ে বড় শিমুল গাছটার দিকে চাইলো। বীজ আসছে একে একে। শীত ফুরোলেই বীজ ফেটে তুলো উড়বে দিকে দিগন্তরে। নীল আকাশ পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিশেছে। একঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেলো কাঁকড়িকিরা জঙ্গলের গভীরের ঝিলের দিকে।

কী রে ! হুলো ?

হুলো বললো, ইংরেজরা চলে গেলেও আমার মনে হয়, তার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমরা আবার পরাধীন হয়ে যাবো। সেই পরাধীনতা হয়তো যুদ্ধের হারের মূর্তি নিয়ে আসবে না। আসবে অন্যভাবে। দেখিস। দেশের সাধারণ মানুষ নয়, এই আকবর, রোকীব, দুখিয়া, পাঁচু, গরুর গাড়িওয়ালা মকবুল এদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। কিন্তু অবস্থা ভালো হবে এই ব্যবসাদারদের। তোর বাবার মতো পান-খাওয়া, চা-খাওয়া বাবুদের। দেশের সাধারণ লোক এবং তারা বুঝতে পারার আগেই সারা দেশটা কিছু মানুষের পেটের মধ্যে চলে যাবে, যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে অথবা ক্ষমতা তৈরি করার ক্ষমতা থাকবে, এবং তখন সেই পেটে লাথি মেরে পেট ফাটিয়ে অন্য কোনো দেশের লোকেরা এসে ভারতবর্ষের জিম্মাদারী নেবে আবার। তুই দেখে নিস। যদি আমি বাঁচি ততদিন তো আমাকেও তা হয়তো দেখতে হবে। কী আর বলবো ! এতোগুলো লোকের এতো ত্যাগ, এতো পড়াশুনো নষ্ট, এতো প্রাণ বিসর্জন সব বৃথা যাবে।

তুই কি গান্ধীজীর কথা বলছিস ?

হুলো বললো, না।

একটু থেমে বললো, স্বাধীনতা যদি আরও কিছুদিন পরে আসে তাহলে দেশের ভালো ছাড়া ক্ষতি হতো না। এক্ষুণি স্বাধীনতা এসে গেলে বিপদও আছে। মনে কর একটা লোক একটা দু মণি বস্তা মাথায় নিয়ে হাঁটছে। তাকে পৌঁছতে হবে ধর পাঁচ ক্রোশ দূরে। লোকটার স্বাস্থ্যও তেমন। তার পাশে পাশে একটা হাড়-লিকলিকে রোগা লোক সমানে হাঁটছে আর বলছে, আমাকে দাও, আমাকে দাও ; আমি নেবো। প্রথম লোকটা বিরক্ত হয়ে যদি দ্বিতীয় লোকটার ঘাড়ে বস্তাটা দিয়েও দেয় তাহলে সে মুখ থুবড়ে পড়বে না ? নির্ঘাৎ পড়বে। হয়তো ঐ বস্তাচাপা পড়েই মারা যাবে। তাছাড়া ইংরেজরা কম সেয়ানা নয়। স্বাধীনতা দিলেও তারা এমন করেই দেবে যে সেই টুকরো-করা স্বাধীনতা হজম করা ভারী মুশকিল হবে। দেখিস।

আমি বললাম, তুমি অবশ্য অনেক জানো, পড়ো, বেশি বোঝও আমার চেয়ে, কিন্তু এ তোমার অন্যায়। ইংরেজদের চেয়ে আমরা কিসে কম ? ওরা আমাদের

কলকারখানা করতে দেয় না, স্বাবলম্বী হতে দেয় না, এখান থেকে জিনিস বানিয়ে নিজের দেশে চালান দিয়ে সেখান থেকে আবার ফেরৎ পাঠিয়ে এখানে আমাদেরই কাছে বিক্রী করে। কি ? করে না ? দেশ স্বাধীন হলে ঝকঝকে হাসপাতাল, পরিষ্কার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব হবে। কত কিছু শেখার সুযোগ পাবে আমাদের মতো সাধারণ ঘরের ছেলেরাও।

তা হবে। তবে কলকারখানা আর রাস্তাঘাট আর বিজলী বাতি, বা স্কুলের চকচকে বাড়ি হলেই তো একটা দেশ 'মানুষের দেশ' হয়ে ওঠে না। দেশকে মানুষের দেশ করতে শুধুমাত্র মানুষেরাই পারে। মানুষের মতো মানুষ। আনন্দমঠ-এর উপক্রমণিকাতে আছে, শুনলি না ?

তোমার পণ কি ?

"আমার জীবনসর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ। সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

আর কি আছে ? আর কি দিব ?

"ভক্তি।" মনে আছে ? দশম পরিচ্ছেদে ভবানন্দ যখন মহেন্দ্রকে বলছেন,

"তোমাকে মানুষের মতো মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা।"

হুলো বললো, আমাদের মধ্যেই ইংরেজদের চেয়ে বড় বানীয়ারা আছে। অনেক বড় লোভী আর অত্যাচারী আর গদির কাঙাল আছে। ইংরেজরা সরে গেলেই তারা সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে কাঁকড়ার মতো কামড়া-কামড়ি শুরু করে দেবে। দেখিস তুই। বাংলার ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস তাই বলে। হরিরাম আগরওয়ালাকে চোখের সামনে দেখিস না ? মুখে কী মিষ্টি, যেন আঙুর ঝরে! আর পেছন দিয়ে মাখন পালকে খুন করিয়ে দিলো। ইংরেজের খারাপটুকু যত ছিলো তা আমরা ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছি। ফেলে দিয়েছি ভালো জিনিসগুলোই। এ স্বাধীনতা না-আসাই ভালো। অন্ততঃ এখুনি নয়।

আমি বললাম, এ কথা অন্য কাউকে বলো না। তোমাকে ভুল বুঝবে।

স্বাধীনতার পরে বললে, আরও বেশি ভুল বুঝবে। চাই কি তখন ঐ হরিরাম আর পার্টির দাদারা মিলে দেশদ্রোহী বলে নিজেরই দেশের নিজেদেরই স্বাধীন সরকারের অর্ডারে জেলেও পুরে দিতে পারে। সবকিছুই হতে পারে। ইংরেজদের তবু কিছু লজ্জা, চোখের চামড়া ছিলো, আমাদের দেশের লোক ক্ষমতাসীন হলে তারা একেবারেই নির্লজ্জ হবে। দেখিস্।

ঝড়

পণ্ডিতমশায়ের মন খুব খারাপ। সেদিন ক্লাসে এসে হাতের বেতটি টেবলের উপর লম্বা করে রেখে আর সংস্কৃত গ্রামারের বইটিও দুটি হাতের তেলোর মধ্যে রেখে দিয়ে গভীরভাবে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

প্রণব বললো, আপনার শরীর কি খারাপ স্যার ?

শরীরটা তো খারাপ যাচ্ছেই তার উপরে কালকে পুলিশ এসে আমার বাড়ি সার্চ করলো রাতদুপুরে। ব্রাহ্মণী তো বেজায় চটে গেছেন। আমরা অতি গরীব মানুষ বাবা, কোনোক্রমে একবেলা দু মুঠো ফুটিয়ে বাঁচি। হাড়িকুড়ি ভেঙে, শিকেয় ঝোলানো দুধের ভাণ্ড মাটিতে ফেলে, জামাকাপড় ধুলোয় ফেলে, লাঠির বাড়িতে দরমার বেড়া চৌচির করে ওরা চলে গেল। একজন ব্রাহ্মণীর চুলের মুঠি ধরে কয়েক ঘা লাগিয়েও গেলো। খারাপ খারাপ কথাও বলেছিলো বাবা, যা তোমাদের বলতে পারছি না।

আমরা বললাম, সে কী স্যার ? পুলিশ কার ? এডমাণ্টন সাহেবের ?

না, না। এডমাণ্টন সাহেব তো ডি. এফ. ও.। সদরের পুলিশ সাহেব তো ছিলো মার্ফী। সে খুব ভালো সংস্কৃত জানতো। আমাকে চিনতোও। নতুন এক সাহেব পুলিশ এসেছে সদরে তার নাম গিলিগ্যান। দুজনেই বেদম মদ খায় আর আমাদের বলে নেটিভ নিগার। অন্য কোন্ জেলায় যেন স্বদেশিকরা অনেক ছেলেকে গুলি করে মেরে এসেছে এই গিলিগ্যান। এবারে কাঁকড়িকিরার শান্তি গেলো।

কনক বললো, যত দোষ পরেপরা আর নরেপরার। ওরা যদি এডমাণ্টন সাহেবের মাথায় থুথু না ফেলতো তাহলে এডমাণ্টন সাহেবও গিলিগ্যান সাহেবকে বলতেন না।

সবই সময়ের ব্যাপার বাবা। সময় বড় প্রবল।

আরে হুলোকে দেখছি না ?

—তাই তো! আমরাও লক্ষ করিনি যে হুলো ক্লাসে নেই। অবশ্য ওর তো আসা-যাওয়ার ঠিক থাকে না। তাই আমরাও তত খেয়াল করতাম না ও ক্লাসে আছে কী নেই।

আমরা হুলোর না-আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছি এমন সময় হেডমাস্টার স্যার দৌড়ে এলেন ঘরে।

শুনেছেন পণ্ডিতমশায় ?

পণ্ডিতমশায় সব সময় চেয়ারের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতেন। তাড়াতাড়ি হেডমাস্টারমশায়কে দেখে পা নামিয়ে বললেন, কী হলো ! কি হয়েছে মদনবাবু ?

হুলোকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ আজ সকালে। পুলিশ লক্‌আপে রেখেছে। গিলিগ্যান-এর নির্দেশে। ওর দিদিমাকেও চড় মেরে অসম্মান করেছে, সদর থেকে মুজাফরপুরের পুলিশ এসেছিলো। আমাদের এখানের কোনো পুলিশের এতো বড় সাহস বা অসভ্যতা হতো না। বাড়ি সার্চ করেছে বিপ্লবীদের কোনো কাগজপত্র বা অস্ত্র পায় কিনা। শেষে আনন্দমঠখানি আর গুলতির জন্যে অ্যারেস্ট করেছে ওকে।

চার্জ দিয়েছে কি ?

ছেলেদের উত্তেজিত করা, দলবন্ধ করা, নেতৃত্ব দেওয়া, এমন কি মাস্টার-মশাইদেরও ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের পক্ষে, দেশে এইরকম বিপজ্জনক ছেলেকে কখনও বাইরে রাখা ঠিক নয়।

আমরা হতবাক হয়ে গেলাম শুনে। এ খবর আমরা কেউই জানতাম না।

প্রভাত বললো, পুলিশ লক্‌আপে দেখা হবে স্যার হুলোর সঙ্গে ?

ওকে কাল সকালে সদরে চালান করে দেবে। স্কুল ভাবছি ছুটি করে দেবো। হেডমাস্টারমশাই বললেন। তারপর মুখ নীচু করে বললেন, হারামজাদা স্কুলের সবচেয়ে খারাপ ছাত্র, কলঙ্ক ; কিন্তু এ স্কুলে ওর মতো আর কেউই নেই।

পণ্ডিতমশায়ের চোখ ভিজে উঠলো, বললেন, ওর কী সাজা হবে ?

সাজা যা খুশি হবে। আমাদের দেশ তো স্বাধীন নয়। জজরা বেশিই সাহেব। অন্যরাও সাহেব-চাটা। সরকারের পক্ষে রায় দিয়ে নিজের আখের গোটানোর মতো দিশী জজও তো বেশি। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন অবশ্য জুডিসিয়ারীই হবে দেশের আসল মালিক। তাদের আইনের ব্যাখ্যার চাবুকে চাবুকে প্রশাসন তটস্থ থাকবে। সেদিন দেশে প্রকৃত আইনব্যবস্থা চালু হবে। এখন আইন বলে যা চলে, তা তো প্রহসন। তবে হ্যাঁ ! ব্রিটিশ আমলে কোনো জজ ঘুষ খেয়েছে বলে শুনিনি।

তবে আমরা চাঁদা করে মামলা লড়বো হুলোর হয়ে যত টাকা লাগে। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে গোপেন বললো।

হেডমাস্টারমশাই হেসে বললেন, কত টাকা তুলতে পারবি তোরা ? সে সমুদ্রে শিশির। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তর দপ্তরে সেই বলে গেছিলেন না, আইন সে তো তামাশা মাত্র ! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে তা আজও সত্য।

পণ্ডিতমশাই বললেন, এই ইংরেজ ব্যাটাদের একবার তাড়াতে পারলে দেখবি গান্ধীজী জওহরলালেরা এক সোনার দেশ গড়বে। যে দেশে সব গরীব খেতে

পাবে, কারো উপর জুলুম বা অন্যায় থাকবে না। সবাই সৎ হবে। আইন-ব্যবস্থার ভিত এমন দৃঢ় হবে যে প্রধানমন্ত্রী থেকে সব আমলারা থরথর করে কাঁপবে সেই ব্যবস্থাতে। অন্যায় করার সাহস কারোই হবে না। দেশের মতো দেশ হয়ে উঠবে দেখিস এ দেশ। সোনার দেশ। কনট্রোল উঠে যাবে। জিনিস-পত্রর দাম হবে জলের মতো। আহা, কবে আসবে মদনবাবু সেই সোনার দিন ?

মদনবাবু হেডমাস্টার বললেন, তোমরা পাঁচ-দশ মিনিট পরপর গিয়ে দেখা করো হুলোর সঙ্গে। স্কুল একসঙ্গে ছুটি করে দিয়েছি শুনলে আবার আমাদের উপর হামলা করবে।

সে তো করইছে। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

খাওয়া পর্যন্ত হয়নি পণ্ডিতমশায়ের।

মদনবাবুর চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেলো। বললো, আমি অফিসিয়ালীই ছুটি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি। আজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার মায়ের জন্মদিন। আরে দিস তো সাদা সরকার দুশোটি টাকা বছরে, তোদের ঐ দুশো টাকার জন্যে কি স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে ? তখন দেখা যাবে।

তারপর বললেন, তোরা ক্লাসেই বোস। দরোয়ানকে বলছি, ঘণ্টা দিয়ে দেবে। আর শোন্, তোরা যারা হুলোর কাছাকাছি, এই বিমলে, রিভে, প্রণব, কনক, তোরাও একটু সাবধানে থাকিস।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলো।

পণ্ডিতমশায়

গরমের দিন। হু-হু করে হাওয়া বইছে। তবে 'লু' এখনও হয়নি। কিরা জঙ্গল থেকে গরম হাওয়া নানা রঙের পাতা ফুল উড়িয়ে নিয়ে আসছে। সুন্দর ঝাঁঝালো অথচ মিষ্টি গন্ধ। এই হাওয়াটার মাতিস্থির নেই। হুলোর মনেরই মতো। যখন গ্রামের ভেতর থেকে আসছে হাওয়া সেই হাওয়াতে উড়ে আসছে খড়কুটো খুদ-খই হাঁস-মুরগী আর গরু বাছুরের গায়ের গন্ধ। বেশ গেরস্থ গেরস্থ গন্ধ, ঢেঁকিতে তিল কোটার ফুল ফুল গন্ধ মিশে যাচ্ছে এতে।

আমি আর প্রণব যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন লক্ আপে পাহারায় ছিলো মিশিরজী। আমাকে চিনতো। প্রায়ই বিনা টিকিটে ওর পরিবার আনতো দ্বারভাঙ্গা থেকে আর বাবা ওদের বিনা পয়সায় বনের কাঠ সাপ্লাই করতেন বাড়ি নতুন করে বানাবার জন্যে। যাওয়ার সময়ও আবার মেরামত। বললো, দেখা করতে পারো এক এক করে। এখন বড়বাবু ঘুমোচ্ছেন। মেজবাবু সদরে গেছেন কাল হুলোবাবুর চালান যাবার বন্দোবস্ত করতে।

মিশিরজী আমাকে তালা খুলে ঢুকিয়ে দিতেই দেখি, পিছন ফিরে শুয়ে আছে মেঝের খড়ের উপর। ওর দু পায়ে রক্তের দাগ। আমি ডাকলাম, হুলো।

হুলো পাশ ফিরেই হাসলো। বললো, রিভে! তুই আমাকে দেখতে এসেছিস। কতো ভালোবাসিস রে তুই আমাকে!

হুলোর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না। ডান চোখটা কালশিরে পড়ে বন্ধ। বাঁ চোখের কোণায় রক্তের দাগ। ঠোঁটটা কেটে দুভাগ হয়ে গেছে। থুতনীর চেহারা হয়েছে চার কোণা। ভুরু দুটো দেখাচ্ছে ইয়া মোটা মাকড়সার মতো।

খুব লাগছে?

দূর-র।

ওষুধ দেয়নি?

ওষুধ ওদের দেবো আমরা। তোরা দিবি। কষ্ট তো আর কটা দিনের।

দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন এইসব কষ্ট ভুলে যাবে সবাই। নিজেদের দেশ। স্বাধীন দেশ। দেখবি কী চমৎকার করে গড়ে তুলি আমরা!

তুমি কি করবে?

আমার তো বিদ্যাবুদ্ধি নেই! মস্ত সরকারী ডেয়ারী ফার্মে গরু চরাবো। যে গরুর খাঁটি দুধ খেয়ে তোদের ছেলেমেয়েরা, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা সব এই ব্যাটা সাহেবদের মতো গাব্দাগোব্দা হবে।

বলেই, গলা নামিয়ে বললো, আমি একটু ইংরিজি বলছি। কারণ মিশিরজী যতই তোদের জানা লোক হোক না কেন, কোনোদিনও পুলিশকে বিশ্বাস করবি না। আমার বাবা বলতেন। বলেই বললো, টুনাইট বমগার্টেন স্যার উইল কাম মাই হাউস। নাইন পি. এম.। ড্যু রিসীভ হিম। আই গিভ এ লেটার টু দিম্মা ফর হিম। গিভ দ্যাট। অ্যান্ড মানি। দিম্মা নোজ। অ্যান্ড টেল দিম্মা আই অ্যাম রাজার হাল। আণ্ডু?

হুলো আণ্ডারস্ট্যাণ্ড কথাটাকে চিরদিনই বলতো, আণ্ডু?

বললাম, এ্যাণ্ডু।

নস্যি ফুরিয়ে গেছে। বড় কষ্ট হচ্ছে রে! এই জন্যে শাস্ত্রে বলে, নেশা-ফেশা করতে নেই।

আমি উঠে বললাম, আমি যাই। অনেকে দেখা করবে।

তাই?

হঁ্যা।

নস্যির ব্যাপারটা একটু দেখিস।

এখুনি দেখছি। চিতুদার দোকানে পাওয়া যাবে তো?

হঁ্যা। পয়সা তুই দিস না। আমার অ্যাকাউণ্ট আছে।

আচ্ছা, বলে আমি চলে গেলাম।

বেরোবার সময় দেখি পণ্ডিতমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। নস্যি প্রবলেম সলভ্। বললেন, আজ সকালেই কৌটো ভরেছি, ওকে দিয়ে দেবো। মিশিরজী পণ্ডিতজীর হাত থেকে ওঁর বেতটা কেড়ে নিলেন। একটুক্ষণ চশমার কাঁচ দিয়ে চেয়ে থাকলেন সাদা কালো খোঁচা খোঁচা দাড়িময় মিশিরজীর মুখে। তারপর ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বমগার্টেন স্যার

রাত নিঝুম। এইরকম জঙ্গুলে জায়গাতে নটা অনেকই রাত। ঝমঝম করে ঝিঁঝি ডাকছে। পেঁচারা ঝগড়া করছে। গ্রামের কুকুরেরা চিৎকার জুড়ে দিলো আমাকে অত রাতে পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে দেখে। আর যেকোনো মাত্র একটা হট্টিটি পাখি আমার মাথার উপরে চক্কর মেরে উড়ে উড়ে হটি-টি-হুট্ হটি টি হুট্-টি-টি-টি-হুট্ বলে ডাকতে লাগলো। আমি পেছন না ফিরেই বুঝতে পেলাম বাবা, বাবা-মায়ের শোয়ার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখলেন।

ভয়ে আমি একটি টর্চ বা হ্যারিক্যানও নিই না। এদিকে গরম পড়ে গেছে। মারাত্মক মারাত্মক সাপ আছে আমাদের এদিকে।

দিম্মা আমাকে ভরপেট খাওয়ার পরও কালাকাঁদ খাওয়ালেন জল দিয়ে। ঠিক নটাতে উঠোনের দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

আমি বললাম, কে ?

সন্তান।

সন্তান কে ?

বমগার্টেন স্যার নিচু গলায় বললেন, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে। গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

আমি বোকার মতো চুপ করে রইলাম। কী বলবো !

দিম্মা ফিসফিস করে বললেন, ঐ বল। ঐ।

আমিও বললাম, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে"। বাক্যটি বলতে বলতেই যেন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মনে পড়ে গেলো, যেদিন হুলো কাঁকড়িকিরা জঙ্গলের গড়ের উপর চন্দ্রালোকিত রাতে আনন্দমঠ থেকে পড়ে শুনিয়েছিলো।

দিম্মার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে বমগার্টেন স্যার পুরোটা পড়ে একটু চিন্তিত হলেন।

আমি বললাম, স্যার, হুলোই তো আপনাকে তাড়ালো ক্লাস থেকে অন্যায় করে আর হুলোর সঙ্গে এতো ভাব হলো কি করে ?

বম্‌গার্টেন স্যার হেসে ফেললেন। বললেন, ও তাড়িয়েই ছিলো আমাে অন্য কাজে লাগাবে বলে। আমার নিজেরই অনেক আগে লাগা উচিত ছিল সবচেয়ে বড় কথা, দেশের কাজ করছি। বিদ্রোহী হয়েছি হুলোর আশীর্বাদে "বল বীর—বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমার নত শির ওই শিখ হিমাদ্রির।"

দিম্মা যত্ন করে বম্‌গার্টেন স্যারকে খাওয়ালেন।

স্যার ওঁর ঝোলা থেকে একটি কালো ভারী জিনিস বের করলেন। মোট ব্রাউন পেপারে মোড়া। বললেন, এটা হুলোর।

এখানে এখন কোনো জিনিসই রাখা ঠিক নয়। এটা বরং রিভে তুই তো কাছেই রাখ। এবং রাতটাই শুধু। ভোর হলেই জঙ্গলের কোথাও গি লুকিয়ে রেখে আসিস। জিনিসটা খুব বিপজ্জনক। রিভলবার।

শুনেই তো আমার পিলে চমকে গেলো।

কিন্তু বললাম, আচ্ছা।

দিম্মা বম্‌গার্টেন স্যারকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে বিদেয় করতে পারলে বাঁচেন। বললেন, কাঁকাড়িকিরা কী সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাট গ্রাম ছিলো বলো তো বাবা! এই পরেশরা আর নরেশরা যদি এডমাণ্টন সাহেবের মাথায় থুথুটা না ফেলতো এব মাফী সাহেবের জায়গায় যদি গিলিগ্যান না আসতো তবে···

এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়লো।

আমি গিয়ে বললাম, কে? এত রাতে কে?

উত্তর হলো, সন্তান।

বম্‌গার্টেন স্যার প্রথমে খুলতে বলেই হাত দিয়ে বারণ করলেন। তিন সেকেণ্ড শুনেই তিনি নিঃশব্দে হুলোর দিম্মার ঘরের পেছনে যে ঝাঁকড়া লিচু গাছটা ছিলো সেদিকে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেলেন।

দরজা খোল্‌বে শালা।

এবার বললো আগন্তুকেরা।

আমি বুঝলাম, হরে মুরারে মধুকৈটভারে ইত্যাদি হচ্ছে কোড ওয়ার্ড। সন্তানের পর বলবার।

দরজা ভেঙে দেবো। বলেই দরজায় লাথি মারলো তারা।

দিম্মা দৌড়ে এসে রিভলবারটা নিয়ে নিজের বুকের ভিতরে গুঁজে দিলেন। অনেক পুলিশ। মেজ দারোগা, মিশিরজী, চারজন সেপাই।

বললো, মাস্টের কাঁহা গ্যয়া?

মাস্টের?

আমি স্কুলে একটু অভিনয় করতাম। বললাম, কোন মাস্টের? বম্‌গার্টেন? সে তো কাল সকাল দশটাতে আসবে জঙ্গলের দিক দিয়ে।

এই খাবার কে খাচ্ছিলো?

আমি। আমার বাড়িতে জিগেস করে দেখো বাড়িতে আমি খেয়েছি কিনা হুলো আমাদের বন্ধু। ওর জন্যে আমাদের মন সকলেরই খারাপ। বাবা-মা

বকলেও খাইনি। কিন্তু বেশি রাতে খিদে বেড়ে যাওয়ায় দিদিমার কাছে চলে এলাম। শালবনটা পেরুলেই তো পথ।

দিদিমা বললেন, একটা বাচ্চা ছেলে খিদে পেটে খেতে এসেছে, তাকে এতো জুলুম কেন? কাল আমার উপর জুলুম তো কম করোনি বাছারা!

বদমাশ ছেলে বাড়িতে থাকলে জুলুম তো হবেই। যারা দেশের সর্বনাশ করছে তাদের আমরা খুন করে দেবো।

দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন তোমাদের ছেড়ে দিলে বড় ভুল করবে নেতারা। তোমরা, যারা সাহেব উপরওয়ালার পা চেটে আর ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে অন্যায় করেছো সেই তোমরাই তাহলে নেতাদের কাছেও তাই-ই করবে। জানি না নেতারা কোন্ ধরনের দেশ আর কোন্ ধরনের পুলিশ চাইবেন। নেতারাও যদি সাহেবদেরই মতো মালিক হয়ে ওঠেন সে স্বাধীনতার মুখে আমি ঝাঁটার বাড়ি মারি।

এই, মুখ সামলে কথা বলো।

ভাগো, ভাগো এখান থেকে। কাল তোমরা আমার চুল টেনে ছিলে, হাত ধরে হ্যাঁচকা টান লাগিয়েছিলে। আজ যদি কাছাকাছিও আসো তো বঁটি দিয়ে তোমাদের নাক না কাটলে আমার নাম ক্ষেমদাসুন্দরী নয়!

ভাগো, এখান থেকে।

পুলিশরা কিছুক্ষণ টর্চ-ফর্চ জ্বাললো এদিক ওদিক। লিচুগাছের দিকেও ফেলেছিলো একবার, কিন্তু সাহেব, বমগার্টেন স্যারের ভিখিরির ভেক লিচুর সাদাটে ডালে মিশে ছিলো।

মেজো দারোগা বললো, চলো।

আমাকে বললো, তুইও তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বাড়ি চলে যা। পনেরো মিনিটের বেশি থাকবি না এখানে। তোর বাপ তো হরেনবাবু। তাকেও ঝামেলাতে ফেলবো যদি তুই একটুও এদের দলে থাকিস।

ওরা চলে যাবার সময় আমি দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখলাম। না, কেউ কোথাও নেই।

বমগার্টেন স্যার টাকার প্যাকেটটা পকেটে নিলেন, তারপর গোগ্রাসে গিললেন।

বললেন, আর ক' মিনিট থাকতে পারবে তুমি রিভে। দশ মিনিট। তবে শোনো, তোমাকে একটা বই-এর থেকে শোনাই। এই বইটাও তোমার জিম্মায় দিয়ে দেবো। এটা তুমি পণ্ডিতমশায়কে পৌঁছে দেবে। কাল স্কুলের বইয়ের সঙ্গে নিয়ে যেও।

কি বই?

শরৎবাবুর "পথের দাবী"। একটুখানি শোনাই শোনো।

"ভারতী কহিল, পড়ুন না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মনঃসংযোগ করিয়া বলিল, পথের দাবী! তার মানে?

ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা। আপনি আমাদের সভ্য হবেন?

অপূর্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে?

ভারতী বললো, আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙেচুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?''

বাঃ। আমি বললাম।

আর বাঃ বাঃ করার সময় নেই। আমি চললাম। আমার মাথায় হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিয়ে বমগার্টেন স্যার বললেন, কাউকে বলো না আমার কথা। ও ভালো কথা, এই নাও এক কৌটো নস্যি। আমার মামাতো ভাই ম্যাড্রাস থেকে এনেছে। হুলোকে পারলে পেঁছে দিও। না পারলে পণ্ডিতমশাইকে।

হুলোর কি হবে স্যার?

সবকিছুই হতে পারে, আবার কিছুই না হতে পারে।

পণ্ডিতমশাই

পণ্ডিতমশাই এই বুদ্ধিটা দিলেন আমাদের এবং প্রণব, কনক, যোগেন, পরেশরা নরেশরা সকলে মিলেই সায় দিলো তাতে।

আজ গিলিগ্যান সাহেব এসে গেছেন হুলোকে আরও মারধোর করে জবানবন্দী বের করতে। তারপর তিনি রাতে রাতেই ফিরে যাবেন কাঁকড়িকিরার জঙ্গল পেরিয়ে সদরে। কাল ভোরে পুলিশ ভ্যানে করে হুলোকে নিয়ে গিয়ে কাছারীতে উপস্থিত করবে।

কাঁকড়িকিরার জঙ্গলে পথটা ঢুকে মাইল তিনেক অবধি জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে আবার ফাঁকায় বেরিয়েছে। সেই পথে পিলা নদীর উপরে একটা কাঠের সাঁকো আছে। সাঁকোটার কাঠগুলো প্রায় নতুন। কাঠের সাঁকো। গাড়ি গেলেই ধড়ফড় ধড়ফড় করে। পণ্ডিতমশায় বুধন গোয়ালাকে নরেনকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। বুধন তার বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির কাঠের পাটাতন বদলাচ্ছিলো। বারান্দার পাটাতনগুলো এমনই নরম হয়ে গেছিলো যা পা দিলেই মড়মড় করে। ওদের বাড়িতে একবার হাতি এসেছিলো, সেই ভয়ে ওর বাবা ঐরকম বন-বাংলোর মতো বাড়ি বানিয়েছিলেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, তার এক ছাত্রর বাড়িতে কিছু ব্যবহার করা শালের ভালো স্লিপার আছে। খুবই সস্তায় হয়ে যাবে। বদলে পুরোনোগুলো তাকে দিতে হবে। সে মুরগীর ঘর, গরুর ঘর করবে। দাম শুনে তো বুধন একবাক্যে রাজী হয়ে গেলো। কথা হলো, পণ্ডিতমশায়ের লোকই তক্তা এনে আজ বারোটার মধ্যে বুধনকে দেবে আর পুরোনো তক্তাও নিয়ে আসবে। পণ্ডিতমশায়ের লোক আর কোথায়? আমরাই সব মুখে চুনকালি মেখে পোশাক বদলে কুলি সাজলাম। স্কুলের দারোয়ান, বেয়ারা সকলেই আমাদের সঙ্গে হাত লাগালো। আগে তো ব্রিজের বোল্টগুলোকে ন্যাকড়া মুড়ে গোবর্ধনদার ট্রাকের বড় রেঞ্চ দিয়ে খোলা হলো। তারপর সেগুলোকে পাট কারিয়ে সাজিয়ে এক এক থাক করে বুধনের বাড়ি অনেক ঘোরা পথে নিয়ে যাওয়া হলো। যারা নিয়ে গেলো তারাই পুরোনো তক্তাগুলো নিয়ে আসছিলো। বুধনের বাড়িটা জঙ্গলের

কাছেই কিন্তু মধ্যে একটা পাহাড় পড়ে। তাছাড়া বুধনের বিড়িপাতার ক
সে সারাদিন এখন ভরসা লোটনের জঙ্গলেই থাকে। রাতে ফেরে।
ছেলের পক্ষে কোথাকার কাঠ এবং জঙ্গলের মধ্যে শব্দ হলেও সে শব্দ কি
শব্দ তা অনুমান করা সম্ভব ছিলো না।

বুধনের কাঠগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে আর মানুষের জুতোর ঘষায় ঘষায় সা
হয়ে গেছিলো। এদিকে পিলা নদীর পি ডাব্লু ডি'র বানানো ব্রিজ এক
কালো, পোক্ত শাল দিয়ে তৈরী। প্রণব আর মধু দু কৌটো কালো জুতে
কালি এনে সাদা কাঠগুলোকে ঘষে ঘষে ব্রাশ দিয়ে কালো করতে লেগে গেলে
সবকিছু শেষ করতে বিকেল হয়ে গেলো।

ঠিক করেছিলাম রিভলবার আর আনন্দমঠটা সন্ধের অন্ধকারে এনে জঙ্গ
কোথাও লুকোবো। কিন্তু গিলিগ্যান চলে গেলেই লুকোবো ভেবেছিলা
ব্রিজের কাছে দু একটা টুকরো-টাকরা পড়ে রইলো সেগুলো পরিষ্ক
করতে রয়ে গেলেন খোদ পণ্ডিতমশাই, দারোয়ান আর বেয়ারারা। হুলো
সকলেই ভালোবাসতো, কিন্তু সে ভালোবাসাটা যে এতোখানি তা এই মুহূর্তে
আগে কেউ বুঝতে পারেনি।

আমরা ধুলো বালি চুনকালি যথা সম্ভব নদীতে ধুয়ে নিয়েছিলাম। ত
আয়না ছিলো না বলে বোঝা যাচ্ছিলো না পুরোপুরি পরিষ্কার হ
কিনা।

বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয় হয়। বাড়িতে পৌঁছেই দে
গিলিগ্যান সাহেবের গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এবং বাবা ও গিলিগ
সাহেব বারান্দায় বসে গল্প করছেন। গিলিগ্যান সাহেব সিগার খেতেন
মোটা সিগার খাচ্ছেন তিনি।

বাবা বললেন, নমস্কার করো।

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। বাবা। আমার বাবা ?

গিলিগ্যান বললো, ইওর ফাদার গট আ প্রমোশন। হি উইল বী
রেঞ্জার অ্যান্ড উইল বী ট্রানসফার্ড ফ্রম হিয়ার। অ্যান্ড উই হ্যাভ গট দ
বলে, কোমরের বোতামওয়ালা পকেট থেকে বম্‌গার্টেনের রিভলবার ও
পথের দাবীটা দেখালো আমাকে। বললো, উ্য হ্যাভ টু কামউইথ মী বয়

থানাতে নিয়ে চললো আমাকে। আমার নিজের মা থাকলে হয়তো ক
কাটি করতেন। দৌড়ে এসে সাহেবকে বাধা দিতেন। কিন্তু আমার মা
যখন দু বছরের ছিলাম তখনই মারা যান। বাবা বিয়ে করেছেন আবার
বছর আগে। ভাই হবে আমার। শিগগিরি।

থানায় আমাকে হুলোর লক্-আপ-এর পাশে নিয়ে দুহাতে দাঁড় ক
ঝুলিয়ে দিলো। দুহাতের নখ তুলে দিলো। রুল দিয়ে হাঁটুতে কনুইয়ে হা
পায়ের সব গাঁটে মারতে লাগলো। বললো, বলো, ছোকরা, কে দিয়েছে
কোথা থেকে পেয়েছিস ? এই ঘরে আসবার সময় দেখেছিলাম হুলো
অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হুঁশ নেই।

আমার মধ্যে যেন কাঁকড়াকিরার সব হাতির বল দৌড়ে এলো। আমি লাম, তোমরা আমাকে মেরে ফেললেও আমি একটি কথাও বলবো না।

সারাদিন কিছুই খাইনি। খিদেতে অবিশ্বাস্য শারীরিক অত্যাচারে আমার ক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অজ্ঞান হয়ে লাম।

জ্ঞান ফিরলো সকালে। দেখি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। বাইরে চে হচ্ছে। হুলোর তখনও জ্ঞান ফেরেনি। কাল রাতে ভালো খানা-না করার পর গিলিগ্যান যখন তাঁর ছোট সাহেব হান্টার এবং তিন ন পুলিশ বডিগার্ড এবং একজন ড্রাইভার নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে য়ে যাচ্ছিলো তখন পাথরভরা পিলা নদীর মধ্যে ওদের গাড়ি পড়ে যায় রিশ ফিট নিচে। কিন্তু গিলিগ্যান মরেনি তো বটেই, তার গালে একটু টে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি। পণ্ডিতমশাই, স্কুলের দারোয়ান, পুরী, প্রণব, কনক, মধু, পরেপরা, নরেপরা এবং আরও অনেককে ধরেছেন। রা কোথায় আছেন জানা নেই। হয়তো ধরে সোজা অন্য কোথাকার হাজতে লান করে দিয়েছেন। হেডমাস্টারমশাইকে নাকি মকবুল বেত মেরেছে সকলের মনে। মাইকে বলেছে, পুলিশ থেকে চেঁচিয়ে যে, স্কুল আজ থেকে বন্ধ করে দওয়া হলো।

হুলোর দিদিমার আর পরেপরা নরেপরাদের তিনটি ছোট ভাইবোন আর -বাবার কি হবে কে জানে?

হুলো ১৯৮৮ বীরনগর

উনিশশো অষ্টআশী এখন। আমার বয়স এখন অনেক। ছেলেটা মানুষ হয়নি। মানুষ করতে পারিনি। মেয়েটাকে কোনোমতে বিয়ে দিয়েছি। জামাই বহরমপুর লাইনের বীরনগরে স্টেশনের পাশে চায়ের দোকান দিয়েছে। ছেলেটা ভালো। তবে টাকা-পয়সা নেই, ডিগ্রীও নেই। ছোট ভাইটা চোরাচালান করে চালের। আমি খোঁড়া পা নিয়ে ক্রাচে ভর করে দোকানে ওকে যেটুকু পারি সাহায্য করি। দুই ছেলেমেয়ে মেয়ের। তাদের দেখাশুনা করি। মেয়ে বাড়িতে রান্নাবান্না করে, বাসনকোসন মাজে, কাপড়-চোপড় কাচে, উঠোন ঝাঁট দেয়। ধানের জমি নেই একটুও। এই দোকান আর জামাই-এর ভায়ের চাল চোরাচালানের রোজগারই একমাত্র ভরসা। আমি আর আমার বউ যখন কলোনীতে ছিলাম তখন আমার বউ সানু কলেরায় মারা যায় বিয়ের চার বছর পর।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার এসেছে দুদিক থেকে। সকালবেলা। শীতকাল। আমি দোকানের সামনে টুলে খদ্দেরের আশাতে বসে আছি, হঠাৎ একজন মানুষকে দেখে চমকে উঠলাম। সব চুল সাদা। কিন্তু মাথাভর্তি চুল। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। ডান হাতটা নুলো। একটা ছেঁড়া নীলরঙা ছিটের হাফ-শার্ট গায়ে আর নোংরা পায়জামা। পায়ে টায়ার সোলের জুতো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম ক্রাচ নিয়ে। লোকটা এগিয়ে আসছিলো। কাছাকাছি আসতেই আমার মুখ ফসকে বেরোলো, আপনার নাম কি হুলো বাঁড়ুজ্যে ?

হুলো দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর ধীরে সুস্থে বাঁ হাতটা বাঁ পকেটের মধ্যে চালান করে নস্যির একটা ডিবে নুলো হাতটাতে চালান করে দিলো। নুলো হাতটা দিয়ে গায়ের সঙ্গে নস্যির কৌটোটাকে চেপে ধরে নস্যি নিলো এক টিপ।

বললো, তোমাকে তো চিনলাম না ঠিক !

আমি বললাম, রিভে। হুলো। কাঁকড়াকিরা'র রিভে ! বলে, জড়িয়ে ধরলাম।

যে হুলো সবসময় উচ্ছল প্রাণবন্ত, কাঁধে চাপড় দিয়ে কথা বলতো, সে কেমন ঘোলা চোখের, কুণ্ঠিত মুখের, হতাশার মূর্তি হয়ে গেছে।

হুলো বললো, তুই তো বুড়ো হয়ে গেছিস!

ওকে আমি আর কিছু বললাম না। বললাম, বোস বোস, এক কাপ চা খেয়ে যাও। আমার জামাইয়ের দোকান।

হুলো ধন্যবাদ না দিয়েই বসলো। আমাদের সময় ধন্যবাদ, থ্যাঙ্ক উ্য ওসব ছিলো না। আর হুলো তো বিশ্বাসই করতো না ওসবে।

তোর বাবা কোথায় আছেন?

বাবা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কনসার্ভেটর হয়ে রিটায়ার করেছিলেন ফিফটি নাইনে। গত বছরে মারা গেছেন শুনেছি।

তা তোর এমন অবস্থা কেন? বড়লোক বাপের ছেলে!

বাবার কাছে, জেল থেকে বেরিয়ে আর ফিরে যাইনি। উনিও খোঁজ করেন নি। অবশ্য করলেও যেতাম না।

হুলো কিছু না বলে আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো।

তোর হাত ভাঙলো কি পুলিশেই?

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালো হুলো।

একেবারে নুলো করে দিলো তাও ডান হাত? ক' বছর জেলে ছিলি?

ঐ ন' বছর। মুক্ত দেশে মুক্তি পেলাম। ফর্টি সেভেনে। তোর পা? পুলিশই না···

হ্যাঁ। পুলিশ। আমিও ফর্টি সেভেনেই ছাড়া পেয়েছি।

তোদের এখানে মানে এই জেলাতে স্বাধীন দেশের পুলিশি অত্যাচার কেমন?

আর বলিস না। কহতব্য নয়।

চালের কেজি কতো করে?

পাঁচ টাকায় উঠেছিলো। একটু নেমেছে।

মাছ পাস?

ঐ নামেই! কুচোকাচাই। বড় তো সব চালান যায়। তাছাড়া, যা দাম! কেনার সাধ্য নেই। আমাদের ছেলেবেলার হামফ্রী আর গিলিগ্যানেদের লাল পাগড়ি পরা সেপাইদের দেখেই তখন সকলে ভয় পেতো। না রে? এখন তো আমরা স্বাধীন। লজ্জা, ভয় ভদ্রতা এসব প্রয়োজন আমাদের সব ফুরিয়ে গেছে।

হাসপাতাল? ভালো তো এখানে? নাকি কলকাতারই মতো? স্কুল?

কেষ্টনগরে যাই অসুখ হলে। স্কুলের কথাও বলার না। বাঁকাড়িকিরার দিন থেকে এগোয়নি বিশেষ। বরং খারাপই হয়েছে। রাজনীতি ঢুকেছে সবেতে। পার্টির ভালো—করা দাদাতেই দেশ ছেয়ে গেছে। দেশের ভালো করার কেউ আর নেই।

অল্পো!

তুমি কোথায় থাকো হুলো ?

আমি ? শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে। ঘরবাড়ি তো সব পূব পাকিস্তানে।

এখনও ? লজ্জা করে না ? এতো বছর ?

এ দেশে লজ্জা কি কারোই আছে রে রিভে ?

ভিক্ষা চাও নাকি ?

ডান হাতটাই যে নেই ?

কিন্তু নাঃ ছিঃ। এখনও পারি না। তাইই তো এতো দুঃখ।

দুঃখ কিসের ?

না, মানে ভিক্ষা চাওয়ার রক্ত নেই ভিতরে, তারপর হাতও নেই। যে যা দেয়। না খেয়ে খেয়েই আয়ু বেড়ে গেলো।

চা খাও হুলো। বুঝলে রমেশ, এই হলো হুলো। যদিও—আমাদের দাদা। তবে আমরা নাম ধরেই ডাকতাম। কতো গল্পই যে করি হুলো তোমার, ওদের কাছে! আমার মেয়ে, নাতি-নাতনির আছে। বাড়ি চলো হুলো, আজ খেয়েদেয়ে যাবে, যা ডাল-ভাত হয়।

হুলো চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেতে খেতে হাসি আর কান্নার মাঝামাঝি একটি অভিব্যক্তি করলো।

ফ্রীডম-ফাইটার হিসেবে পেনসন চাও না কেন সরকারের কাছে ?

সেও তো ভিক্ষাই। ভিক্ষা আমি চাই না। তাছাড়া আমরা তো কোনো পার্টির ছিলাম না। আমরা দেশকে ভালোবাসতামই শুধু। ভালোবাসার পুরস্কারও পেয়েছি। কি বল ? দেশকে ভালোবাসাটা কোনো ব্যাপার নয়। পার্টির মেম্বার হতে হবে। তবেই তুই রেজিস্টার্ড দেশসেবক।

আমি বললাম, হুলো, তুমি কতো কথা বলতে, মনে আছে ? দেশ স্বাধীন হলে কতো কী হবে। কতো ভালো কিছু।

হুলো চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, আমি অবশ্য অন্য কিছু কথাও বলতাম, একমাত্র আমিই। স্বাধীনতা যখন পেয়েছিলাম তখনও আমরা তার যোগ্য হইনি। কোনোদিক দিয়েই। আর হইনি যে রিভে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আজকের আমি আর তুই। একচল্লিশটা বছর কেটে গেছে। এর চেয়ে কোনো বড় প্রমাণের প্রয়োজন কি আর আছে।

আরেক কাপ চা খাবি ?

না রে। আর একটা বিস্কুট খাওয়া বরং, সকাল থেকে খাইনি কিছু।

যাবি কোথায় ?

গার্ড সাহেবের ছেলেকে একটা জিনিস দিতে। এইভাবেই যা পারি, করি।

বিস্কুটটা খেয়ে হুলো বললো, আনন্দমঠের উপক্রমণিকার কথা মনে আছে তোর ? বিবেকানন্দর কথা ? পথের দাবী ?

ভুলে গেছিরে হুলো। এই ক'বছরের পেটের খিদে সবকিছু ভালো, সবকিছু সুন্দরকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সঙ্গে এই প্ল্যাটফর্মের কুলিরও মানসিকতাতে, সংস্কৃতিতে কোনোই তফাৎ নেই আর।

ভুলিস না। কখনও ভুলিস না। ওগুলোও ভুললে বাঁচবি কি নিয়ে? খাওয়া পরা নিঃশ্বাস ফেলা প্রশ্বাস নেওয়াটাকে বাঁচা বলে না যে রিভে। মনে নেই? তোর?

উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রভুকে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ। সকলেই তাহা দিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

মনে নেই? মনে পড়েছে?

তারপর হুলো বললো,

যাক, আমাদের জেলে যাওয়া থেকে আর পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলো। আমার পণ সত্য হতে চললো। তোরও বাহাত্তর তেয়াত্তর হবে। আমাদের ভুল হয়েছিলো রে রিভে। সাহেব গিলগ্যান আর এডমান্টনদের মারার আগে তোর বাবার মতো কিছু দিশি আফসার আর নিশিরঞ্জনের মতো কনস্টেবল, আর হেমবাবুদের মতো দারোগাদের, হরিরামের মতো ব্যবসাদারদের মাথা উঁচু ছিলো। দেশটাকে সাহেবরা দুশো বছরে আর কতোটুকু নষ্ট করেছিলো! এই একচল্লিশ বছরে আমরা···

হুলো চলে গেলো। বললো, ফেরার সময় দেখা করে যাবো। এর জিনিস ওর কাছে, তার জিনিস ওর কাছে করে বেড়াই। এই করেই একটা পেট চলে যায়। আর নেশা তো নস্যি। আট আনায় সারাদিন।

তোমার "জিনিসের" উপর তো ভরসা নেই। আমার হাতে রাঙতা পেপারে মোড়া একটা জিনিস দিয়েই তো গণ্ডগোলটা করলে! আমার জীবনটাই পাল্টে গেলো।

তুই কি অনুতপ্ত রিভে? আমি লজ্জিত। তোকে জড়ানো, কাউকে জড়ানোই উচিত হয়নি। বমগার্টেন স্যারকেও!

ঠিক তা নয়। কেমন আছেন বমগার্টেন স্যার?

পাটনাতে পুলিশের গুলি খেয়েছিলেন বুকে। মরার সময় এমন শেক্সপীয়র আবৃত্তি করেছিলেন যে, সাহেব সিভিল সার্জন পাশে দাঁড়িয়ে অনেক বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। অপারেশন টেবিলেই মারা গেছিলেন। যাই বলিস রিভে, ইংরেজদের মধ্যে অনেক গুণও ছিলো। বলেই, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো হুলো।

তারপর বললো, জীবনকে তো তুই যেমন করে গড়েছিস নিবি জীবন তেমনই হবে। তা তোর পাপই না থাক কী হাতই না থাক! নস্যি নিবি নাকি একটু?

আমি হেসে ফেলে বললাম, দাও একটু। কোনোদিনও তো গত পঞ্চাশ বছরে কথা রাখিনি তোমার।

আমি তোকে কখনও নিতে বলিওনি। বাচ্চা ছেলে ছিলি তো।

আমাকে নস্যি দিয়ে হুলো যখন চলে গেলো, পেছন থেকে সকালের রোদভরা প্ল্যাটফর্মে ওকে দেখে আমার মনে হলো, কুঁজো তো হয়ইনি ; ও যেন আরও অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে। অনেক।

মেরুদণ্ড টানটান করে হাঁটছে একজন মানুষ। 'মানুষের মতো মানুষ'। এতোজন মানুষের মাথার উপরে উপরে ভেসে চলেছে ওর মাথা।

কোথা থেকে যেন কতোদিন আগে পড়া 'পথের দাবী'র ভারতীর কটি কটি কথা মাথার মধ্যে উড়ে এলো ঃ

"ভারতী কহিল ঃ 'আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙেচুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, এই আমাদের পণ।' আসবেন আমাদের দলে ?"

দুটি ট্রেন একই সঙ্গে দুদিকে ছেড়ে দিলো। বীরনগরে আপ এবং ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ক্রসিং হয়। চাকার ঘড়ঘড় চিৎকার, চেঁচামেচি, ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, ধুলো, কফ, থুথু, গালাগালি, ঠেলাঠেলি ধোঁয়ো…মাথা ধরে গেলো। জামাই-এর চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে দু হাতে আমি দু কান চেপে ধরলাম।

তারপর মুখও।

উঁচুমহল

বম্বের নারিমান পয়েন্ট-এ দূরে থেকে যে বাইশ-তলা হালকা-ছাইরঙা বহুতল বাড়িটি দেখা যায় তার একতলার এন্ট্রান্সে ঝকঝকে পেতলের প্লেটে লেখা আছে এম বি. ইন্টারন্যাশনাল ইনক্। তার নিচে বারোটা লিমিটেড কোম্পানীর নাম।

এম. বি. ইন্টারন্যাশনাল ইনক্ আমেরিকাতে ইনকরপোরেটেড নয়। আমেরিকার লিমিটেড কোম্পানীগুলির শেষে থাকে "ইনক্", যেমন সুইডিশ কোম্পানীর আগে থাকে "আক্‌টিবোলাগেট" অথবা সুইস কোম্পানীর আগে থাকে "সোসাইটে"।

চা, কফি, টিভি, মিউজিকাল ইনসট্রুমেন্টস্, ইলেকট্রিক ফারনেস্, কটন ও পলীয়েস্টার ফেব্রিকস্, ফার্মাসিউটিকালস্ গুডস্ তাছাড়াও বহু জিনিস নিয়ে ব্যবসা করে এই অতিকায় কম্পানীগোষ্ঠী। অথচ মূল মালিক ঐ এম বি. ইন্টারন্যাশনাল ইনক্। সেটি একটি হোল্ডিং কোম্পানী। আসল মালিক মনীষা বসু। অবশ্য আরো দুজন ডামি ডিরেক্টর আছেন। তাঁরা মনীষারই বেনামদার।

বম্বেতে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত ইত্যাদি কোনো ঋতুর বালাই নেই। বম্বের লোকেরা বলেন, মাত্র তিনটিই ঋতু এখানে। হট্, হটার এবং হটেস্ট।

এখন হট। জুলাই মাস।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ঠিক সাড়ে ন'টায় একটি আকাশী-নীল রঙা বি এম. ডাব্লু গাড়ি এসে মেইন গেট-এর সামনে দাঁড়ালো।

মনীষা নিজেই চালাচ্ছিল। পেছনে ধবধবে টেরীলীনের উর্দি আর টুপী পরা ড্রাইভার। চারজন ডোরমেন দৌড়ে এসে দরজা খুলল। মনীষা নামল। হালকা ফেডেড্-জিনস্ এবং উপরে হালকা-হলুদ একটি সিল্কের জ্যাকেট পরে। বুক-পকেট থেকে কালোর মধ্যে সাদা ফুল-তোলা একটি কলম উঁকি দিচ্ছে। মঁ-ব্লাঁ মাস্টারপীস্।

মনীষার বাবার কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া এই কলমটি। বাবার মাত্র এই একটি সম্পত্তিই মনীষা চেয়ে নিয়েছিল, বাবা যখন বেঁচেছিলেন। দুই বোন,

দুই ভাই বাবার অন্য সব কিছুই পেয়েছে। মনীষা কিছুই নেয়নি। ও জানে যে, সবই নিয়েছে। বাবার গুণ বলতে যা কিছু ছিল সেই সেইসবের উত্তরাধিকারিণী। জাগতিক সম্পত্তি আর দোষ অন্যরা কাড়াকাড়ি করে নিয়েছে। অবশ্য ও শুধুই যে গুণ পেয়েছে এমনও নয়। দোষ মনীষা যে একেবারেই পায়নি তা বলা যায় না। মনীষা নিজেই শুধু জানে সেই দোষের কথা। সেই দোষ হচ্ছে জেদ। দোষও বটে গুণও বটে। কিন্তু সেজন্যে ও কিছুমাত্র বিব্রত বা লজ্জিত নয়। অমন দোষ অমন মেয়েকেই মানায়।

কার্পেট মোড়া লবী পেরিয়ে এসে লিফট্-এর সামনে দাঁড়াল মনীষা। এটি প্রাইভেট লিফট্। সোজা উঠে গেছে। চেয়ার-পার্সন-এর সেক্রেটারীয়েট পেরিয়ে তবে তাকে ঢুকতে হয় নিজের অফিসে। পার্সোনাল সেক্রেটারী, ইকনমিক সেক্রেটারী, ডেভালাপমেণ্ট সেক্রেটারী, রিসার্চ সেক্রেটারী, পাবলিক রিলেশনস্ সেক্রেটারী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাদের প্রত্যেকেরই আছে আবার ছোট্ট একটি ক'রে নিজস্ব দপ্তর।

হালকা গোলাপী রঙা কার্পেট এবং ফিকে নীল-রঙা এক্রিলিক পেইণ্টে মোড়া দেওয়াল। মনীষার নিজস্ব সেক্রেটারীয়েটের টেলেক্স, ইলেকট্রনিক টাই-পরাইটার, পার্সোনাল কমপ্যুটার সব সার-সার সাজানো। এফেক্টিভ এয়ার-কাণ্ডিশানিং। অনভ্যস্তদের ঠাণ্ডা লাগে।

মনীষা প্রত্যেকের "গুড মর্নিং"-এর উত্তরে হাসিমুখে "মর্নিং ট্যু উ্য ওল্" বলেই, নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো।

নিজের ঘরের চারদিকের দেওয়াল বিলিতি ওয়ালপেপারে মোড়া। ঢুকলে, মনে হয়, কোনো গভীর জঙ্গলেই কেউ ঢুকে পড়ল বুঝি। একধারে ঘন সবুজ পাইনের বন। অন্যদিকে হেমন্তর বার্চ ও চেস্টনাট, হলদেটে-লালের বাহার। ফল্। গাঢ় সবুজ কার্পেট নিচে। শেডেড-ল্যাম্প।

চেয়ার পার্সনের ঘরে মস্ত একটি গোল টেবল। কাঁচ-ঢাকা। টেবলের উপরে এক টুকরো কাগজও নেই। মনীষার কোনো বিশেষ চেয়ার নেই। সেই গোল টেবলের যেদিকে যখন খুশি সে বসে। অন্য একটি চেয়ার অবশ্য আছে, জানালার পাশে। জন কেনেডীর মতো। একটি রকিং-চেয়ার। যখনই কিছু ভাবতে হয় তখন সেই চেয়ারে বসেই দোলে মনীষা। না-দুললে ওর ভাবনা খোলে না। টেব্‌লের উপরে মাস্টার ইণ্টারকম্। ছটি টেলিফোন ছ-রঙা।

মনীষার কোম্পানীগুলিতে মেয়েরাই সমস্ত উঁচু পোস্টে আছে। ছেলেরা মুখ্যতঃ কেরানী, মিনিয়াল্‌স, বেয়ারা, ড্রাইভারস। যে-সব মহিলারা "উইমেনস লিব" "উইমেনস্ লিব" করে চেঁচান তাদের মনীষা করুণা করে। উইমেন আর অলরেডী লিবারেটেড। "উইমেনস্ লিব" কথাটার মধ্যেই একটা হীন-ম্মন্যতার গন্ধ আছে। মনীষা সেই কারণেই এই কথাটা অথবা এই কথার প্রবক্তাদের ভাল চোখে দেখে না।

ইণ্টারকম্ তুলে ও পার্সোনাল সেক্রেটারীকে বলল, স্যাসি, হোয়াট আর দ্যা স্পেশ্যাল প্রবলেমস্ অফ দ্যা ডে?

ওনলী ওয়ান ম্যাম্।

কী?

মিস্টার অতীশ সরকার।

হুজ হী?

আমাদের সবচেয়ে বড় কর্মপিটিটর। ইলেকট্রনিকস্-এ। অন্যান্য ক্ষেত্রেও। কলকাতার কলিনসনস্-এর, ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়া ল্যাম্প-এর একসপ্যানসন্ তো মিঃ সরকারই এম. আর. টি পি. তে লাগিয়ে স্টল্ করে দিয়েছেন। এখন লেগেছেন আমাদের পেছনে। আজকেই বারোটাতে আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট আছে।

আজকে? বারোটায়? মাই গড্নেস্। আমাকে আগে জানাওনি কেন?

আপনি তো প্যারিস থেকে গত সপ্তাহে ফিরেই দিল্লী, ম্যাড্রাস এবং কলকাতায় চলে গেলেন। কাল আপনার ফ্লাইট ডিলেইড্ ছিলো তো তিনঘণ্টা। তবুও আমি এরারপোর্টে দু ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর বাড়ি ফিরে যাই। রাত এগারোটায়। ড্রাইভার মকবুল আপনাকে কি আজকের অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের লিস্ট দেয়নি?

ওঃ আই সী। না স্যাসি। মকবুল দিয়েছিল বটে। বাট আই ও'জ ভেরী ভেরী টায়ার্ড। দেখার সুযোগ পাইনি। বাট ইন এনী কেস্ আই কাণ্ট মীট দ্যাট মিঃ সরকার টুডে। উ্য হ্যাভ' টু ক্যানসেল দ্যাট অ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট।

কী বলব ওঁকে?

দ্যাটস্ ইওর বিজনেস স্যাসি। ডোণ্ট আস্ক মী সিলী কোয়েশ্চেনস্।

হী ইজ্ আ বিগ শট্।

আই কেয়ার আ স্ট্র! এম. বি. ইণ্টারন্যাশনাল ইনক্ ইজ নো স্মল অর্গানাইজেশান ইদার।

স্যাসির সঙ্গে কথা শেষ করেই প্রাইভেট সেক্রেটারী কুমুদিনীকে ডাকল মনীষা।

মর্নিং ম্যাম।

মর্নিং! কুমুদিনী। আমার ঘরে এক্ষুনি এসো একবার।

কুমুদিনী সারাভাই-এর কেরিয়ারের ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড-এ সে কিছুদিন চাকরী করেছিল। তারপর একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ্ এজেন্সী চালাতো নিজেই বম্বেতে। এদিকে ইংরেজীতে কবিতা লেখে। ভাল সেতার বাজায়। ইকেবানাতে ওসাকার স্কুলের ডিপ্লোমা হোল্ডার। দেখতেও অতি সুন্দরী। বিয়ে করেছে একজন ম্যানেজমেণ্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে। হী ইজ ভেরী হাই আপ ইন দ্যা টাটাজ। একটিই মেয়ে ওদের। তিন বছর বয়স।

ইয়েস্ ম্যাম। হোয়াটস দ্যা অ্যাসাইনমেণ্ট?

ঘরে ঢুকে কুমুদিনী জিগেস করলো।

মনীষা মন্ত্রী কলমটি দিয়ে ঠোঁটে আলতো করে আঘাত করতে করতে বলল, ওয়েল্। এতদিনে তোমাকে একটি ইন্টারেস্টিং কাজের ভার দিতে পেরে আমি খুব খুশি। তুমি স্মাসির সঙ্গে দেখা করো। মিস্টার অতীশ সরকার অ সরকার অ্যামলগ্যামেটেড্। "আই অ্যাম টোল্ড দ্যাট হী ইজ আ বিগ গাই আই ওয়াণ্ট টু ফাইণ্ড আউট হাউ বিগ হী রিয়্যাল ইজ। তার সম্বন্ধে আমি সমস্ত ইনফরমেশান চাই। যতটুকু আমি জানি, তা হচ্ছে যে, সে ব্যাচেলর কিন্তু প্লে-বয় নয়। উ্য নো, ওয়ান্ অফ দ্যাট টাইপ হু আর ম্যারেড টু মানি আ রিয়্যাল ব্লকহেড্ অফ দ্যাট সর্ট।"

কী কী ইনফরমেশান চাই আপনার ম্যাম্ ?

সব। তার গ্রুপের সব কোম্পানীর ব্যালান্স শীট। এ বছরের বাজেটেড ফিগারও। দিল্লী, বম্বে এবং কলকাতার স্টক এক্সচেঞ্জে তার কোম্পানীগুলোর শেয়ারের দামের ওঠা নামার গ্রাফস্। যদি সম্ভব হয়। তার কোথায় কোথায় ইণ্টারেস্ট আছে ?—ভারতবর্ষে এবং বাইরেও। মাইনর-হোল্ডিং থাকলেও আমার জানা চাই। কোনো ফ্রী-পোর্টে কোম্পানী ফ্লোট্ করছে কিনা! বছরে সুইট্জারল্যাণ্ডে কতবার যায় ? এট্সেট্রা। উ্য নো হোয়াট আই মীন! এবং অফ ওল্ থিংগস, মানুষটার দুর্বলতা কী কী ? রেস খেলে ? মেয়েঘটিত দোষ আছে ? মদ খায় ? গান শুনতে ভালবাসে ? বই পড়ে ? মাছ ধরে ?

দুর্বলতা আমি যতদূর জানি, নেই। আমার স্বামী ওঁকে নানা পার্টিতে মীট করেছেন। ওঁর কাছেই শুনেছি। মিঃ সরকার ইজ আ মেল শভিনিস্ট পিগ্।

তাই-ই ? মাই ফুট !

বলেই তাড়াতাড়ি বললো, সরী। আই ডিডনট্ ওয়াণ্ট টু হার্ট্ ইওর হাজব্যাণ্ড। আই ডোণ্ট বীলিভ ইট্। পুরুষমানুষ মাত্রই দুর্বল। ফাইণ্ড আউট দ্যা এরীয়াজ অফ হিজ উইকনেসেস্। গেট হোল্ড অফ দি অ্যাকিলীসেস্ হীল কুমুদিনী।

মনীষা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ওয়েল ! যদি এই অতীশ সরকার অন্যরকমও হয় দ্যাটস্ ওলসো ফাইন্। দ্যাট স্যুটস মী ফাইন। শুয়োর-পোড়া গন্ধ আমার দারুণ লাগে। বারবীকিউ ! হাঃ ! আ মেল শভিনিস্ট পিগ !

একটু ভেবে মনীষা বলল, তোমার স্বামীকে বলো যে, কালকেই দ্যাট মীনস্ ফ্রাইডে ইভনিং তাজমহল হোটেলে মিঃ সরকারকে ইনভাইট্ করতে। ফর চাইনীজ ফুড। হার্বার বারে উ্য ওল হ্যাভ ইওর ককটেইলস্। তার পর যখন গোল্ডেন ড্রাগন-এ খেতে ঢুকবে তখন আই উইল জাস্ট ওয়াক ইন্ ক্যাজুয়ালী। এলোন। তখনই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তোমরা। আমি তোমাদের টেবলে জয়েন করবো। তারপর লীভ দ্যা রেস্ট টু মী। ইতিমধ্যে অন্য ইনফরমেশানগুলোও জোগাড় করার চেষ্টা করো। গেট ইন্ টাচ উইথ

হিজ ট্রাস্টেড মেন। টাকার বাণ্ডিল ছুঁড়ে দাও। এভ্রীবডী হ্যাজ আ প্রাইস কুমুদিনী। ইণ্ডিয়াও ছোট ছোট আফ্রিকান বা ইস্ট-এশিয়ান দেশগুলোরই মতো হয়ে গেছে। উ্যা ক্যান হ্যাভ এনিবডিজ' লয়্যালটি। ইটস্ জাস্ট আ ম্যাটার অফ প্রাইস্। গভীর লজ্জার, এটা দেশের পক্ষে। কিন্তু গভীর আনন্দের আমাদের পক্ষে। নইলে এমন ব্যবসা করা যেত না। যাই-ই হোক কী করবে না করবে তা তোমারই ব্যাপার। কিন্তু করতে হবে। আই ওয়াণ্ট দীজ ইনফরমেশান বাউট হিম; ভেরী ভেরী ব্যাডলী।

ওক্কে ম্যাম্।

বেস্ট অফ লাক কুমুদিনী। সময় নেই সময় নষ্ট করবার। কুমুদিনী চলে গেলে, মনীষা তার ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারীর লাইন তুললো।

নমিতা ভাট্।

গুড মর্নিং ম্যাম্।

এনি প্রবলেম নমিতা?

না। আজকে কোম্পানী ফিফ্থ-এর নতুন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের ইণ্টারভ্যু আছে। ফিনানসিয়াল অ্যাডভাইজার এবং চীফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট চান যে, আপনি থাকুন সেই সময়ে। ইটস্ আ কীই-পোস্ট।

হোয়াট? সেরগিল্ ওয়াণ্টস মী টু বী প্রেজেণ্ট? হাউ ডেয়ারসশীটেল হার টু টক্ টু মী বাউট ন্যাউ। আই উইল স্যাক্ হার।

কটাং করে ফোন নামিয়ে রাখল বিরক্ত মনীষা।

লাল আলোটা দুবার ব্লিপ-ব্লিপ করে নিভে গেল ইণ্টারকম্-এর।

প্রীতম সেরগিল্ দিল্লীর মেয়ে। ওর বাবা দিল্লীতে ইনকামট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। প্রীতম নিজে চাটার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, কস্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, চাটার্ড সেক্রেটারী এবং ম্যানেজমেণ্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। কমপ্যুটারের ট্রেনিং আছে ওর। সেরগিলই পুরো গ্রুপের নাম্বার ওয়ান ওর ডিভিশনে। অ্যাকাউণ্টস, টাক্সেশান, ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেণ্ট সবই ওর উপরে।

ইণ্টারকম্ পী-পী করলো। প্রীতম লাইনে এসেছে।

বলল, গুড মর্নিং ম্যাম্।

মর্নিং প্রীতম। ডু উ্যা ওয়াণ্ট আ স্যাক্? তুমি কি চাও যে তোমার চাকরীটা চলে যাক?

প্রীতম তুত্‌লে উঠল।

বলল, নো ম্যাম্। বাট হোয়াই?

তুমি কোন্ সাহসে বলো যে, ফিফ্থ-কোম্পানীর নতুন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের ইণ্টারভ্যু আমি নিজে নেব? তোমাদের মতো যোগ্যজনের উপর তো ইণ্টারভ্যু নেওয়ার ভার দেওয়াই আছে। ফাইন্যাল সিলেকশানটাও তোমরা করতে পারবে না?

পারবো, কিন্তু…

কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে। এম বি ইণ্টারন্যাশনালের চেয়ারপার্সনের

আরও অনেক ইমপর্টাণ্ট কাজ আছে। আমিই যদি ইণ্টারভ্যু নেবো তবে তোমাদের রখেবার দরকার কী আমার ? তুমি এক মিনিট আমার ঘরে এসো।

প্রীতম দু মিনিটের মধ্যে এলো ঘরে।

মনীষা বলল, ইণ্টারভ্যু বোর্ডে আমি থাকবো না। কিন্তু ফাইন্যাল সিলেক্‌শানে তিনজনকে সিলেক্ট করে নিয়ে সেপারেটলী জিজ্ঞেস করবে যে, ফিফ্‌থ-কোম্পানী থেকে আমার মাসে দশ লাখ টাকা দু' নম্বর চাই। কী করে বের করবে না করবে দ্যাট ইজ হার হেডএক্‌। তাকে যা আমরা মাইনে এবং পার্কস্‌ দেব প্লাস ক্যাশ প্যাকেট, তাতে আমরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইলেও সে থাকবে এখানে। এদেশের মানুষের গায়ের চামড়া গণ্ডারের মতো হয়ে গেছে। চল্লিশ বছরে যথেষ্টই পুরু হয়ে গেছে তা। যারা চরকা কাটত, খদ্দর পরত, প্লেইন-লিভিং ও হাই থিংকিং-এ বিশ্বাস করত সেই সব আত্মত্যাগী আদর্শবানদের বংশধরেরা সব গণ্ডার হয়ে গেছে। শুনে নাও কান খুলে। ইটস্‌ আ ডীল্‌। প্রত্যেক মাসের তিন তারিখের মধ্যে দশ লাখ টাকা, একশ টাকার নোটে আমি আমার টেবলে চাই। গ্লাডিওলা ফুল-ভরা বাস্কেটের নিচে টাকাটা পাঠাবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে। আমি জানব, তুমি জানবে আর ফিফ্‌থ কোম্পানীর সেই নতুন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জানবে। পুরুষদের ইণ্টারভ্যু নিতে পারো কিন্তু ফাইন্যাল সিলেকশন করতে হবে তিনজন মেয়ের মধ্যে থেকেই। যাও।

প্রীতম চলে যাচ্ছিলো। ওকে ডেকে বলল উ্য নো, এই টাকাও ব্যবসায়েই দরকার। আমি বাড়ি নিয়ে যাব না। অন-মানি। বিভিন্ন পার্টির ফাণ্ডে ডোনেশন দিতে হয়। দিল্লীতে কোনো লাইসেন্স বা পারমিট পেতে গেলেও খরচ করতে হয়। আমরা, বিজনেস পার্সনসরা কোনো রিস্ক্‌ নিতে পারি না। প্রত্যেক ঘোড়াকেই ব্যাক করতে হয়। তো সে পার্টির নেতা যত বড় রাসকেলই হোক না কেন ! মোস্ট স্টুপিড জনগণ, ইমোশানের বশে কখন যে কাকে ভোট দেবে কে জানে ? যাও। উই হ্যাভ নো চয়েস্‌। উই হ্যাভ টু রাইড উইথ দ্যা টাইড।

প্রীতম-এর মতো কোয়ালিফায়েড, ভাল ফ্যামিলির মেয়েকে মনীষা যে এমন করে বলে তাতে মাঝে মাঝে প্রীতম-এর মনে হয় যে, চাকরী ছেড়ে দেয়। এসব দু-নম্বরী তিন-নম্বরী মামলাতে ওর থাকতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু যে টাকা ও পার্কস্‌ এবং যে ক্যাশ-প্যাকেট মনীষার কাছ থেকে ও নিজেও পায় তা দেওয়ার ক্ষমতা বা উপায় টাটা বা ডি. সি. এম. বা ধিরুভাই আম্বানীরও নেই বোধহয়। চেকের টাকায় আজকাল সংসার চলে না। গরীব বড়লোক কারোই। এই ইনফ্লেশানের বাজারে, যার জন্যে এই রাজনৈতিক নেতাদের লোভই দায়ী। প্রীতম্‌-এর চোখের সামনেই সমস্ত দেশটাই অসৎ হয়ে গেল। যারই কোনো উপায় আছে, তার পক্ষেই সৎ থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। কোনো মানুষই চায় না যে, সে খারাপ হয়ে যাক। কিন্তু এই ইনফ্লেশান এবং এই আশ্চর্য রাজনীতিই প্রত্যেক সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী, পেশাদার মানুষদেরও জোর

করে ঠেলে দিয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে। দিল্লীতে গ্রীষ্মকালে যে ধুলোর ঝড় ওঠে, সেই রকম চোখ-জ্বালা-করা আঁধির মধ্যে।

প্রীতম-এর যদিও নিজের সংসার নেই। এখনও বিয়েই করেনি ও। দিল্লীর মহারানীবাগে একটি বাড়ি আছে। বাবারই বানিয়ে যাওয়া। এখন মা একাই থাকেন। সেই বাড়ির একতলা ভাড়া দিলেও কম আয় হয় না। ভারতের রাজধানী দিল্লীর ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। এই গরীব গুরুবোদের দেশের কোনো ব্যাপারের সঙ্গেই এর সাযুজ্য নেই। কিন্তু টাকা বড়ই খারাপ জিনিস। একবার এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সবই গেল। মদ ছাড়া যায়, সিগারেট ছাড়া যায়, টাকার আর ক্ষমতার লোভ কিছুতেই ছাড়া যায় না।

এয়ার-কণ্ডিশানড ফ্ল্যাট, এয়ার-কণ্ডিশানড গাড়ি, বছরে একটা করে হলিডে, এনিহোয়্যার ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড। প্রীতম-এর নিজের কথা ছেড়ে দিলেও তার মা পড়ে গেছেন পুরোপুরি এই ফাঁদে। খরচ বাড়ানো সোজা, কমানো বড় কঠিন। মায়ের মুক্তির সম্ভাবনা নেই। হয়ত ওর নিজেরও নেই। প্রীতম-এর বাবা সাধু-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না তা প্রীতম জানে। সাধু হলে ওই চাকরী করে মহারানী বাগে লনওয়ালা বাড়ি করা যেতো না।

ভাবছিলো প্রীতম, মা আসলে বাবা থাকতেই নষ্ট হয়ে যান। অবশ্য প্রীতম জীবনে ওয়েল-সেটল্ড হয়েছে তাও তার বাবারই জন্যে। বাবাকে ক্রিটিসাইজ করে না তাই। অথবা অন্য ভাবে বললে বলতে হয়; মাই-ই হয়ত বাবাকে নষ্ট করে দেন। আসলে, মেয়েরাই বেশির ভাগ পুরুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে সে স্ত্রী-ই হন কি প্রেমিকা বা রক্ষিতা। তাঁদের স্বামীদের আয় আর তাঁদের চাহিদার মধ্যে কোনোই সাযুজ্য থাকে না প্রায়ই। ঘটনা যাইই হোক এখন মনীষা যদি প্রীতমকে লাথিও মারে মনীষার পায়ের ইটালীতে তৈরী গুচি"র অ্যাঙ্কল-বুট দিয়ে, তাহলেও চাকরী ছাড়ার উপায় তার আর নেই। এ জীবনের মতো ফেঁসে গেছে প্রীতম। বড় বড় বিজনেস টাইকুইন্সরা এমনি করেই টাকা দিয়ে বেঁধে রাখেন তাদের চারধারের মানুষদের। এ বাঁধন দেখা যায় না। কিন্তু অক্টোপাসের বাঁধনের মতোই তা। কিছুদিনের মধ্যেই বিবেক বাঁধা পড়ে।

প্রীতম চলে গেলে রকিং চেয়ারটাতে এসে বসল মনীষা। মনীষা ভালো করেই জানে যে, সে তার অফিসারদের যেমন করে রেখেছে তাতে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের উলঙ্গ হয়ে তার ঘরের কার্পেটে হামাগুড়ি দিতে বললেও তারা তাইই দেবে। স্বাধীনতাত্তোর এই ভারতবর্ষে এখন শক্তির আর ক্ষমতার মূলে উৎস হচ্ছে দুটি। এক, টাকা। দুই, রাজনৈতিক ক্ষমতা। মেধা এখন আর কোনো শক্তিই নয় এদেশে। ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ারের কোনো দাম নেই ফাঁকা—আওয়াজ হয়ে গেছে। কৃষ্টি, সংস্কৃতিরও কোনোই দাম নেই। লোকেরা কদর করলে তবেই সে সবের দাম। সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা কিছুই নির্ভরশীল, এঁদের দয়ায়, যাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এসবের প্রকৃত মূল্যায়ন করার বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও রাখেন না।

কিন্তু মনীষা রাখে।

মনীষা জানে যে তার প্রতিযোগীরা সকলেই মনীষা নয়। এই জন্যে মাঝে মাঝে সে বড় বিমর্ষ বোধ করে। সব ব্যাবসাতেই প্রতিযোগীদের স্তরে নিজেকে নামিয়ে আনতে হয় টিকে থাকতে গেলে। এই নামিয়ে আনার কারণে ক্লান্তিবোধও করে। গভীর ক্লান্তি।

টাকা আর রাজনৈতিক ভ্রূকুটি দিয়ে দেশের প্রায় সমস্ত মেধাবী ও গুণী মানুষদের ইঁদুর বানিয়ে রেখেছে মনীষা এবং তার প্রতিযোগীরা। তাই-ই যে সব মেধাবী মানুষ এখনও মেরুদন্ড টান করে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখতেন তাঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। যাঁরা যেতে পারেননি তারা হয় ছোটখাট সংস্থাতে অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানে আছেন। আর পেনশান চালু রাখার জন্যে কোনো রকমে চাকরী বজায় রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টায় কোনোক্রমে দিনাতিপাত করছেন। মেরুদণ্ড তাঁদেরও নেই। কলমের জোর নেই, সাহস তাঁরা দেখাতে পাবেন না। কোনোরকমে ফাইল সামলে চাকরী জীবন শেষ করে সসম্মানে রিটায়ার করার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকেন। সেখানেও তাঁদের মেধায় মরচে পড়তে সময় লাগে না বেশী। ধার ভোঁতা হয়ে যায়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে বলেই দেশ এখনও থেমে যায়নি।

মনীষা এই ব্যবস্থাতে আদৌ খুশি নয়। কিন্তু ও নিরুপায়। ওর জন্মের আগে থেকেই দেশ যেভাবে চলেছে তাতে ওর নিজের কোনোই চয়েস ছিলো না। স্বাধীনতার বয়স হল প্রায় চল্লিশ। তার বয়স তিরিশ। বাবার ছোট্ট একটি কোম্পানীতে সে এসে যোগ দিয়েছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে। ইকনমিকস্-এ ফারস্ট ক্লাস পেয়েছিল। কলকাতার মডার্ন হাই স্কুলে পড়েছিল। আরও বেশি পড়াশুনা সে করেনি কারণ অল্পবয়সেই শিখেছিলো হাঁসের বাচ্চা যেমন ডিম থেকে বেরিয়েই সাঁতার কাটে, ব্যবসায়ী ছেলেমেয়েকেও তেমনি স্কুল-কলেজের বেড়া ডিঙোনো মাত্রই ব্যবসায়ে ঢুকে পড়তে হয়। ব্যবসাতে হাতে কলমে যা শেখার, বিবেক ঘষে ফেলার নিষ্ঠুরতায় অভ্যস্ত হওয়ার, প্রতিযোগীকে জয় করার অদম্য উদ্যম, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, প্রতিযোগীর লোক ভাগিয়ে আনা, তার কারখানার ইউনিয়ন লীডারকে পয়সা দিয়ে তার কারখানা স্ট্রাইক করিয়ে দেওয়া, এসবই হাতে-কলমে শিখতে হয়। বই পড়ে এসব শেখা যায় না। বইয়ে খুব কম কথাই লেখা থাকে। ভাল ব্যবসাদার হতে পারলে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্বানদেরই নিজের চাকর করে রাখা যায়।

এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে জুতোও পালিশ করানো যায় কারণ মেরুদণ্ডে একেবারেই ঘুণ ধরে গেছে এই জাতের। জুতো-পালিশ করানো যায় এই জন্যেই যে, এক জাহাজ মেধা ও বিদ্যা, সংস্কৃতি আর আত্মাভিমান জড়ো করেও একমুঠো সাহসের সমান হয় না নিক্তি। সবাই বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের। একটু ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, একটা ফ্ল্যাট, একটা গাড়ির জন্যে।

ব্যবসা করতে গেলে সাহস লাগে, আর অন্য সবকিছুর চেয়েও বেশি। আর লাগে, সেন্স অফ টাইমিং, এক ধরনের ষষ্ঠবোধ; যা একজন ব্যবসায়ীকে অন্যদের তুলনায় অনেক আগেই তার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। তার কর্মচারীরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেকেই বড় কিন্তু তার দুঃসাহস আছে। একটার পর একটা ঝুঁকি নিয়ে, এদের প্রত্যেককে মাসের এক তারিখে তাদের প্রাপ্য নিশ্চিতভাবে হাতে তুলে দেওয়ার পরও অর্গানাইজেশনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সকলে পারে না। এই ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, এই দুঃসাহসেরই আরেক নাম এন্টারপ্রেনারশিপ।

মনীষা, তার দেশের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের চেয়েও বেশি ক্লিষ্ট থাকে দেশের মানুষের এই চারিত্রিক অবক্ষয়ের কথা ভেবে। অনেক ফ্লাই-ওভার, ব্রিজ, রাস্তা, পাতাল রেল, হোটেল, স্টেডিয়াম হল দেশে, কিন্তু মানুষেরা সব লিলিপুটিয়ান হয়ে গেছে। মানুষরা অমানুষ হয়ে গেছে। চেহারায় লম্বা চওড়া হলে কী হবে? এরা সব মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারী জীব।

পার্সোনাল ফোনটা বাজল। ডাইরেক্ট লাইন।

মনীষা উঠে গিয়ে ধরল বিরক্তির সঙ্গে।

হাই!

ওপাশ থেকে দীপ বলল।

কী খবর?

নিরুত্তাপ গলায় বলল মনীষা।

কাল কী করছ রাতে?

ভাবছি। এখনও ঠিক করিনি। লী-রক-এর রিভলভিং রেস্তোরাঁতে চাইনীজ খেতে যাব ভাবছি।

ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল।

একা?

আমি তো একাই। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যালোন।

একা থাকতে চাও, তাই-ই একা!

কথা ঘুরিয়ে মনীষা বলল, সুমিত্রার কী খবর?

ভালো।

কথা এড়িয়ে গেল দীপ।

মনীষা ভাবছিল, আশ্চর্য দাম্পত্য-সম্পর্ক ওদের। দীপ আর সুমিত্রার মুহূর্তে হয়ত সুমিত্রাও তার কাফফ-প্যারেডের অফিসের ঘর থেকে সুরেশ ভাটিয়া অথবা বিল্টু সুব্রামনিয়মকে ফোন করছে। স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা নেই আছে। একসঙ্গে কোনো পার্টিতে গেলে হাসি-হাসি করে দুজনে থাকে। অথচ পুরো ব্যাপারটাই জোলো।

দীপ ছেলেটা আসলে একটা ইডিয়ট। ওর ধারণা ও খুব হ্যান্ডসাম। তো ও হ্যান্ডসামও কারো কারো চোখে। কিন্তু মনীষার মনে হয়, টাইয়ের

বা টেরীকটের কাপড়ের অথবা সুইমিং কস্টুমের বিজ্ঞাপনের মডেল হিসে
ওকে মানালেও মানাতে পারে। ও কী করে মনীষার কাছে আসার স্বপ্ন দেখে
মনীষা ভেবেই পায় না। সেই জন্যেই মনে হয় ছেলেটা ইডিয়ট্। মনী
বোস অনেক হয় না; একজনই হয়েছে। যে-পুরুষের কাছে সে হারে
রাজী না থাকে, যার মধ্যে নিজের চেয়েও ভালো বা বেশি কিছু না দেখতে
পায়, সে পুরুষ মনীষার জন্যে নয়। এবং সে কারণেই লক্ষ পুরুষের লোভ
চোখ তার উপর থাকা সত্ত্বেও সে আজ অবধি একজনেরও কাছাকাছি আসে
মনের। এমনকি শরীরেরও। শরীর তো মনের থেকে অনেকই কম দামী
তবুও শারীরিক ভাবেও আসেনি দেশে বিদেশে কারও সঙ্গেই।

তার ফারস্ট কাজিন পবিত্রর বন্ধু জয় একদিন কলকাতার বাড়ির ছাদে
চকিতে চুমু খেয়েছিল তাকে। তখন ও বি. এ. পড়ে। সেন্ট জেভিয়ার্সে
পড়ত জয়। যে কর্মটি জয় করেছিলো তাকে চুমুও বলে না। আচমকা চীনে
পট্কা ফাটারই মতো অতর্কিত, মোস্ট আন রোম্যান্টিক ঘটনা একটা।

কলকাতায় গতবছর একটি চাকরীর জন্যে দেখা করেছিল জয় মনীষার সঙ্গে
পুরুষগুলো সত্যিই আত্মসম্মানজ্ঞানহীন। জয় বিয়েও করেছে। স্ত্রী দক্ষিণ
কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত স্কুলে পড়ায়। এক ছেলে এক মেয়ে। "ফর ওল্ড
টাইমস্ সেক্" বহু বছর আগে কোনো একদিন চীনে-পটকার মতো হঠাৎ
একটি চুমু খেয়েছিল যে, সেই দাবীতেই বোধহয় চাকরী চাইতে এসেছিল।
মনীষার একটি কোম্পানীর কলকাতার ব্রাঞ্চে হাজার তিনেক টাকা মাইনের একটা
চাকরী তৎক্ষণাৎ দিয়েও দিয়েছিল সেলস্-ডিপার্টমেন্টে। প্রকৃত সেলফ্
রেসপেক্ট নেই এদিকে ফালতু সেন্স অফ রেসপেক্ট আছে! বলেছিলো
অনুনয় করে, মাইনেটা যেন স্ত্রীর চেয়ে বেশি হয়, এক টাকা হলেও
বেশি হয়। এই কথা বলে, স্ত্রীর লাস্ট ড্রন স্যালারীর সার্টিফিকেটও
দেখিয়েছিলো।

হাসি পেয়েছিল মনীষার। ভবিষ্যতে মনে হয় বাঙালী মেয়েরাই স্বামীদের
খাইয়ে পরিয়ে রাখবে। বি. এস সিটা অবশ্য পাশ করেছিল জয়। তাও
কম্পার্টমেন্টালে। চেহারাটা অনেকটা সৌমিত্র চ্যাটার্জীর মতোই। বাঙালী
মেয়েরা ওরকম চেহারা বোধহয় খুবই পছন্দ করে। একসময় যেমন উত্তমকুমার
ক্রেইজ ছিল।

একটি জবরদস্তী চুমুর, তাও অন্য পক্ষের জবরদস্তীতে খাওয়া; দাম একটু
বেশিই পড়ে গেল। ওয়েল্। হোক গিয়ে। "ফর ওল্ড টাইমস্ সেক্।"

বাঙালী ছেলেরা কেন যে এত মীনমীনে হয়ে গেল! চোর ডাকাত, ঠগ,
জোচ্চোর পর্যন্তও একটা ভালো বেরোয় না ওদের মধ্যে থেকে। ভেরী স্যাড।
ভেবেছিল মনীষা। আগে বাঙালীরা ভাল কেরানী হতো, চাকুরে, মেধাবী
অধ্যাপক, ফরেন সার্ভিস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, রেভিনু্য সার্ভিসের
অফিসার! আজকাল তাও হয় না! কোথায় যে তলিয়ে যাচ্ছে জাতটা!
ভাবলেও কষ্ট লাগে। অথচ সেই জাতের নিজেদের এই অধঃপতন নিয়ে ভাবনা

মাথাব্যথাই নেই। এখনও সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, হামবড়াই, "আমিও কিছু কম নই'। ভাবলে হাসি পায়!

ওপাশ থেকে দীপ কী যেন বলছিল। ন্যাগিং চ্যাপ্। আ পেইন ইন দ্যা নেক্। বাঁ হাত দিয়ে টেলিফোনের বোতামটা টিপে নিজেই রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

সুমিত্রা মনীষার সঙ্গে মডার্ন হাই স্কুলে পড়ত। বম্বেতেই সেটল্ করেছিলেন ওর বাবা। সুমিত্রার স্বামী হিসেবেই দীপের সঙ্গে প্রথম আলাপ। এই জন্যেই সুমিত্রাকে মনীষা ওর ডাইরেক্ট আনলিস্টেড টেলিফোন নাম্বারটা দিয়েছিলো। দীপকে যে কেন বিয়ে করল ও ভেবে পায়নি মনীষা। ওকে কী করে একেবারে ফেলে দেবে তাও বুঝতে পারে না মনীষা। সুমিত্রা সত্যিই ওর বান্ধবী। অনেকই মিল আছে দুজনের। তবে ইদানীং চারিত্রিক দিক দিয়ে একটু অন্য রকম হয়ে গেছে। হয়তো স্বামীর কাছ থেকে যা পায় না তা অন্যের কাছ থেকে নিয়ে পুষিয়ে নিতে চায় নিজের শূন্যতা।

দীপের বাবার অনেক সম্পত্তি ছিল কলকাতায়। এলাহাবাদে এবং দিল্লীতেও। বেচারাম বাবু! একটা করে সম্পত্তি বেচে আর মৌজ করে দীপু দুনম্বরের টাকায়। চাকরী যেটা করে, সেটা লোক দেখানো। হাজার খানেকও মাইনে পায় কী না সন্দেহ। ছেলেটার কোনো সেনস্ অফ প্রোপোরশানই নেই। নইলে, মনীষার দিকে হাত বাড়ায়? সিলী! সেনস্ অফ প্রোপোরশান অবশ্য খুব কম পুরুষের মধ্যেই দেখেছে ও। পুরুষদের অপমান করে, ছোট করে, চাকরী খেয়ে, ব্যবসা ডুবিয়ে খুবই আনন্দ পায় মনীষা। অনেক বছরের অত্যাচারের শোধ তোলে ও একা হাতে। যতটুকু পারে। মনীষাও হেরে যেতে পারে যার কাছে তেমন পুরুষের দেখা মেলেনি আজ অবধি। হয়তো বাকি জীবনেও মিলবে না। ওর ব্যবসাকেই ওর স্বামী করে নিতে হবে।

ইন্টারকম্ তুলে নিয়ে আবার ডাকল স্যামিকে।

ইয়েস্ ম্যাম্।

মিঃ সরকারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দিয়েছ?

নো ম্যাম্' তাকে পাচ্ছিই না।

পাচ্ছি না মানে কী? কনটাক্ট হিজ সেক্রেটারী অ্যান্ড লীভ দ্যা মেসেজ।

তাও কি আর করিনি। সঙ্গে সঙ্গেই করেছি। কিন্তু···

কিন্তু কী? এতে আবার কিন্তু কীসের?

সেক্রেটারী বলছে যে তিনি গলফ্ খেলতে গেছেন।

হোয়াট? মিঃ সরকার মাস্ট বী অ্যান্ একসট্রা-অর্ডিনারী গুড ম্যানেজার। ইটস্ অ্যাডমিরিবেল দো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি ও'র সেক্রেটারী ক্যান্সেল করে দিয়েছে? তা নইলে কীরকম দায়িত্ববান মানুষ তিনি? এদিকে বলছো 'বগ শট!

নো; ম্যান্ নট্ এট্ এল্। সে বলল, আমার বস্ অ্যাপয়েন্টমেন্টের

কথা জানেন। আই অ্যাম শ্যুওর দ্যাট হী উইল বী দেয়ার ইন টাইম্। ইফ হী কানট্ গো, হীজ ডেডবডি উইল গো। আই কানট্ রীচ্ হিম ন্যাউ। ইটস্ ট্যু লেট! সরী।

হোয়াট?

মনীষা বলল। হীজ ডেডবডি উইল কাম্?

ইয়েস ম্যাম্। মিঃ সরকারের সেক্রেটারী তো তাইই বললেন। মিঃ সরকার নাকি তাই-ই বলেন সকলকে। এ পর্যন্ত জ্যান্ত অবস্থাতেই যদিও গেছেন সব জায়গায়।

বলেই, হাসল একটু।

মনীষা বিরক্ত গলায় বলল, এটা কি হাসির ব্যাপার হলো? তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? ও'র সেক্রেটারী গল্ফ্ ক্লাবেও ফোন করে ক্যানসেল করতে পারলেন না? তাঁকে ধরার দায়িত্ব কি আমার?

চেষ্টা করেছিলেন তাও। গল্ফ ক্লাবের অফিস থেকে নাকি বলেছে, হী মাস্ট বী ইন অর অ্যারাউণ্ড দ্যা নাইনথ্-হোল ন্যাউ। হী রিফিউজেজ টু কাম টু রিসিভ হিজ কল্। ইন ফ্যাক্ট হী হেইটস টু বী ডিসটার্বড্ ইন হিজ গেম্। দ্যাটস্ হীজ স্ট্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন্।

সিলী ওল্ড ফুল। বুড়ো বয়সে এই রোদে গল্ফ্ খেলে মারা যাবে। পাগল নাকি? বয়স কত মিঃ সরকারের? এনী আইডিয়া স্যুসি? ওভার সেভেণ্টি?

জানি না তা ম্যাম্। হবে কম করে ষাট-টাট তো হবেই। এত বড়ো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল - এম্পায়ার গড়ে তুলেছেন যখন।

মনীষা হাসল।

বলল, তোমার থীওরী ঠিক হলে তো আমার বয়স পঁচাত্তর হওয়া উচিত ছিল।

স্যুসি বলল, উ্যু আর অ্যান একসেপশান্ ম্যাম্। দেয়ারস ওন্লী ওয়ান মনীষা বোস ইন ইণ্ডিয়া।

স্টপ ইট্ স্যুসি। আই নো হোয়াট আই অ্যাম্।

ফোনটা নামিয়ে রেখে মনীষা ভাবছিল, মোসাহেবী, ফ্ল্যাটারী জিনিষটা এমনই যে, যে-কেউই করুক; তা পছন্দ হয় না। আবার কেউ তেমন করে করলে খুব ভালোও লাগে। যদি কেউ তেমন করে করতে জানে! যে-কোনো জিনিষই একটা আর্ট। আর্টের লেভেলে জীবনকে তুলতে পারে কজন? এই রকম "কাঁচা গ্যাস", তাও নিজের কর্মচারীদের কাছ থেকে; খেতে ভাল লাগে না।

মনীষার খাস বেয়ারা বাদেকার এসে টেলেক্স ম্যাসেজের ট্রে আর চিঠিগুলো দিয়ে গেল। এই সব টেলেক্স রেসপেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট এবং কোম্পানীর নাম্বার ওয়ানরা দেখেছেন। শুধু যেগুলো মনীষার দেখা একান্তই দরকার সেগুলোই পাঠিয়েছেন ও'রা। যে এক্সিকিউটিভ তাকে বেশি বদার করেন, বেশিবার

সাহায্য চান, বেশি প্রবলেম নিয়ে আসেন, তাঁর সি. সি. আর. এ "ইনকমপিটেণ্ট" লেখে মনীষা। তবে এই অতীশ সরকার বুড়োটার কাছে একটা জিনিষ নিশ্চয়ই শেখার আছে। ম্যানেজমেণ্ট। এত বড় গ্রুপের নাম্বার ওয়ান হয়ে যে মানুষ বেলা পৌনে বারোটা অবধি গল্ফ খেলার সময় পায়, সে মানুষটা সময়কে কব্জা নিশ্চয়ই করতে পেরেছে। মনে মনে একটু ভয়ও করতে লাগল ওর। এমন কেয়ার-ফ্রী অ্যাডভার্সারীকে ও জীবনে ফেস্ করেনি। ভয় হতে লাগলো এ কথা ভেবে যে, হেরে যাবে না তো? সরকার নিশ্চয়ই ধূর্তচূড়ামণি। এমন সেল্ফ-কনফিডেণ্ট নাম্বার-ওয়ান বিদেশেও কমই দেখেছে। গল্ফ খেলছে! তাও, শনিবার বা রবিবার নয়। সপ্তাহের মধ্যে উইকডেইজ এ। গল্ফ খেলছে। ফানী! ভেরী ফানী ইনডিড!

টেলেক্স মেসেজগুলো দেখে, ড্রয়ার থেকে লাল নীল হলুদ সবুজ ছোট ছোট প্যাড বের করে যে ডিপার্টমেণ্টাল হেডকে যা ইনস্ট্রাকশান দেবার দিয়ে ষ্টেটা করেৎ পাঠিয়ে দিল ও বাদকারের হাতে স্ল্যাসিয় কাছে। সুসিই এবার যা করার তা করবে।

ঘড়িতে দেখল পৌনে বারোটা। কেমন যেন নার্ভাস লাগতে লাগল মনীষার। এমন কখনও হয় না। হয়নি আগে। যে-মানুষ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করলে তার ডেড-বডিও অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে আসে তাকে মীট করার আগে একটু উত্তেজনা হওয়ারই কথা! তার উপর সে নাকি বোয়াল মাছ। মনীষার কফি প্ল্যানটেশানের, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস ইণ্ডাষ্ট্রিজের ইণ্টারেস্ট সবই গিলে খাবার মতলব আছে না কি মানুষটার। এমন বাঙালী ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টও দেশে যে আছে তা জানা ছিলো না ওর। সরকার পদবী কি বাঙালী ছাড়া অন্য রাজ্যের লোকেরও হয়? কে জানে?

বাথরুমে গেল মনীষা। হালকা পিংক মার্বেল মোড়া বাথরুম। পিংক বিদে। পিংক বেসিন। ইনসেট করা বাথ-টাব। কমোড। দেওয়ালে হোয়াট-নট। পাশে হালকা-নীল ড্রেসিং রুম। কয়েকপ্রস্থ জামাকাপড়, প্যাণ্টি বা। ড্রেসিংটেবলের সামনে কস্মেটিকস। মেয়েদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ।

জানালা দিয়ে একবার সমুদ্রের দিকে তাকাল। দুপুরের সমুদ্রে নিশ্চয়ই এখন নোনা গন্ধ। এয়ার কণ্ডিশানড্ বাথরুম থেকে গন্ধ পাওয়া যায় না। শব্দও নয়। গন্ধ-শব্দ-হীন দৃশ্য শুধু। সী-গাল ওড়াওড়ি করছে। জলের উপরে। জলের মধ্যে রোদের ভাপ। এয়ার কণ্ডিশানড্ ঘরে বসে বাইরের অসহ্য রোদকে দেখতে ভালো লাগে। হাওয়াতে সমুদ্রের উপর ছোট ছোট ঢেউ উঠছে।

আয়নাতে তাকাল একবার মনীষা। ওকে ফিল্ম স্টারের মতো সুন্দরী কেউই বলবে না। কিন্তু যাদের সৌন্দর্য চেনার চোখ আছে তারা একনজরেই চিনবে তাকে। লম্বাটে মুখ। লালচে-ফর্সা। চুল টান টান হয়ে পড়ে আছে পিঠে। নেমে গেছে হাঁটু অবধি। চোখে স্টীল ফ্রেমের চশমা। গোল। হংকং থেকে নিয়ে এসেছিল গতবার। গালে দুটি কালো আর তিনটি লাল

তিল। ওকে দেখলে হার্ভার্ড কি কেমব্রিজের ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ানো আপন ভোলা, ইংরিজী কী ফিলসফীর ছাত্রী বলে মনে হলেও হতে পারে কিন্তু এতবড় বিজনেস ম্যাগনেট বলে মনে হওয়ার কোনোই উপায় নেই।

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। ড্রেসিংরুম থেকে ফোনটা তুলে মনীষা বলল স্যাসিকে, মিঃ সরকার নিশ্চয়ই দেরী করবেন। এলে, তোমার গেস্ট রুমে বসিয়ে কফি খাইও। তারপর আমার ঘরে এনো। আই অ্যাম ফীলিং আ লিটল ডিজি।

স্যাসি উদ্বিগ্ন গলায় বললো, ডকটর ওয়াংখেড়েকে কি ডাকব ম্যাম্? ডিস-পিরিন পাঠিয়ে দেব? আছে আমার কাছে।

না, না। কিছু দরকার নেই।

মনীষা আবার আয়নাতে তাকালো। তার সুন্দর চোখ দুটি, আনত; দীঘল বড়-বড় আই ল্যাশ্। মাঝে মাঝে নিজের চোখ দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায় মনীষা। ওর তিরিশ বছরের নারী শরীরের মধ্যে বিজনেস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুন হওয়া সত্বেও যে, একজন নারী বাস করে, যে বড় নরম আসলে; অথচ বাইরের কাঠিন্যের মুখোশ যার সত্তার অন্তরতমে কেটে বসে গেছে সেই মেয়েটির মুখই আয়নাতে ভেসে এল হঠাৎ। মুখোসটাই জীবন হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। আর কিছুদিন এমনি চললে মুখটি বোধহয় হারিয়েই যাবে। ইউনাইটেড স্টেটস-এর সেনেটর কোহেনের একটি উক্তি মনে পড়ে গেলো ওর। "হোয়েন উ্যা স্টেপ ইনটু দ্য ওয়ার্লড অফ মিররস্, ইট ইজ ভেরী হার্ড টু ডিটারমাইন্ রিয়ালিটি ফ্রম রিফ্লেকশান্।"

চোখ বন্ধ করে ফেলল মনীষা। তারপর তাড়াতাড়ি জিনস্ ও জ্যাকেট খুলে ফেলে সিল্কের শায়া বের করে ভোপালের মৃগনয়নী থেকে কিনে আনা হস্সা সিল্কের মেরুন আর কালো স্ট্রাইপের শাড়ি পরল একটা। পনি-টেইল খুলে চুলটা ছড়িয়ে দিলো পিঠময়। ম্যাচ্ করা ব্লাউজ পরল। নাভিতে, বগলতলিতে এবং শরীরের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্যানেল্ নাম্বার ফাইভ স্প্রে করে দিল একটু। মুখে হালকা করে পাউডার বুলোলো। আইব্রো পেন্সিল দিয়ে ভ্রু ঠিক করল। ঠোঁটে হালকা-মেরুন লিপ্স্টিক্ বুলোলো ক্রীশ্চিয়ান-ডায়রের। চোখে, লক্ষ্ণৌ থেকে আনানো সুর্মা। তারপর আয়না যখন বলল, যে ভাল দেখাচ্ছে, মেয়েলী দেখাচ্ছে: তখন নিজের ঘরে ফিরে চেয়ারে বসল।

কেন জানে না এই অদেখা রাঘব-বোয়াল বুড়োটা ওকে বড় আন-নার্ভড করে দিয়েছে। মনটা বড়ই উচাটন হয়েছে। এমন হয় না কখনও। এরকম ডেয়ার-ডেভিল কেয়ার ফ্রী প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করেনি সে।

ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে দুই। ইলেকট্রনিক ঘড়ির কাঁটা যখন ঠিক বারোটাতে তক্ষুনি ইন্টারকম তুলে স্যাসিকে ডাকল।

ওপাশ থেকে স্যাসি বলল, হী ইজ অলরেডী হিয়ার ম্যাম্। জাস্ট ওয়াকিং ইনটু মাই রুম। শ্যাল আই লেট হিম ইন্? অর শ্যাল আই কীপ হিম ওয়েটিং ইন মাই রুম?

না, না। তোমার ওখানে বসাবার দরকার নেই। আমি রেডি হয়ে গেছি। তুমি নিজেই নিয়ে এসো।

বলেই, বলল, না না, তোমার আসার দরকার নেই। বেশি ইম্পর্ট্যান্স দেওয়া হবে। বাদেকরকে দিয়েই পাঠাও।

পাছে স্যুসি তার বেশ-পরিবর্তন দেখে কিছু ভাবে, তাইই…।

মেয়েরা বড় ছোট-মনের ও সন্দিগ্ধ হয়। নিজে মেয়ে বলেই একথা হাড়ে-হাড়েই জানে ও।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার আগে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, হাউ ওল্ড ইজ দ্যা ওল্ড হ্যাগ্‌? দ্যাট গাই? স্যুসি?

স্যুসি ইন্টারকম্‌-এই যেন গলে গেল আইসক্রীমের মতো। বলল, ওঃ ম্যাম্‌। হী ইজ আ রিয়্যাল গাই! হী হার্ডলী উড বী থার্টি। সো ইয়াং। বিয়ারস্‌ আ গোটি বেয়ার্ড। আ রিয়্যাল গ্রুভী গাই! অ্যান্ড নাউ হী গোজ। হী ইজ টেররিফিক্‌।

এই প্রথম মনীষার তার অর্গানাইজেশানের টপ-লেভেলে সবই মেয়ে এবং অনেক অবিবাহিত মেয়ে রাখাটাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে হলো।

বাদেকর দরজায় দু'বার টোকা মারতেই মনীষা নিজে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বলল, ওঃ কাম অন্‌ ইন্‌ মিঃ সরকার। প্লীজ বী সীটেড্‌।

মিঃ অতীশ সরকার হাত বাড়িয়ে নিচু হয়ে বো করে মনীষার হাতটা নিল। মনীষা! কী বিপদেই যে পড়ল! কেন যে স্যুসি আপয়েন্টমেন্টটা করেছিলো কে জানে? মনীষার হতে হাতে নিয়ে আলতো করে চুমু খেলেন। বললেন, ইটস্‌ সো নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য।

প্লেজার ইজ মাইন্‌।

মনীষা বললো।

কেন জানে না, মিঃ সরকারের মুখে ও পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারলো না। মানুষটার চোখের দৃষ্টিটা এমন, যেন মনে হয় মনের গভীরতম প্রদেশে সে চাউনি পেঁছে যায়। তার কাছ থেকে কোনো গোপন তথ্য এমনকি নিজেকেও আড়াল করে রাখা কঠিন।

মনিষা বলল। হোয়াট উড উ্য লাইক টু হ্যাভ মিঃ সরকার? উ্য ওয়ার প্লেয়িং গলফ্‌ ইন দ্যা সান আই অ্যাম টোল্ড। উ্য মাস্ট বী ভেরী থার্স্টি। আরনট্‌ উ্য?

উত্তরে মিঃ অতীশ সরকার পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনি কি বাঙালী? আমি ভেবেছিলাম আপনি সাউথ ইন্ডিয়ান হবেন। ভাসু। অনেক তামিলই কিন্তু বাসু লেখেন। ভেরী স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। এত কম-বয়সী একজন বাঙালী মেয়েই যে এম. বি. ইনটারন্যাশনালের কর্ণধার ভাবতে পারিনি। মাই হার্টিয়েস্ট কংগ্র্যাচুলেশানস্‌!

হ্যাঁ। কী করে বুঝলেন যে আমি বাঙালী? দেখেই?

মনীষা চোখ নামিয়ে বলল।

হ্যাঁ। চেহারা দেখেই। বাঙালী মেয়ের সৌন্দর্য কি অন্য কাউকে মানায়, না অন্য কেউ পেতে পারে? এমন সুন্দরী বাঙালী মেয়ে আমি কিন্তু দেখিনি।

বলেই, মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন, আই মীন এভরী ওয়ার্ড অফ ইট। চুল, চোখ, আইল্যাশ, হাঁটার ধরন, মানে ··

ওয়েল, এনাফ ইজ এনাফ্। এবার থামুন। উ্য আর হিয়ার টু ডিসকাস্ বিজনেস্। আরনট্ উই?

মনে মনে কিন্তু রাঙিয়ে গেল মনীষা। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে ঘামতে লাগল। সাংঘাতিক লোক এ। মনীষার ব্যবসা আর ইণ্ডাস্ট্রী যদি কেউ ডোবায় তো এই লোকটিই একমাত্র পারে ডোবাতে। এই বোয়াল মাছেই খাবে তাকে। ডেঞ্জারাস্।

মনীষা নিজেকে বলল, সাবধান মনীষা। সাবধান। ডোণ্ট বী ক্যারেড এওয়ে বাই হিজ চার্ম। হী হ্যাজ মেনী ম্যা থিংগস্ আণ্ডার হীজ স্লীভস্। বাঙালীকেই তার সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস। বাঙালী হচ্ছে সাউথ অ্যামেরিকার নদীর "পিরানহা" মাছেরই জাত। তারা নিজেরাই নিজেদের খেয়ে বেঁচে থাকে। কাঁকড়ার জাত। একজন উপরে উঠলে অন্যরা তার পা কামড়ে টেনে নামায় নিচে। বাঙালীর ইকুয়্যালাইজেশান্ পলিসী বড় বিচিত্র।

আপনি লাঞ্চ কোথায় খান? কাজের কোনো কথাতেই না গিয়ে হঠাৎই প্রশ্ন করলেন মিঃ সরকার মনীষাকে এলোমেলো করে দিয়ে।

কোনো ঠিক নেই। কখনও ক্লাবে যাই, কখনও তাজ-এ। বা ওবেরয় টাওয়ার্স-এ। এখানেও আনিয়ে নিই কখনও কখনও। লাঞ্চ ইজ নট ইম্পর্ট্যাণ্ট অন আ ওয়্যার্কিং ডে।

আমার একটা কাম্পারী খেতে ইচ্ছে করছে খুবই। উইথ সোডা এণ্ড প্লেণ্টী অফ আইস্। প্লেণ্টী। চলুন, লেটস্ গো আউট ফর লাঞ্চ। ওখানেই বিজনেস্ ডিসকাস করে নেব। ফর আ চেঞ্জ। শত্রুরা একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে খেতে তাদের বিজনেস ডিসকাস করে তো!

আপনাকে আমি শত্রু মনে করি কে বললো, আপনাকে?

মিত্রও যে মনে করেন না তা আমি জানি।

তারপরই বললো কোথায় পাবেন কাম্পারী? আজ তো ড্রাইডে বম্বেতে।

আমার ঘরে যাব। আমি তাজ্ এই উঠি। বরাবর। ওল্ড উইং-এ। ঘরে তো দেবেই রুম সার্ভিসে ফোন করলে! আপনার কি আপত্তি আছে আমার হোটেলের ঘরে যেতে।

মনীষার মস্তিষ্ক বলল, সাংঘাতিক ডিজাইনিং চ্যাপ। তাকে ধনে-প্রাণে মারবে এই লোক। রাজী হয়ো না কিছুতেই। অপরিচিত মানুষ হয়ে একজন অল্পবয়সী মহিলাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবের মধ্যেই প্ল্যান আছে। অথচ প্রস্তাবটিকে অশালীন বলে মনে হলো না।

মুখে বলল, হোটেলে না গেলেই কি নয়? কাম্পারী খেতেই হবে আপনার?

আমার অফিসের সেলারে জিন ছিল কিন্তু। ভোদকা ছিল, স্কচ্ ছিল অনেক রকম। রয়্যাল স্যাল্যুটও।

থ্যাঙ্ক উ্য। কাম্পারীই খেতে হবে। আমার যখন যা ইচ্ছে করে আমার তক্ষুণিই চাই। এখনই। রমাপদ চৌধুরীর একটি উপন্যাস আছে না এই নামে। আমাদের জেনারেশানের মানসিকতা উনি নিভুর্ল ভাবে ধরতে পেরেছিলেন। আমরা হচ্ছি 'রাইট ন্যাউ'-এ বিশ্বাসী প্রজন্মের মানুষ। কী বলেন আপনি? সাবস্টিট্যুটে আমি বিশ্বাস করি না। কোনো সেকেন্ড বেস্ট এর সঙ্গে আমার কমপ্রোমাইজ্ নেই। না ব্যবসায়ে; না জীবনে।

মিঃ সরকার…

বাঘিনীর মত প্রতাপশালিনী মনীষা গলা খাঁকরে অবশেষে খ্যাকশিয়ালীর মতো গলায় কী যেন বলতে গেলো।

মিঃ সরকার নয়। অতীশ। আমিও আপনাকে মনীষা বলেই ডাকব। আমার মনে হয় আমরা কনটেমপোরারী। আপনি কোন বছরের স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট? কোথা থেকে?

নাইনটিন সেভেনটি টু। কলকাতায়। মডার্ন হাই। স্কুল লিভিং নয়। হায়ার সেকেন্ডারী।

আমি সেভেনটি। সেন্ট-জেভিয়ার্স স্কুল থেকে। মডার্ন হাই যখন, তখন স্মিতাকে চিনতেন? ও ও সেভেনটি টুর ব্যাচ।

স্মিতা? চ্যাটার্জী?

দ্যাটস্ রাইট্। ও আমার ফারস্ট-কাজিন্। আমার পিসী ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন বামুনের ছেলেকে। চ্যাটার্জী। ইন্ ফ্যাক্ট আমাদের ফ্যামিলীতে সকলেরই লাভ-ম্যারেজ।

আপনার?

কথাটা জিজ্ঞেস করবে না ভেবেও করে ফেলল মনীষা। হেয়ার ট্রিগারে আঙুল লাগা গুলির মতোই বেরিয়ে গেলো প্রশ্নটা। আর ফেরানো যাবে না। লজ্জায় মরে গেলো প্রশ্নটা করেই। মোস্ট ইর্রেলিভেন্ট প্রশ্ন।

অতীশ একটু চুপ করে থাকলো। তাকিয়ে রইলো মনীষার চোখের দিকে অনেকক্ষণ। তারপর বলল, বিয়ে করার সময় এখনও পাইনি। তবে, আমার ইচ্ছে, সম্বন্ধ করেই বিয়ে করব। বেশ নতুন-নতুন গন্ধ থাকবে বউ এর গায়ে। টক টক; মিষ্টি-মিষ্টি। কে জানে কেমন?

মনীষা হেসে ফেলল। মিঃ সরকারের ছেলেমানুষী কথার ধরনে।

কথাবার্তা শুনে মনে হয় মানুষটা একেবারেই ছেলেমানুষ। এতবড় ব্যবসা করে, কে বলবে তা! এমন করে সদ্য-পরিচিতা মহিলা অ্যাডভারসারীর সঙ্গে কথা বলে কেউ? একেবারে আনকনভেনশনাল, আনপ্রেডিকটেবল্ মানুষ।

চলুন, তাহলে আর দেরী কেন? খিদেও পেয়ে গেছে।

আপনি কী ডিস্কাস্ করবেন? আমার কোনো সেক্রেটারীকে কি সঙ্গে নেব?

মনীষা বললো।

নট্ অ্যাট্ ওল। উই উইল বী এবল্ টু টেক কেয়ার অফ আওয়ারসেলভ্স্।

প্রাইভেট-লিফট দিয়ে নেমে পথে আসতেই মনীষার শোফার তার আকাশী-নীল বি. এম. ডাব্লু. গাড়িটি নিয়ে এল।

আঃ। আ লাভ্লী কার। কনভার্টিবল্ কি? হুড খোলা যায়?

হ্যাঁ। সুইচ টিপলেই! মনীষা বলল।

ওকে, যদি আমাদের বিজনেস-মীটিংটা ঝগড়া না হয়ে যায় তবে একদিন মুনলাইট ড্রাইভে যাব আপনার সঙ্গে এই গাড়িতে।

ওরা কথা বলতে বলতেই অতীশ সরকারের সাদা মার্সিডিস চালিয়ে নিয়ে এলো পার্কিংলট থেকে তার গোর্খা ড্রাইভার।

বাঃ। মনীষা বলল। আমারও একটা আছে। তবে ফিকে-হলুদ রঙের। থাকবেই। আফটার অল, মনীষা বাসু ইজ দ্যা চেয়ারপার্সন্ অফ এম. বি. ইনক্।

বলেই, বলল, আপনি আমার গাড়িতেই আসুন। আমার ড্রাইভারকে আপনার ড্রাইভার নিয়ে আসুক তাজ্-এ। ব্যাটা বি. এম. ডাব্লুতে চড়েনি কোনোদিন। মনীষা বসুর দৌলতে চড়ে নিক একটু।

মনীষা হাসল।

বলল, আহা! মার্সিডিস যেন ফ্যাল্না গাড়ি।

মনীষা বসু যে গাড়িতে চড়ে তার তুলনায় সবই ফ্যালনা, খেলনা। মনীষার মধ্যে ভীষণ খুশির, ভীষণ ভয়ের, গা ছমছম একধরনের অনুভূতি হতে লাগল। এই মানুষটা সাংঘাতিক। ব্যবসা সংক্রান্ত ফেভারের কথা তো ছেড়েই দিলো, ব্যক্তিগত কিছু চেয়ে বসলেও ও হয়তো 'না' বলতে পারবে না। কিছু কিছু পুরুষ থাকে, মেয়েদের পক্ষে যাকে 'না' বলা ভারী মুশকিল। এদেরই বোধহয় "ইরেজিস্টিবল্" বলে।

খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলো অতীশ। পাশে বসে ভাবছিলো ও। বেশ গান বেজে উঠলো : ডিড আই সে আই লাভ ইউ? ডিড আই স্যে আই কেয়ার?

রাইট! মাই ক্রেজ!

অতীশ বললো।

সো ইজ মাইন। মনীষা বললো।

কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়? আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাবো আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাবো? ভালো লাগে না?

নিশ্চয়ই!

অজয় চক্রবর্তী? "তোমারি গাহি জয়"? রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "প্রণয় কুসুম বনে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ রয়েছে সজনী।"

ঈসস্ আপনার সঙ্গে আমার রুচির খুবই মিল দেখছি।

মনীষা উচ্ছল, হয়ে বললো।

ওকে নিভিয়ে দিয়ে অতীশ বলল, দ্যাটস ইমম্যাটেরিয়াল, ব্যবসার পলিসীতে মিল থাকাটাই বড় কথা।

বলেই, ক্যাসেট-প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিল।

মনীষা একবার দেখল অতীশের দিকে। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। আর পাত্তা দেবে না লোকটাকে। নিজেকে বেশি-বেশি চালাক মনে করে। ওভার-স্মার্ট একটা।

তাজ-এর লাউঞ্জের সামনে পৌঁছতেই উর্দিপরা শিখ গেটম্যান ওকে বিরাট সেলাম ঠুকলো। চাবি গাড়িতে লাগিয়েই নেমে গেলো অতীশ। তারপর ডানদিকে ঘুরে গিয়ে লেফট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ মার্সিডিজ-এর দরজা খুলে নামালো মনীষাকে। তারপর মনীষাকে এসকর্ট করে নিয়ে গিয়ে রিসেপসানে চাবি চাইলো।

ওল্ড উইং-এর লিফ্ট অবধি হেঁটে গিয়ে লিফ্টের বোতাম টিপলো। সুইমিং পুল-এর দিক থেকে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে ফেডেড জীন্স ও হালকা বেগুনী টি-শার্ট পরে প্রায় দৌড়ে এসে অতীশকে বললো, হাই! ডার্লিং!

হাই! হাউ ইজ লাইফ রিতা? মীট মনীষা বাসু।

রিতা বললো, হাই। মনীষাকে।

তারপরই বললো, হাই আর উা প্লেসড্ দিস ইভনিং অতীশ?

বাইরে বৃষ্টি নেমেছিল। সেদিকে দেখিয়ে, অতীশ পাঞ্জাবীতে বললো কিন্না আচ্ছা মওসুম্ হেগা। আই প্রেফার টু বী টোটালি ডিসপ্লেসড্ দিস ইভনিং।"

বলেই বললো, ওয়াক'! ওয়াক'! অ্যাণ্ড ওয়াক'। নো রেস্পাইট রিতা।

ওকে!

বলে একটু অপমানিত মুখে রিতা রিসেপশানের দিকে হেঁটে গেলো।

অতীশ বললো, ইচ্ছে করেই আপনার পরিচয় দিলাম না। আরও জেলাস হতো। দিল্লীর গল্ফ-ক্লাবে আলাপ। ওরা শিখ। খুশয়ন্ত সিংদের সঙ্গে কীরকম আত্মীয়তাও আছে। প্রপার্টি-ওনার্স, বিজনেস-টাইকুন।

লিফ্ট-এ উঠতে উঠতে বললো, দিল্লী গল্ফ ক্লাবে ভড্কা-বেসড্ হোয়াইট-লেডি খেয়েছেন কখনও? দারুণ করে।

নাঃ। মনীষা বললো।

তারপর বললো, শীতকালে গেলে কখনও কখনও ওখানে রোদে বসে লাঞ্চ খাই।

ফাইন। নেক্সট টাইম আই উইল বী উইথ উা।

মনীষা কিছু বললো না।

ওর হাঁটু কাঁপছিলো। ভালোলাগা কাকে বলে ও জানতো। 'ফলিং ইন

লাভ হেড ওভার হীলস্'' কথাটা শিশুকাল থেকেই শুনে এসেছে। কিন্তু ভেবেছিলো, ওটা কথারই কথা। অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের অ্যালিস্‌দের জীবনেই কখনও অমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারতো। রোমিও-জুলিয়েট পড়েছিলো। লায়লা-মজনুর গল্প শুনেছিলো। ইম্ফলে একটি প্রোপোজ্‌ড ইণ্ডাস্ট্রীর প্রোজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে স্টাডি করতে যখন মণিপুরে গেছিলো তখন খেম্বা-খাম্বার প্রেমের গল্পর কথাও শুনেছিলো কিন্তু তার জীবনে, কোনো শিক্ষিতা, আধুনিক, প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মেয়ের জীবনেও এমন দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে তা আজ বেলা পৌনে বারোটার সময়ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী ছিলো না। কিন্তু এখন .

অতীশ বললো, কী ভাবছেন ?

নাঃ।

কিছুতো ভাবছেন। মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্ক একমাত্র যোগাসন, গল্ফ, টেনিস অথবা স্কোয়াশ খেলার সময়ই শুধু অন্য ভাবনা মুক্ত থাকে। নইলে না-ভেবে তার উপায়ই নেই। কিছু একটা ভাবছেন নিশ্চয়ই।

মনীষার অসহায় লাগতে লাগল। কান্না পেয়ে গেলো ওর। মা-বাবার কথা মনে পড়ে গেলো। তাঁরা থাকলে দৌড়ে গিয়ে বলতো, বাঁচাও আমাকে তোমরা, এই সুন্দর ইরেজিস্টেবল্ পুরুষ মানুষটার হাত থেকে।

সো ! হিয়ার উই আর !

বলেই, লিফট থেকে নেমে মনীষাকে এস্কর্ট করে নিয়ে বাঁদিকের করিডরে পড়েই ডানদিকের সবচেয়ে বড় স্যুইটের দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো।

হাউ বাউট ইউ ! মে আই ফিক্স ইউ আ ড্রিঙ্ক ?

ব্লাডী মেরী। প্লীজ ! জাস্ট ওয়ান্।

ঘোরের মধ্যে বললো, মনীষা।

তা কি হয় ? একটা খেলে গৃহস্থর অকল্যাণ হবে। সে রসগোল্লাই হোক কী ব্লাডি-মেরী।

বসুন ! একী ! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

স্যুইটের সীটিং রুমের সোফায় ধপাস্ করে বসে পড়লো মনীষা। এতো আনস্মার্ট লাগেনি নিজেকে কখনওই।

অতীশ ঘরের ফ্রিজ খুলে দেখলো। নিজের মনে বললো, টোম্যাটো—জ্যুস ? ইয়েস ! ভড্‌কা ? ইয়েস ! লেমন স্লাইসেস ? ইয়েস !

তারপরেই বললো, নাঃ। রুম সার্ভিসেই বলে দি। ভালো করে বানিয়ে দেবে ওরা। একসঙ্গে দুটো লার্জ বলেদি ? নইলে আমাদের ডিস্কাসন্-এর সময় আবার উঠে অর্ডার করতে হবে।

মনীষা কিছু বলতে পারলো না।

উঠে বললো, মে আই ইউজ ইওর টয়লেট প্লীজ ?

শ্যাওর। প্লীজ যান। ফীল অ্যাট হোম। বাঙালীর ঘরে এসে এমন কিন্তু কিন্তু করছেন কেন ?

মনীষা বেডরুমে গিয়ে টয়লেটে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে লক্ করে দিলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেই আঁতকে উঠলো। সমস্ত মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। গায়ে, মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে। ঠোঁট দুটি শুকিয়ে গেছে। ভীষণ পিপাসা। মুখ ধুলো ঠাণ্ডা জল দিয়ে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নতুন করে মেক্-আপ্ করলো ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে। ওডিকোলোন লাগালো। হাত কাঁপছিল ওর। তারপর অনেকক্ষণ পর বেরুলো বাথরুম থেকে।

রুম-সার্ভিসের বেয়ারা দুটি বড় ইতালিয়ান কাম্পারী, দুটি সোডা, আইস-বাকেট এবং দুটি বড় ব্লাডি ম্যারী রেখে দিলো এনে মধ্যের কাঁচের টেবলে। বিলটা সই করে কুড়ি টাকার একটি নোট দিলো অতীশ বেয়ারাকে। থ্যাঙ্ক উ স্যার। বলে, সে চলে গেলো। যাবার সময় বললো, হাউ বাউট লাঞ্চ স্যার?

প্লীজ ব্রিং আ মেনু-কার্ড ফ্রম গোল্ডেন ড্রাগন। উই উইল প্লেস দ্যা অর্ডার ফর চাইনীজ ফুড।

বলেই, ব্লাডি-ম্যারীর গ্লাস তুলে দিয়ে মনীষার হাতে, নিজের কাম্পারীর মধ্যে সোডা ও আইস-কিউব ফেলে, স্টারার দিয়ে নাড়িয়ে গ্লাসটি উপরে তুলে বললো: টু দ্যা ফার্স্ট মীটিং অফ মনীষা অ্যাণ্ড অতীশ! চিয়ার্স্!

মনীষা বললো, চিয়ার্স! অস্ফুটে। ওর যে অফিসে কাজ আছে। দুটি ব্লাডি-ম্যারী খেয়ে তারপর গোল্ডেন-ড্রাগনের এলাহি লাঞ্চ খেয়ে ফিরতে ফিরতে তো চারটে বেজে যাবে। সত্যিই সর্বনাশ হলো ওর।

মনীষা নিজেকে শক্ত করে বললো, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের নীলগিরির কফি প্ল্যানটেশানের কথা জিগ্গেস করবেন?

কফি—প্ল্যানটেশান? ওঃ। নোঃ। শুধু তাইই নয় আরও অনেক ব্যাপার ছিলো ডিসকাসনের। কিন্তু লেটস্ কল ইট আ ডে। আজকে কোনো কাজের কথা নয়। "দুজনে মুখোমুখি সমান দুখে দুখী বাহিরে বারি ঝরে ঝরঝর'।

মনীষার সেই অবশ ভাবটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একজন পুরুষের জন্যে, সে যত বড় ডন জোয়ানই হোক না কেন, তার তিল তিল করে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য সে নষ্ট করতে পারে না। এম. বি. ইনটার ন্যাশনালের মান্থলী স্যালারী আর ওয়েজেস-এর বিলই দু কোটি টাকা। তার স্বস্থ সবল ও অনাভিভূত থাকার উপরে নির্ভর করছে অগণ্য পরিবারের শুভাশুভ। নতুন কমপ্যুটার আর টি ভি প্রজেক্টের জন্যে ব্যাঙ্কের কাছে দশ কোটি টাকা লোনও নিয়েছে। আশা করছে তিন বছরের মধ্যে ব্রেক-ইভিন্ করবে। তারপর প্রফিট আসতে শুরু করবে। ব্রেক ইভিন্ পয়েন্ট পেরিয়ে গেলেই ইণ্ডাস্ট্রিতে প্রফিট আসতে শুরু করে বানের তোড়ের মতো। বাঙালী ইণ্ডাস্ট্রি মাইণ্ডেড নয়। রিস্ক নিতে পারে না, ধৈর্য ধরতে পারে না বলেই তার ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়া হয়ে ওঠে না। অতীশ সরকার প্রায় তাকে ঘায়েল করে এনেছিলো। আর একটু হলেই মনীষার ভিতরের চিরন্তন নারী-সত্তা তার ব্যবসায়ী-সত্তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছিলো। যাক। সামলে নিয়েছে মনীষা। মানুষটা তার পৌরুষের চমক আর মনোহারিত্ব দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়ে তার গ্রুপ অফ কোম্পানীজকে

করায়ত্ত করবে ভেবেছিলো। এই রকম প্রেমের অভিনয় মনীষা আগেও অনেকবার দেখেছে। তবে কখনওই সে এমন দুর্বল হয়ে পড়েনি। ব্লাডি-ম্যারীর গ্লাসে একটি বড় চুমুক দিয়ে মনীষা বললো, না, কেন? আমাদের তো বিজনেস্ ডিসকাস্ করতেই এখানে আসা!

অতীশ যেন মনীষার চোখের ভাষা পড়তে পারলো মুহূর্তের মধ্যে। একটু অন্যমনস্ক দেখালো তাকে।

কাম্পারীর গ্লাসে সেও বড় একটি চুমুক দিয়ে বললো, আই অ্যাম সরী। আমি হয়তো অনেক কিছু ইম্যাজিন করতে শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার ও আপনার জীবনে বিজনেস ছাড়াও অন্য অনেক কিছুই আছে। সুস্থ, সাধারণ অন্য অনেক নারী পুরুষেরই মতো। আমি এই ব্যবসা করে করে নিজেকে তো প্রায় নষ্টই করে ফেলেছি। এখন দেখছি, আপনিও ব্যতিক্রম নন।

ব্যতিক্রমের কোনো ব্যাপার নেই। বিজনেস ইজ বিজনেস্ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল মনীষা।

তারপর অতীশের দিকে চেয়ে বললো, আপনি কেন আজকের মীটিং চেয়েছিলেন তা জানালে খুশি হব।

অতীশের মুখ দেখে মনে হলো ও ব্যথিত হয়েছে। প্রথমে, তাইই মনে হলো। পরক্ষণেই বুঝলো মনীষা যে, অতীশ একজন পাকা অভিনেতা। ঘাঘু পুরুষ। রিতার সঙ্গে রাত কাটাবে আর আমাকে এমনই ভাব দেখাচ্ছে যেন আমাকে দেখে একেবারে ওভারহোয়েলমড্। চালাকি করার জায়গা পায় না।

মনে মনে বললো মনীষা, নিজেকে।

নড়বড়ে হয়ে-যাওয়া নিজেকে পেপ্-আপ্ করার জন্যে গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিলো।

এমন সময় ফোনটা বাজলো।

দ্যাটস্ রাইট্।

অতীশ বললো, রিসিভার তুলে। স্মার্টলী। তারপরই বললো, ও। নিশ্চয়ই চিনতে পারছি। মিঃ সারাভাই। কেমন আছেন?

মনীষা বুঝলো, কুমুদিনী ইতিমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছে। দ্যাটস্ ফাইন। অতীশ বললো, মে বী, হোয়েন আই কাম নেক্সট টাইম। আই অ্যাম লীভিং টুমরো ফর ব্যাঙ্গালোর। ডাহা মিথ্যুক! রিতাকে বললো কলকাতা আর কুমুদিনীর স্বামীকে বলছে ব্যাঙ্গালোর।

কবে আবার আসব? ও। আমার সেক্রেটারীর নাম্বারটা রেখে দিন। ওকে সপ্তাহখানেক পরেই ফোন করে জেনে নেবেন। বোঝেন তো! নিজের হোয়্যারাবাউটস্ নিজেই জানি না।

ফোনটা রেখে দিতেই আবার বেজে উঠলো।

ইয়েস। বিয়াম্দকার? হোয়াট ইজ ইট? আই টোল্ড উ্য টাইম অ্যান্ড এগেইন নট টু ডিসটার্ব মী ডিউরিং লাঞ্চ আওয়ার। কী ব্যাপার? 'জে' ক্লাসের টিকিট নেই? ঠিক আছে। টেল উওর ড্যাম ট্রাভেল-এজেন্টস্ টু গেট মী অ্যান

ইকনমি ক্লাস টিকেট। আমার কাল সকালে দিল্লী যেতেই হবে। 'ফিকি'র-একজিকুট্যিভ কমিটির মীটিং আছে। তুমি আবার আমাকে চারটেতে কনটাক্ট করো। না, না, অফিসে। যখন যাবো। অফিসেই ফিরে যাবো আমি।

ফোনটা নামিয়েই তাজ-এর অপারেটরকে ফোন করে বললো অতীশ, ডিনটে অবধি কোনো ইনকামিং কল্ যেন তাকে না দেওয়া হয়। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু বী ডিস্টার্বড্।

মনীষা বললো, মে আই ইউজ ইওর ফোন?

দু দিকে দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে অতীশ বললো, হোয়াই নট। প্লিজ গো এ্যাহেড।

মনীষা তার নিজের অফিসে ফোন করে স্যালিকে বললো, সে সে "তাজ" এ আছে। চারটের সময় ফিরবে। সাড়ে চারটেতে প্রত্যেক গ্রুপ এর ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোলারদের মীটিং ফিক্স্ করে ওঁদের বলে দাও।

ওপাশ থেকে স্যালি বলল, গ্রুপ ওয়ানের মিসেস রঙ্গনাথন যে আজ বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতা যাচ্ছেন।

টেল হার টু পোস্টপোন হার ট্রিপ। ট্র্যাভেল এজেন্টকে বলে দাও। আই হ্যাভ ইমপর্ট্যাণ্ট ম্যাটারস্ টু ডিসকাস উইথ ইচ অফ দেম। আর শোনো আমাকে এখানে আর ডিস্টার্ব কোরো না।

ফোনটা রেখেই অতীশকে বললো, কই? গোল্ডেন ড্রাগনের মেনু তো নিয়ে এলো না! কখন লাঞ্চ অর্ডার করবেন? কখন ফিরব?

ওঃ। আই অ্যাম সরী!

বলেই, অতীশ আবার রুম-সার্ভিসে ফোন করলো। করে, বলে দিলো। তার পর নিজের গ্লাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মনীষার সামনে। বললো, আপনি যখন এতোই "কীন" অন ডিসকাসিং বিজনেস তখন দয়া করে দিন দশেক বাদে আপনার অফিসেই আমাকে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেবেন। আপনার সেক্রেটারীকে বলবেন যেন আমার সেক্রেটারীকে জানিয়ে দেয়। আমিও বলে যাবো আমার সেক্রেটারীকে।

আমি পড়শু একবার লানডান্-এ যাব তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে ফিরব। যদি এক-দুদিন দেরী হয় তবে অসুবিধা হবে না নিশ্চয়ই।

মনীষা বললো।

না, না। আপনার সুবিধামতোই দেবেন। তাছাড়া আমিও রবিবারে সিংগাপুরে যাচ্ছি। সেখান থেকে তাইপে। তারপর ব্যাংকক হয়ে ফিরব। আপনার অসুবিধা না-করেই দেবেন।

দেন, লেটস্ গেট ব্যাক টু প্রিলিমিনারী থিংগস্।

মনীষা বললো, হ্যাঁ। এবার আপনি ডাই-হার্ড প্রফেশনালেরই মতো কথা বলছেন।

অতীশ পরক্ষণেই বললো, কিছু মনে যদি না করেন তো আজ থাক। আমার বিজনেসম্যানের মুখোশটা আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরমুহূর্তেই খসে গেছে। সেটা না পরে, বিজনেস্ আমার দ্বারা হবে না। হয় না। কথা দিচ্ছি যে, এর পরের মীটিং-এ শুধুই বিজনেসই আলোচনা করব। যদি

আপনাকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে আসাতে এবং হঠাৎ এমন ইনফরম্যাল, আন-বিজ্‌নেসম্যান লাইক ব্যবহার করায় আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহ'লে আমাকে ক্ষমা করবেন। অনেস্টলি, আই অ্যাম রিপেন্‌ট্যাণ্ট্‌। আপনি আমাকে কী ভাবছেন জানি না, তবে যা ভাবছেন আমি তা নই।

মনীষা নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললো, এতে ভাবাভাবির কি আছে ?

মনে মনে বললো, আপনি যা, তাইই ভেবেছি। ঠিকই ভেবেছি। তবে আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন। আমিও কিছু হাবাগবা নই। তবে প্রায় নিজের সর্বনাশই করে ফেলেছিলাম আর কী! এম. বি. ইণ্টারন্যাশন্যালের চেয়ার-পার্সন নিজেকে একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ের মতো এতো সহজে প্রেমে পড়ার লাক্সারী অ্যাফোর্ড করতে দিতে পারে না। ছিঃ। কী করতে বসেছিলাম আমি!

চমৎকার বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বম্বের বর্ষাকালটা আমার দারুণ লাগে। নইলে অন্য সময় বিচ্ছিরী। নেহাৎ পেটের দায়েই বার বার আসতে হয়। নইলে আমার হেড কোয়ার্টার্স ব্যাঙ্গালোর, দ্যা গার্ডেন-সিটি অফ ইণ্ডিয়া; আমার সবচেয়ে ফেভারিট্‌। ওখানেই সেট্‌ল করব ঠিক করেছি। যখন করব। জানি না কবে সেই সুদিন হবে। অতীশ বললো।

মনীষা পরিবেশটাকে যেমন গুরুগম্ভীর করে তুলেছিলো তা থেকে একটু সরে এসে বললো, বেশি বয়সে ওখানে না থাকাই ভালো। বাত হয়। গাউট! আর্থরাইটিস্‌ হয়।

বেশি বয়স অবধি কী বাঁচব? যা হেক্‌টিক্‌ লাইফ লিড্‌ করি! আমার ইচ্ছে, আমি পঁয়তাল্লিশেই রিটায়ার করে হয় ব্যাঙ্গালোরে আঙুরের চাষ করবো, নয় কুন্নুরে আমার ছোট্ট কফি-প্ল্যানটেশানেই কাটাবো আর যে-ক বছর বাঁচি।

এতো তাড়াতাড়ি মরার ইচ্ছা কেন?

নাঃ। মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্যই তো তার বেঁচে-থাকার একমাত্র পরিমাপ নয়। জীবনের ভল্যুম, জীবনের মাসস্‌, এচিভমেণ্টস্‌ই একজন মানুষের জীবনের ওয়েইং-স্কেল। তা বিচার করেই সব কিছু! যে-ক বছর বাঁচি, ঘূর্ণিঝড়ের মতোই বাঁচব, যেমন বাঁচছি কুড়ি বছর বয়স থেকে। ইন ফ্যাক্ট বাবার মৃত্যুর পর থেকেই। ভেবেছিলাম, ঘূর্ণি-ঝড়ে পড়া ঝরাপাতার মতো উড়ে-বেড়ানোর জীবনে ছেদ টানবার একটা সুযোগ আসবে।

অ্যাটলিস্ট অ্যাট সাম পয়েণ্ট অব টাইম। ভেবেছিলাম! অনেকবারই হাতের কাছে এসেও সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। হয়তো বহুবার আরও যাবে। কিছুই করার নেই। জীবন এই রকমই।

শেষের দিকে অতীশের গলাটা যেন সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে গেলো।

রুম-সার্ভিসের বেয়ারা গোল্ডেন-ড্রাগনের মেনু নিয়ে এলো।

অতীশ বললো, ইয়া! থ্যাঙ্ক ট্য ভেরী মাচ্‌। তার পর মনীষাকে বললো, কী স্যুপ খাবেন? আপনি?

শার্ক-ফিন্‌।

ফাইন্‌। আমিও তাই। আর? আর কী খাবেন?

হাক্কা-নড্লস্। আর মিক্সড ফ্রায়েড-রাইস্। উইথ ব্যাম্বু-শুট্স্।

দ্যাট স্যুটস্ মী ফাইন কিন্তু একটাই বলুন। এরা কোয়ানটিটিতে বড্ডই বেশি দেয়।

ঠিক। তা বলে কোয়ালিটি ডিসপেন্স্ করে নয়। "ওজ" ইজ "ওজ"।

তারপর বললো, আমি সারা সকাল গল্ফ্ খেলেছি। দারুণ খিদে পেয়েছে। দুটো করেই বলি। যতটুকু পারবেন খাবেন। লিচু আর আইসক্রীম বলি? ডেসার্ট্ হিসেবে?

আমি বড্ডই ওয়েট পুট্ অন্ করেছি।

মনীষা বললো।

মেনু থেকে চোখ সরিয়ে অতীশ পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলো মনীষার দিকে। বললো, আই ডোণ্ট থিংক সো। উ্য আর জাস্ট রাইট ফর ইওর হাইট। এভরীথীং ইন দ্যা রাইটেস্ট প্রোপোরশান অ্যাট দ্যা রাইট প্লেসেস।

মনীষা ব্লাশ করলো।

অসভ্য পুরুষ! পুরুষ মাত্রই অসভ্য।

অতীশ বললো, ভালো করে খাবেন। নইলে এতো বড় দায়িত্ব সামলাবেন কী করে? রোজ সওনা নেবেন আর সাঁতার কাটবেন।

রোজ সওনা নিয়ে আর সাঁতার কেটেই তো এই! আমার বাড়িতেই আছে।

ফাইন। যদি কোনোদিন দয়া করে বাড়িতে ডাকেন ভবিষ্যতে তাহলে আমারও সওনা নেওয়ার আর সাঁতার কাটার সৌভাগ্য হবে। পার্ল হিলে? তাই না? নাম্বারটা লেখা আছে। রোডটা মনে করতে পারছি না।

তা জানি। সব খোঁজ নিয়েই তো আপনি এসেছেন।

কোয়াইট্ রাইট্। সব খোঁজ না নিয়ে আমি মনীষা বসুর কাছে আসিনি। তবে দেখলাম যে আমি ভুল। সব খোঁজ নেওয়া সত্ত্বেও যা খুঁজতে এসেছিলাম তা পেলাম না। তা ছাড়া জানার অনেক কিছুই বাকি ছিলো।

বলেই দু কাঁধ শ্রাগ করে বললো, ওয়েল! কাণ্ট বী হেল্পড!

তবে যে বললেন, আপনি ভেবেছিলেন "ভাস্থ" আমি। বাসু শুনে চমকে গেছিলেন যেন, এমনই ভাব দেখালেন আমার আফিসে!

ওটা আপনাকে ইমপ্রেস্ করার জন্যে। সে মুহূর্তেও আমি সরকার অ্যামালগামেটস্-এর নাম্বার-ওয়ান ছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই অতীশ সরকার হয়ে গেছিলাম। জাস্ট অতীশ সরকার। ইন মাই ইন্ডিভিজুয়াল, প্রাইভেট; কনফিডেন্সিয়াল ক্যাপাসিটি। যে, নিছকই একজন তিরিশ বছরের ক্লান্ত একা পুরুষ।

অন্যমনস্ক দেখালো অতীশকে। কিছুক্ষণ চুপ করে অন্য দিকে চেয়ে রইলো।

তারপর মনীষার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, মনীষা বসুকেও আমি নিছক একজন নারী হিসেবেই এখানে ডেকে এনেছিলাম। ইন হার ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটি। তাঁর বিত্ত, সম্পদ, ক্ষমতা প্রতিপত্তি বাদ দিয়েই—শুধুমাত্র তাঁর নরম ব্যক্তিত্ব আর সৌন্দর্য নিয়েই তিনি আসবেন ভেবেছিলাম। ভুল হয়েছিলো। ভুলের জন্যে ক্ষমাও চেয়েছি।

বলেই, মুখ নিচু করে ফেললো অতীশ।

এই লোকটাকে বুঝতে পারছে না মনীষা। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, লোকটা যা বলছে তা সত্যি। সীনসীয়রলীই বলছে। মনে হচ্ছে, হি মীনস্ এভরী ওয়ার্ড অফ ইট। পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে, লোকটি একটি ঠগ। চীট্। স্যুইংড্লার প্রোফেশনাল লেডি-কিলার। তার চেহারা আর ব্যক্তিত্বের চমক দিয়েই সে এম. বি. ইণ্টারন্যাশনালকে কব্জা করে নিয়ে তারপরই মনীষা বাসুকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

কুমুদিনী বলছিলো, অতীশ সরকার এম. বি. ইণ্টারন্যাশনাল ইনক্-এর হোল্ডিং-এর অনেক কোম্পানীরই শেয়ার কর্নার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। বম্বে-কলকাতা দিল্লী কোনো জায়গার স্টক-ব্রোকাররাই সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এই আপাত-স্থিরতার পেছনে যে অতীশ সরকারই, সে খবরও মনীষার বিভিন্ন ম্যানেজারেরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ-এজেন্সীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। ব্যাপারটা খুবই বুদ্ধিমানের মতো করছে। আলাদা করে ছোট ছোট শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে দেখা করে ওর এজেণ্টরা ফ্যাবুলাস প্রাইস অফার করছে। এক একটা লট্ কিনেই চুপ মেরে যাচ্ছে। আবার কিছুদিন পরে এগোচ্ছে।

অতীশ বললো, কাল দিল্লীতে পৌঁছিয়েই একটি কবিতার কথা মনে পড়ে আমার।

কার কবিতা? শঙ্খ ঘোষ, না শক্তি, সুনীলের?

না। ওঁদের কবিতার খুবই ভক্ত ছিলাম একসময় যদিও। এখন সময় পাই না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই মনে আছে কিছু কিছু। মনে আছে বলেই মনে পড়ে। মনে না থাকলে আজ আর নতুন করে পড়ার সময় থাকতো না।

কোন্ কবিতা?

সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে শুধোলো মনীষা। বিস্মিত হলো অতীশের কাব্যপ্রীতি দেখে। এরকম ভার্সেটাইল ব্যবসাদার আগে মীট করেনি কখনও বাঙালী ব্যবসাদার তো নয়ই!

আপনি কিন্তু খাচ্ছেন না! আমি আরো দুটো কাম্পারী খাবো। আপনি আমাকে কম্পানী দেবেন না?

আমি ড্রাঙ্ক হয়ে অফিসে যেতে চাই না।

চারটে ব্লাডি ম্যারী খেলেই এতোবড় গ্রুপের চেয়ারম্যান যদি ড্রাঙ্ক হয়ে যায় তবে তার কোম্পানী বিক্রী করে দেওয়াই ভালো।

কখনও বেচলেও আপনাকে বেচবো না।

মনীষা বললো।

আমি কিনলে না সে প্রশ্ন উঠবে? কেন মিছিমিছি ঝগড়া করছেন। ঝগড়া করতে হলে করবেন পরের দিন। আজ ভাব। শুধু ভাব।

বলেই, রুম সার্ভিসে অর্ডার করলো আরও ড্রিঙ্কস্-এর।

মনীষা ভাবলো, সর্বনাশ! আরও ব্লাডি-ম্যারী।

বললো, আপনি কি আমাকে রেপ-টেপ করবার মতলব করছেন না। কি মতলব বলুন তো!

এবারে হেসেই বললো মনীষা।

আপনার কি মনে হয় অতীশ সরকারেরও কোনো মেয়েকে রেপ করার প্রয়োজন ঘটে। উল্টে সারাক্ষণ নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখতে হয়, উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি; ফ্রম বীইং রেপড বাই লেডিজ।

মনীষা বললো, আপনার নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা বড্ড বেশি উঁচু।

একটুও নয়। কথাটা আপনার বেলাও কি প্রযোজ্য নয়? মানে, আপনাকেও কি সারাক্ষণ ভদ্রলোকদের হাত থেকে বাঁচতে হয় না? নানার রকমের ন্যুইসেন্স এর হাত থেকে? ফর ইনস্ট্যান্স, আপনার সেই বান্ধবীর স্বামী, আহাঃ নামটা মনে করতে পারছি না। আপনার স্কুলের বান্ধবীর স্বামী

চমকে উঠলো মনীষা। কী সাংঘাতিক লোক! ওকে ইনসাইড আউট করে জেনে তবেই এসেছে ওর কাছে। লোকটা ওর সম্বন্ধে জানে না এমন কিছুই নেই। এমন কী পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধেও।

কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করে বললো, সে তো আমি মেয়ে বলে। আমি একা কেন? সব মেয়েকেই ঐরকম ভাবেই এখনও বাঁচতে হয়। পুরুষরা তো জানোয়ারই! ইন মেজরিটি!

তা ঠিক! লস্ট কেসে কখনও অগ্রুমেন্ট করি না আমি। কিন্তু সুন্দরীরা কিন্তু জানোয়ারদেরই বেশি পছন্দ করেন। জানি না কেন! নইলে "বিউটি অ্যান্ড দ্যা বীস্ট" কথাটা আসতোই না। যাকগে, কবিতাটা বলি।

কবিতাটির নাম "নষ্ট-স্বপ্ন"। আপনি জানেন?

আমার কোনো স্বপ্নই নষ্ট হয়নি। নাঃ। জানি না। মনীষা বলল।

যদি না হয়ে থাকে তো আপনি লাকি! তবে এটা বোধহয় বাজে কথা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল—এম্পায়ার গড়ার স্বপ্ন ছাড়াও একজন পুরুষ অথবা নারীর অন্য অনেকই স্বপ্ন থাকে। যে-সব স্বপ্নের রঙ ফিকে বেগুনি। অথবা লেমান ইয়ালো। সেই সব স্বপ্ন, সম্পূর্ণ হবার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকটি স্বপ্নই। কোনো কোনো মহিলা যেমন কনসিভ করতে পারেন কিন্তু প্রতিবারেই তাঁদের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়, সেই সব স্বপ্নও তেমনই। হাউ আনফরচুনেট! নষ্ট হবার জন্যেই স্বপ্ন। স্বপ্ন মাত্রই নষ্ট হয়। জওহরলাল নেহরুর ভারত-গড়ার স্বপ্নের মতো। হোয়াট আ ট্র্যাজেডি!

বলেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগলো অতীশ উদাত্ত ললিত গলায়, সুন্দর কাটা কাটা ডিকশানে। ওর বাংলা আবৃত্তি শুনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো মনীষার যে, এই যুবকই সরকার অ্যামালগ্যামেটস্ এর কর্ণধার।

"কালকে রাতে মেঘের গরজনে
রিমঝিমি বাদল-বরিষনে
ভাবতেছিলেন একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্তি ধ'রে
বাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে॥

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি।
বৃথা স্বপ্নে কাটল সারারাতি।
হায় রে সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি—
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে।
আমি চলি আমার শূন্য পথে॥
কালকে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত—
মিথ্যা যদি মধুররূপে
আসত কাছে চুপে চুপে
তাহা হলে কাহার হত ক্ষতি!
স্বপ্ন যদি ধরত সে মূরতি!"

বাঃ।

মনীষা বললো। চমৎকার আবৃত্তি করেন তো আপনি!

হ্যাঁ। যে নিজে লিখতে না পারে, নিজের মনের কথা অন্যকে বোঝাতে না পারে; তার অন্যর কবিতা আবৃত্তি করা ছাড়া উপায়ই বা কি?

ক্ষণিকার? না?

বাঃ। ঠিক ধরেছেন তো! অনেকেই বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ তো অবসলিট্ই হয়ে গেছেন তরুণদের কাছে। তার জন্যে কিছু মডার্ন কবি সাহিত্যিকও দায়ী। যাঁরা নিজেরাই ভালো করে না-পড়ে রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করে দিয়েছেন।

বাড়াবাড়ি রকমের অডাসিটি! আপনার কী মত জানি না। তেমন বিকল্প না থাকলে বাতিল করাটা স্পর্ধার ব্যাপার। শূন্য-স্পর্ধা। এবার আমিও তাহলে আপনাকে একটু শোনাই। ক্ষণিকা থেকেই।

বাঃ। ওয়াণ্ডারফুল। এরা ড্রিঙ্কস দিতে এতো দেরী করছে কেন? কী হলো কি তাজমহল হোটেলের?

বলেই, রুম সার্ভিস; টেলিফোন ডায়ালের ছ' নম্বর ঘুরোলো। ওপাশ থেকে উত্তর আসার আগেই বেয়ারা এসে কলিং-বেল বাজালো। ফোন নামিয়ে রেখে, বিল সই করে, টিপস্ দিয়ে, মনীষার ড্রিঙ্কস নিজে হাতে বানিয়ে দিয়ে মনীষাকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ব্লাডি ম্যারীটা শেষ করে নতুনটাতে চুমুক দিয়েই শুরু করুন। গায়ে জোর না করলে দুরূহ কর্ম করা যায় নাকি?

আমি কিন্তু একটুখানি বলবো। শুনে, আপনার বলতে হবে কোন্ কবিতা।

পরীক্ষা হোক। আমি জানতাম, আপনি ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুল-প্রসাদের গান গাইতে পারেন। আবৃত্তিও করতে পারেন জানতাম না। না!

আবারও চমকালো মনীষা।

আপনি যে তারই সঙ্গে জেনেসিস্ গ্রুপের "ফিল্ কলিনস্"-এর নাম করবেন জানা সেটাও অভাবনীয় ছিলো।

অতীশের কথা কেটে দিয়ে মনীষা বললো, একে আবৃত্তি বলে না। পুনরাবৃত্তিই বলা ভালো। বলেই, প্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, বেশ ছুটি করিয়ে দিলেন কিন্তু আপনি আজ। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ক্লাস কাটে, কলকাতার চাকুরেরা যেমন মিথ্যে কথা বলে অফিস কাটেন, তেমনই আর কী! এমন রোজ রোজ হলে দুজনের ব্যবসাই উঠে যাবে। দেখতে হবে না আর।

যাক্। যাক্। উঠেই যাক। সঙ্গে যন্ত্রণাটারও শেষ হবে। এই দৌড়ে বেড়ানোর নাম কি জীবন? যতটুকু হয়েছে তাতেই কেটে যাবে বাকি জীবন। "আরও" "আরও" করার তো শেষ নেই!

অতীশ বললো।

এবার শুনুন। আমি কিন্তু অলরেডি "হাই" হয়ে গেছি। আপনার স্বপ্ন প্রসঙ্গেই মনে এলো কবিতাটি। তাই···

কিছু হতে হলে "হাই" হওয়াই ভালো। "লো" হতে যাবেন কোন দুঃখে? বলুন এবার।

অতীশ বললো।

"কপাল যদি আবার ফিরে যায়
প্রভাত-কালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎমেঘে ত্বরিত বরিষনে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,
তখন খাতা পোড়াও, খ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল লাগাও দিল।
বাহুর সাথে বাঁধো মৃণাল বাহু
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল"॥

স্পেলন্‌ডিড। কবিতার নাম 'যথাসময়'। পাশ?

মনীষা মুখ না তুলেই বললো, পাশ।

এমন কবিতা ওর মনেই বা পড়লো কেন? আর মনে পড়লে বলতেই বা গেলো কেন ছাই!

নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় হতভম্ব হয়ে ভাবলো মনীষা।

॥ ২ ॥

মনীষার অফিসে নিজের সাদা-মার্সিডিস্‌ চালিয়ে ওকে পেঁছে যখন দিয়ে গেলো অতীশ তখন চারটে বেজে দশ ! কী লজ্জা ! এমন কখনও হয়নি আগে।

সী উ্যা এগেন। এর পরের মীটিং-এ যদিও শুধুই বিজনেস ডিসকাসড হবে, নেভারদিলেস্‌ আই ওয়াণ্ট দ্যাট মীটিং টু বী আ ক্লোজ-ডোরড ওয়ান। আমারও কোনো এইড্‌স থাকবে না আপনারও না। অ্যাণ্ড রিমেম্বার ! ক্লোজ-সার্কিট টি-ভি ক্যামেরাও যেন না-চালানো থাকে আপনার ঘরে। "আভ্যন্তরীণ সমস্যা" আলোচনা করতে যাবো আমি আপনার "ক্রেমলিন"-এ। আই নো অল বাউট্‌ ইওর অর্গানাইজেশন্‌। অ্যাণ্ড বাউট দ্যা চেয়ারপার্সন অ্যাজ ওয়েল্‌।

একটু থেমে, হেসে বললো, দশ-বারো দিন সময় দিয়ে গেলাম। দেশ-বিদেশের সব ডিটেকটিভ-এজেন্সি লাগিয়ে আপনাকে আমার অর্গানাইজেশান এবং আমার সম্বন্ধে জানবার পূর্ণ সুযোগও দিয়ে গেলাম। ন্যাউ, মেক হে ! হোয়াইল দ্যা সান শাইনস।

আবার বললো, সী উ্যা।

বলেই, মনীষার ডান হাতের পাতাটি নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে আলতো চুমু খেলো অতীশ। মনীষার শরীরের মধ্যে প্রথম কৈশোর থেকে জমিয়ে-রাখা যা-কিছুই সবচেয়ে দামী বলে জানতো, যা কিছুকে কাঠিন্যর ফয়েল দিয়ে মুড়ে রেখেছিলো, সবই যেন হঠাৎই ফ্রিজ থেকে বের-করা আইসক্রীমের মতোই গলে গেলো। ওর বাহ্যিক ব্যক্তিত্বর হিমবাহ হঠাৎই যেন কোনো দৈব দুর্বিপাকে কোনো উষ্ণ সাগরে এসে পড়ে অতি দ্রুত জীবনের নোনা জলে মিশে যেতে লাগলো। ভীষণ ইনসিকিওর ফিল করতে লাগলো ও। আবার দারুণ সিকিওরড্‌-ও। কী সর্বনাশ যে ঘটে গেলো ওর জীবনে !

সাড়ে-চারটেতে মীটিং ডেকেছিলো। মিসেস রতনঝংকার তাঁর কলকাতার ট্রিপ ক্যানসেলও করেছেন। স্যাসি বললো, শী ইজ আ লিটল আপসেট। শী কুড হ্যাভ অ্যাটেনণ্ডেড আ ফ্রেণ্ডস বার্থ-ডে পার্টি। হার পি-এ টোল্ড মী।

টেল'হার টু গেট লস্ট।

মনীষা বললো। পনেরোশো টাকাও জলে গেলো এই লাস্ট-মিনিট ক্যানসেলাশনে। ওসব কোনো ব্যাপারই নয় এতো বড় কোম্পানিতে! কোনো বড় কোম্পানিতেই নয়। প্রাইভেট সেকটরে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মীটিং ক্যানসেল করাটাও কোনো ব্যাপার নয়। আফটার অল্, সমস্ত বড় অর্গানাইজেশানের নাম্বার ওয়ানদেরই কতগুলো প্রেরোগেটিভস্ থাকেই। সেই সব প্রেরোগেটিভস্, সংবিধান মান্য করা নির্বাক, অভুক্ত দেশবাসীর বাধ্যতামূলক-ভাবে নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া "প্রেরোগেটিভস্" নয়। এই প্রেরোগেটিভস্ মনীষা অথবা অতীশ নিজেই অর্জন করেছে। নিজে হয়তো পুরো কৃতীন মনীষা, কিন্তু তার পরিবারের অর্থ, তার ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, দিল্লিতে তার 'পুল' এই সবই তাকে কিছু স্বাধিকার দিয়েছে। মাঝে মাঝে; সব সময় নয়, এই স্বাধিকার প্রয়োগ করে আহ্লাদিত বোধ করে ও। যেমন আজকের মীটিং ক্যানসেল করে বোধ করলো। সকলেরই মাঝে মাঝে জানা উচিত নতুন করে যে, মনীষার সুবিধা-অসুবিধে বা ক্বচিৎ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাতে তারই নিয়োজিত এক্সিকুটিভস্দের অনেকই দশ-পনেরো কুড়ি হাজার মাস মাইনের মানুষদেরও উঠতে-বসতে হয়। প্রাইভেট সেকটরে বড় চাকরির যেমন সুখ অনেক, অসুখও কম নয়। পাবলিক সেকটরের বড় চাকরিওয়ালারা তাঁর সব খোঁজ হয়তো রাখেন না। ক্বচিৎ এই 'ভেটো' প্রয়োগ করে ও নিজের ক্ষমতাকে এবং নিজেকেও পুনরাবিষ্কার করে। ইউনাইটেড নেশানস্-এর সিকিওরিটি কাউন্সিলের মীটিং-এ রাশিয়া বা ইউনাইটেড স্টেটস্ যেমন করে। নিজের পুনরাধিষ্ঠান এবং স্বাধিকারের সীমা সম্বন্ধে বারংবার সচেতন হবারই অন্য নাম তো বেঁচে থাকা!

ইণ্টারকম্ তুলে মনীষা বললো, স্যাসি! আই অ্যাম গোয়িং হোম। শ্যাল বী হিয়ার অ্যাট নাইনও ক্লক শার্প টুমরো। বাই। গো থ্রু দ্যা টেলেক্সেস অ্যাণ্ড ড্যু দ্যা নীডফুল। ডোণ্ট ডিসটার্ব মী অ্যাট দ্যা রেসিডেন্স।

স্যাসি ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হলো। হেডকোয়ার্টার্স থেকে কোনোদিনও পাঁচটার এক মিনিটও আগে অফিস ছেড়ে যান না ম্যাডাম। কোনো বিজনেস কমপ্যাটটরের সঙ্গে সাড়ে বারোটায় লাঞ্চে বেরিয়ে চারটে নাগাদও ফেরে না। এই প্রথম! কী হলো ম্যাডামের কে জানে! অতীশ সরকারের কথা মনে পড়লো স্যাসির। ওর মুখে এক স্মিতহাসি ফুটে উঠলো। মনে মনে বললো, আফটার অল্, ম্যাডামও ওরই মতো একটি মেয়েই! অতীশ সরকারকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে যে-কোনো মেয়েরই শরীর-মন ঝিকি-ঝিকি করে উঠবে। তা ম্যাডামের আর বিশেষ দোষ কী। ওর বয়ফ্রেণ্ড চৌরিয়ান পার্থকে একটা ফোন করলো। আজ ও-ও একটু তাড়াতাড়ি বেরোবে।

॥ ৩ ॥

মনীষার বিশ্বাস হচ্ছিলো না গতকালের কোনো কথাই। ও যে কী করে এমন ভাবে প্রতিপক্ষর কাছের মানুষ হয়ে গেলো তা ভেবে লজ্জা করছিলো ওর। ব্লাডি-ম্যারীর সঙ্গে কিছু মিশিয়ে-টিশিয়ে দিয়ে তাকে দ্রব করে দেয়নি তো অতীশ ?

যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। অফিসের প্রত্যেককে মনীষা বলে দিলে যে ও লানডান ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে ফিরলেই সরকার অ্যামালগ্যামেটস-এর উপরে পুরো রিপোর্ট চায়। বম্বে, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, মাড্রাস এবং দিল্লীর আলাদা আলাদা ডিটেকটিভ এজেন্সীকে ভার দেওয়ার কথা বললো। তাছাড়া কুমুদিনী নিজে যা করার করবে। সিঙ্গাপুরে ওদের কন্-ম্যানকে ফোন করে বলে দিতে বললো সরকারদের সিঙ্গাপুরের কোম্পানী সম্বন্ধেও সব খোঁজ খবর নিতে। এও বলে দিলো যে, প্রত্যেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর কাছ থেকে লিখিত কনফারমেশন নেবে, যাদের এই বিশেষ কাজ দেওয়া হয়েছে এবং হবে যে, সরকার অ্যামালগ্যামেটস তাদের মক্কেল নয়।

লুফ্ৎ-হান্সার ফ্লাইট। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এ নেমে লান্ডান্-এর ফ্লাইট নিলো। হিথ্রো এয়ারপোর্টে যখন প্লেনটা ল্যান্ড করলো তার আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সী-গাল্ একটি। টারম্যাকের পাশের ঘাসে। লান্ডানে এলেই খুব ভালো লাগে ওর। মা-বাবার সঙ্গে প্রথম এসেছিলো যখন ওর বারো বছর বয়স। লান্ডান ইজ লান্ডান। ওল্ড ইজ গোল্ড। কিলবী, ওর লানডানের ম্যানেজার নিতে এসেছিলো। কিলবীকেও বলে দিলো ঐ ব্যাপারে।

লানডানের কাজ সেরে যেদিন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এ পেঁছিলো সেদিন শনিবার। ছুটির দিন। ইচ্ছে করেই বেলা এগারোটার ফ্লাইট নিয়েছিল।

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এ কাজেই আসুক আর বেড়াতেই আসুক দিলীপদার বাড়িতেই ওঠে। দিলীপ রায়চৌধুরী। দিলীপদা আর নীলিমা বৌদি অফেনবাখ্-এ থাকেন। মার্কেটিং স্ফিয়ারে পশ্চিম জার্মানীর একজন কেউ-কেটা দিলীপদা। বাঙালীর গর্ব। ওয়েস্ট জার্মানীর "হুজ হু"-তে নাম ছাপা হয়। কুইন

এলিজাবেথ যে মডেলের গাড়ি চড়েন মার্সিডিজ, সেই মডেলের গাড়ি চড়েন দিলীপদাও। ও'দের একমাত্র মেয়ে রাজকুমারীও রাজকুমারীরই মতো দেখতে। চেহারায় তো অতি সুন্দরীই তার চেয়েও বড় কথা ওর ডিমেনার। রাজকুমারী-দেরই মতো। জার্মানটা তো জার্মানদের মতোই বলে, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরিজিও সেরকমই বলে। অথচ বাঙালী সংস্কৃতিও পুরোপুরি বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর পড়াশুনা শেষ হলে, দিলীপদার সঙ্গে একটা ভেঞ্চার করে রাজকুমারীকে এখানে তার "হেড" করে দেবে ইচ্ছে আছে মনীষার। তার আগে বম্বেতে নিয়ে এসে মাস ছয়েক ওর সঙ্গে রাখবে। হাতে-কলমে কাজ দেখাবার জন্যে। দিলীপদাও তাঁর অফিসে মাসদুয়েক রেখে শেখাতে পারেন।

রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক যদি আর একটু লিবারাল হতো তবে ব্যবসা, বিদেশে কেমন করে করতে হয় দেখিয়ে দিতো মনীষা।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও তেমন দোষ নেই। চারধারে চোরেদের এত ভীড় যে সবাইকেই চোর ভাবেন তারা। অবশ্য মনীষার কোনো প্রবলেম হয় না। হবেও না যতদিন অমিতাভ কাকা ডেপুটি গভর্নর। এই সময়টাতে দিল্লীতে অনেকই বড় বড় পদে দেখা যাচ্ছে বাঙালীদের অনেকদিন পর। বলতে হবে ভেরী প্লেজেণ্ট কো-ইনসিডেন্স। বোর্ড অফ ইনডায়রেক্ট ট্যাক্সেস এর চেয়ারম্যান এখন জে জে দত্ত সাহেব। রেভিন্যু সেক্রেটারী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব। বোর্ড অফ ডাইরেকট ট্যাক্সেসের মেম্বার ইনভেস্টিগেশন এস কে রায় সাহেব। চেয়ারম্যান টিক্কু সাহেবের ওয়ার্লড ব্যাঙ্কে যাওয়ার একটা গুজব শুনছে। যদি চলে যান, পেলে কী আর অমন লুক্রেটিভ প্রেস্টিজাস পোস্ট ছেড়ে দেবেন? যদি চলেই যান তবে হয়তো রায় সাহেবই চেয়ারম্যান হবেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেস এর। রায় সাহেব নিজে অবশ্য কখনওই এমন সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেন না। বলেন, কারা যে গুজব রটাচ্ছে, জানি না। গুজবও হতে পারে। গুজব, এই গুজবেরই দেশ ভারতবর্ষ!

অবশ্য টিক্কু সাহেবও মানুষ চমৎকার। রায় সাহেবদেরই ব্যাচ মেট। নারায়ণ সাহেব যখন চেয়ারম্যান ছিলেন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। মনীষাকে ওরা সকলেই চেনেন এবং অতটুকু মেয়ে এতবড় ব্যবসা একা হাতে এবং এফিসিয়েনটলী চালাচ্ছে দেখে ওকে সবসময়ই সাহায্য করেন ও'রা প্রত্যেকেই। যখন যতটুকু দরকার পড়ে। মেয়েরই মতো দেখেন সকলে।

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করার পর মনীষা দেখলো ওকে নিতে এসেছেন দিলীপদাই। কিন্তু রায়চৌধুরী নন, দিলীপ চ্যাটার্জি! খুবই মজার মানুষ। দিলটাও অন্য দিলীপদারই মতো বড়। ও'র স্ত্রী জয়া। বিজয়ওয়াড়ার মেয়ে। এখানের হাসপাতালে আছেন। খুবই ভালো মনের মেয়ে। আর ও'দের একমাত্র ছেলে, দশ বছরের বাপির মতো হ্যাণ্ডসাম ছেলে মনীষা জীবনেও দেখেনি। মনীষা ঠাট্টা করে বলে যে, বাপি একা হাতেই নাৎসী-জার্মানীর সর্বনাশ করে দেবে বড় হয়ে। জার্মান মেয়েদের এত বড় "কিলার" আর হবে না কখনও। বাপি জার্মান ছাড়া অন্য ভাষা তেমন বলতে

পারে না। ইংরিজি অবশ্য বলে। সেইটাই বড় হলে গুণ হয়ে দাঁড়াবে। ও একাই জার্মানীর মহিলাকুলে কৃষ্ণ হয়ে শ্বেতাঙ্গিনীদের নাকানি-চোবানি খাওয়াবে। মনীষার বিশ্বাস। খুবই সপ্রতিভ ছেলে।

গাড়িতে উঠেই দিলীপদা বললেন, রায়চৌধুরী একটু বার্লিনে গেছে কাজে। তাই আমরাই নিতে এলাম। রাতে ভুপাল রায় আর মিসেস রায় পীযূষ বিশ্বাসের বাড়ি আসবেন। তোমাকে শুঁটকি মাছ খাবার নেমন্তন্ন করেছেন পীযূষবাবু। মনীষা হাসলো. কৃতজ্ঞতায় ; ভাল লাগায়। এঁদের কাছে কত কীই যে পায়, পেয়েছে! বদলে কিছুমাত্রই করতে পারে না। বড়জোর কখনও এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠানো। বা কনেকটিং ফ্লাইটের দেরী থাকলে বাড়িতে বা হোটেলে ডিনার খাওয়ানো। তাও দু-তিনবছরে একবার।

একটি ভারী চিঠি দিলেন দিলীপদা। বললেন, রায়চৌধুরীর বাড়িতে সিঙ্গাপুর থেকে কে পাঠিয়েছে তোমাকে স্কাইপ্যাক ক্যুরিয়ার সার্ভিসে।

মনীষা খামটা নিয়ে দেখলো. লেখা আছে : ফ্রম : এস অ্যামালগ্যামেটস।

বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগলো মনীষার।

জয়া বৌদি বললেন. কী হলো তোমার ? শরীর খারাপ ?

না।

একটু পরে বললো, দিলীপদা। এবারে কিন্তু আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে হোটেলেই উঠবো। বুকিং করা আছে। আমার অনেকগুলো বিজনেস-মীটিং আছে। অফেনবাখ্ বা তোমাদের ওখান থেকে আসা-যাওয়া করতে অসুবিধা হবে।

আহা! অফেনবাখ্ অথবা আমাদের বাড়ি যেন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে কতই দূর!

হেসে বললো, জয়া।

না। তাছাড়া দিলীপদাও তো নেই।

বাঃ নীলিমা আর রাজকুমারী তো আছে। ওদের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। তাছাড়া ওরা না থাকলেও আমার বাড়িতে কি থাকতে পারবে না দুদিন ?

থাকতে পারতাম সকলের কাছেই। কিন্তু মীটিং চলবে দেরী করে। হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলেই ডিনার অ্যারেঞ্জ করেছেন ওঁরা।

দিলীপ বললো. ঠিক আছে। তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি। রাতে আমরা সকলে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

শুটকি মাছটা কাল রাতেই করো। পীযূষদা আর ভুপালদাকে বোলে। বৌদিদেরও। বোলিং করে খাবো কাজটাজ শেষ করে। সকাল দশটাতে ফ্লাইট। পড়শু। অসুবিধে হবে না কোনো।

ওকে! দিলীপদা বললো। তুমি যেমন বলবে। কাজ করতেই তো আসা। কাজে বাগড়া দেবোই বা কেন আমরা! অবুঝ তো নই!

তারপর বললো, আমার আর দিলীপের তো প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেলো জার্মানীতে! এখানের লোকেদের মুখে শিখেছিলাম : "ওয়ার্ক কামস ফার্স্ট

ইন আ ম্যানস লাইফ।" এখন দেখছি শুধু ম্যানস নয়, ইন আ উওম্যানস লাইফ অ্যাজ ওয়েল।!

জয়া বললো, বলো ইন আ পার্সনস লাইফ।

দ্যাটস রাইট। গত তিরিশ বছরে শুধু জার্মানীই নয়, আমাদের দেশও অনেক বদলে গেছে। নইলে এতটুকু মেয়ে সারা পৃথিবীময় ঘুরে ব্যবসা করছে। তাও আবার বাঙালী মেয়ে! আমাদের সময় তো ভাবাই যেতো না।

জয়া বৌদি দিলীপদার এবং অন্য সকলের সঙ্গে ইংরিজিতেই কথা বলেন। জার্মানি অবশ্য বলেন জার্মানদের মতোই। জার্মান হাসপাতালে কাজ।

মনীষা বললো জয়াকে, রাগ করলে নাতো তোমরা বৌদি?

তোমাকে তো আর নতুন দেখছি না আমরা। এতো সহজেই রাগ করবো?

হোটেলে নেমে আঙুল দিয়ে নামটা দেখিয়ে আগামীকাল সকালে ফোন করতে বললো ওদের।

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এর সবচেয়ে ভাল হোটেল। নাম্বার বের করে নেওয়া কোনো প্রবলেম নয় কারো পক্ষেই। গাড়ি থেকে ব্যাগটাকে দিলীপদা নামিয়ে দিয়ে যখন চলে গেলো তখন ভাবলো ও। কিন্তু মুশকিল হলো হোটেলে নামবার পর।

কোনো ঘর নেই বললো রিসেপশন থেকে।

সরী, একটিও নয়।

ঘর থাকার কথাও নয়।

বম্বের তাজ বা ওবেরয় টাওয়ার্স, দিল্লীর হায়াট রিজেন্সী বা মৌরীয়া শেরাটনে বা তাজ-এ গিয়েও উইদাউট প্রায়র রিসার্ভেশনে ঘর পাওয়া মুশকিল। আসলে তো ওর বুকিং ছিলোও না। অতীশের চিঠিটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও ডিসিশান নিয়ে মিথ্যে কথাটা বলেছিলো। ওর হাত-পা আবারও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কারো বাড়িতে থাকলে কিছুটা সামাজিকতা তো করতেই হই! ও এখন একেবারেই একা থাকতে চায়। অতীশ কী লিখেছে তা পড়তে চায়। ধারে-কাছে আর কাউকেই এখন ও চায় না। কাউকেই নয়। কী করে ও দিলীপদার, মনে যেখানে ওঠবার কথা ছিলো ওর তার ঠিকানা জানলো? রীতিমতো আন্-নার্ভিং ব্যাপার।

হোটেলের লবী থেকে ওর কাস্টমারের বড় সাহেবকে ফোন করে বললো অন্য জায়গায় থাকার কথা ছিলো কিন্তু ও ডিসিশন চেঞ্জ করেছে। উনি কি একটা ঘর…।

কার্ল রিমেনস্নাইডার বললো এম এস বাসু। আপনি রিসেপশানে আবার ফিরে যেতে যেতেই আপনার ঘর ঐ হোটেলেই আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

এবারে রিসেপশানে ফিরে যেতেই একেবারে ভি আই পি ট্রিটমেন্ট।

মনীষা ভাবলো, নাঃ। রিমেনস্নাইডারের হোল্ড আছে।

তারপর হেসে রিসেপশানের মেয়েটিকে বললো, তাহলে এই যে আমাকে বললেন ঘর নেই।

ঘর সত্যিই নেই। ইটস দ্যা বেস্ট স্যুইট উই হ্যাভ। আই ডিডনট টেল আ লাই।

স্যুইট ?

ইয়েস ম্যাম্। স্যুইট, অ্যান্ড দ্যা বেস্ট স্যুইট ইন দ্যা বেস্ট হোটেল ইন ফ্রাঙ্কফুর্ট !

অ্যামেরিকান আর্মি'র বেস থাকাতে ফ্রাঙ্কফুর্টের অনেকেই ইংরিজি শিখে নিয়েছে। হোটেলেতো ইংরেজি জানেই সকলে। তবে জার্মান জাতের রকমটাই একটু আলাদা বলেই যেন কী ইস্ট আর কী ওয়েস্ট জার্মানী স· জায়গাতেই জার্মানরা এক হতে চাইছে। হাবে-ভাবে বোঝা যায়। দ· জার্মানীকে এক হতে দিতে রাশিয়া বা অ্যামেরিকা কেউই চায় না। বিরা স্যুইট। ভারতীয় টাকা দিয়ে ডয়েশ মার্ককে গুণ করতেই দেখা গেলো · স্যুইটের ভাড়া দিনে আট হাজার টাকা ! মনীষা ভয় পেয়ে বেডরুমে না ঢুকে সিটিং রুম থেকে রিসেপশানে ফোন করলো।

কোনো গোলমাল হলো না তো !

তারা বললো, কোথাওই ভুল হয়নি। উ্য আর মিস্টার রিমেনস্নাইডার গেস্ট।

মনীষা পড়লো বিপদে। সারা বছরে এই কাস্টমারের সঙ্গে এম · ইন্টারন্যাশনাল এমন কিছু বিরাট ব্যবসা করে না অথবা করবার আশ সম্ভাবনাও নেই। খাতিরটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের মনে হলো। তখন বেড-রুমে না ঢুকে ও নিঃসন্দেহ হবার জন্যে রিমেনস্নাইডারকে ফোন করলে আবার।

কার্ল বললো, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাকে অটো হেফফ্না ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যে উ্য শুড বী লুকড আফটার লাইক আ প্রিন্সেস ইটস অ্যান অর্ডার। উ্য নো ! হী'জ উইশ ইজ আ কম্যান্ড টু মী।

কে হেফফ্নার ? আমি তো চিনি না। মনীষা আরও বিপদে প· বললো অসহায়ের মতো।

তারপর বললো, প্লে-বয় ম্যাগাজিনের হিউ হেফফ্নার না তো ?

তুমি অটোকে না চিনতে পারো। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর সকলেই তা· চেনে। এত বড়লোক পশ্চিম-জার্মানিতে কমই আছেন।

কিন্তু আমার তো এই হোটেলে ওঠারই কথা ছিলো না ! তখনও সন্দি· গলায় বললো মনীষা।

তা আমি জানি। দিলীপ রায়চৌধুরীর অফেনবাখ্-এর বাড়িতে 'তোমা· জন্যে হলুদ গোলাপের বোকে এবং ওয়াইন-এর বাস্কেট পৌঁছে গেছে তোমা· ফ্লাইট ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই। তুমি আমাকে ফোন করবার পরও আমি য· তোমার জন্যে এমন ব্যবহার না করি তাহলে আমার সঙ্গেই ব্যবসা বন্ধ হ· যাবে। বছরে কত বিলিয়ন মার্ক-এর ব্যবসা করি হেফফ্নারের সঙ্গে তা তু· জানো না এম এস বাসু ! আমি তোমার ব্যাপারে কোনো ঝুঁকিই নি·

পারি না। আই কানট অ্যাফোর্ড টু। এবারে আমি কিছুই করছি না। হেফফ্‌নার এর অতিথি তুমি। কার ইনস্ট্রাকশানে হেফফ্‌নার তোমাকে প্রিন্সেস-এর ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে তা অবশ্য আমি বলতে পারবো না।

মহা বিপদেই পড়লো মনীষা। এদিকে চান করতে ইচ্ছে করছে খুব। কিছুই করতে পারছে না। অতীশের চিঠিটা পর্যন্ত খুলতে পারছে না।

নীলিমা বৌদিকে ফোন করলো একটা। বৌদি বললেন, আরে! ফুলে ফলে আমার ফ্ল্যাট ভরে গেলো, ওয়াইন এসেছে এক ঝুড়ি। তুই কোন্ জার্মান বিজনেস ম্যাগনেট-এর সঙ্গে প্রেমে পড়লি রে? ফ্রাঙ্কফুর্ট এর সবচেয়ে এক্সপেনসিভ ফ্লোরিস্ট এর দোকান থেকে ফুল এসেছে। রেয়ারেস্ট ওয়াইনস্। তোর দাদা থাকলে এখানে, সব নিজেই নিয়ে নিতো। বলতো, ওয়াইন্ এর কদর ইয়ারোপের লোকেরাই করতে পারে। তোর উপরে এ সব ওয়েস্ট!

তা সবই দাদার জন্যেই রেখে দাও। দুই দিলীপদাকে ভাগ করে দিও।

তা না হয় হবে।

কিন্তু পাঠালোটা কে?

সে কি? তুই নিজেই জানিস না?

না। এতো রহস্য-কাহিনীর মতো শোনাচ্ছে। তুমি কার্ডটা খোলো তো।

সে কী রে। তোকে কে পাঠিয়েছে ভালোবেসে। আমি খুলে পড়ব? প্রিন্স-ট্রিন্স হলে যদি আমিই এই বয়সে নতুন করে প্রেমে পড়ে যাই? তোর দাদার কী হবে?

ছাড় তো দাদার কথা! প্রেমের আবার কোনো বিশেষ বয়স আছে না কি? কলার খোসায় পা পড়ার মতো! পড়লে হড়কাতে হবেই।

মনীষা বললো আর উপায় কী বলো বৌদি? তোমার এখানে আসতে অথবা আমারও যেতে তো পনেরো-কুড়ি মিনিট লেগে যাবেই এই পীক আওয়ারে! কে পাঠালো তাই যদি না জানা যায়।

ধর। দেখি, খুলি। আরে! এ কী কাণ্ডরে! এ কোন্ প্রিন্স-চার্মিং লেখা আছে উইথ লাভ! অ্যাটিশ?

কিন্তু সে পাপিষ্ঠের নামটা তো বলবে?

বুকটা ধক করে উঠলো মনীষার। মুখে যতই সপ্রতিভতা ঝরাক না কেন!

বৌদি বললো, অ্যাটিশ! সে কে রে। জার্মান নাম বলে মনে হচ্ছে। রাশ্যানও হতে পারে। মনীষা বললো, অ্যাটিশ। তাই বলো বৌদি। বুঝেছি! সেই বদমাসটা। হতচ্ছাড়া।

কে? কে রে মনীষা?

ঐ একটা জার্মান প্লে-বয় না, না জার্মান ঠিক নয়। অস্ট্রিয়ান প্রিন্স টীরল্-এ বাড়ি। লানডানে মীট করেছিলাম। বিলিয়নীয়র। অনেক ব্যবসাও আছে। আমি আজই পালাবো এখান থেকে। বলে ফেলেই ভাবলো, সর্বনাশ হলো। পালিয়ে এসেই আবারও পালানোর কথা!

সে কী রে? তাহলে এখানে চলে আয়। পুলিশকে ইনফর্ম করবো?

না, না। আর একটু দেখি। তোমাদের জানাবো। দরকার হলেই জানাবো।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই রিমেনস্নাইডার আবার ফোন করে বললো, আর উ্য কম্‌ফর্টেবল? আমাকে হেফফ্‌নার এক্ষুনি ফোন করে বললো যে আমার সঙ্গে তোমার মীটিং-এর দরকার নেই। মানে, তুমি যে জন্যে এখানে এসেছিলে। তোমরা গত ছ মাসে যা এক্সপোর্ট করেছিলে তার দশগুণ বেশি মাল আগামী ছ মাসে কোরো। সেম এফ. ও. বি. প্রাইসে। তোমার সঙ্গে আমার মীটিং শেষ হলো। ও আর একটা কথা। ইনসপেকশান কিন্তু জিনিভায় সার্ভেল্যান্সকে দিয়ে করতে হবে। এস. জি. এস. জিনিভা। ওদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ার যে কোম্পানীর এগ্রিমেণ্ট আছে সেই কোম্পানী করলেও হবে। রাখলাম। রিল্যাক্স ম্যাম। পরশু সকালে ঠিক সময়ে গাড়ি যাবে তোমাকে এয়ারপোর্টে পেঁছিতে। টেক ইওর ওন টাইম অ্যাণ্ড এনজয়। তোমার গাড়ি হোটেলে পেঁছেও গেছে। রিসেপশানে বললেই হবে। চব্বিশ ঘণ্টা একটি সোফার ড্রিভন মার্সিডিস হোটেলের পার্কিং লটে থাকবে তোমার জন্যে। গুটেন-মর্গেন ম্যাম্‌। তিনজন সোফার শিফ্‌ট-ডিউটিতে থাকবে।

বলেই, রিমেনস্নাইডার লাইন ছেড়ে দিলো।

ও ধপাস্‌ করে বসে পড়লো সোফাতে সারা দিন স্কুল করা নিচু ক্লাসের আলুথালু ছাত্রীর মতো। ওর বুদ্ধি যতো, সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। বুদ্ধি ওর কিছু কম নেই বলেই জানতো। কিন্তু ··। জড়ো করতে সময় লাগবে।

মনীষা ভাবলো, এবার সবচেয়ে আগে যা করা দরকার তা হচ্ছে অতীশের চিঠিটা পড়া। এই চক্রান্তর কারণটা কী তা জানতে হবে। ভাগ্যিস নীলিমা-বৌদি অতীশ নামটা বুঝতে পারেনি। জার্মানীতে পরিচিত বাঙালীদের একে অন্যে সকলেই চেনে। ঐ ফুলের দোকান থেকে ফুল কিনে আর প্রচণ্ড এক্সপেনসিভ রেস্টুরেন্ট-ওয়াইনস দিয়ে ডালি সাজিয়ে দেওয়ার মতো বাঙালীর সংখ্যা ওখানে বেশি নেইও। তাই বেচারী নীলিমা বৌদি ভেবেছে মনীষার কোনো জার্মান বিজনেস কানেকশান হবে হয়তো। কিংবা কোনো কোম্পানীর নাম!

ভুলে যাবার আগে আরেকবার ফোন করার কথা ভাবলো নীলিমা বৌদিকে ওগুলো ওকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। তারপরই ভাবলো, অতটুকু বুদ্ধি ওঁর আছে। তাছাড়া ওঁরও সোফার-ড্রিভন গাড়িও যখন আছে।

এবার আর সময় নষ্ট নয়। স্যুটকেসটা খুলে পায়জামা আর টপটা বের করে বেডরুমে ঢুকে সব জামাকাপড় খুলে বাথরুমে গেল মনীষা অতীশের চিঠিটা নিয়ে। যাবার সময় নিজের মুখোসটাকেও খুলে ফেলে একেবারে নিরাবরণ হয়ে গেলো। গরম ও ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে ক্রীস্টালের ট্রানসপারেণ্ট বাথটাব এর দুটি কল খুলে পেপার-কাটারের অভাবে হাত দিয়েই চিঠিটা খুলে বাথটাবে শুয়ে পড়লো।

যদিও সিংগাপুরের হোটেল থেকে অনিয়ন-স্কিন পেপারে লিখেছে অতীশ তবুও রীতিমতো ভারী চিঠি।

কী চমৎকার বাংলা হাতের লেখা! ভাবা যায় না! মুগ্ধ হলো মনীষা। ক লাইন পড়তেই বুঝলো, হাতের লেখা; যাঁরা সাইনবোর্ড লেখেন দেরও চমৎকার হয়। কিন্তু হাতের লেখা আর লেখার হাতের এমন মনিকাঞ্চন গ বড় একটা হয় না।

"মনীষা, ব্যাংকক

ক্যুরিয়ার-সার্ভিসে পাঠানো এই চিঠি, আমার অনুমান, তোমাকে যাঁরা রপোর্টে রিসিভ করতে আসবেন (দিলীপ রায়চৌধুরী অথবা দিলীপ টার্জী) নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টেই তোমার জন্যে নিয়ে আসবেন। ং তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে আমি ও'দের ঠিকানা কী করে জানলাম ভেবে।

কী করে জানলাম, তা নাইই বা জানলে। তবে বুঝতে নিশ্চয়ই পারছো তোমার চেয়ে আমার অর্গানাইজেশান অনেক এফীসিয়েণ্ট। লানডান-এ কোন হোটেলে ছিলে তাও আমি জানতাম। কিন্তু ফোন করিনি ইচ্ছে রই। ফোন করলে সকালবেলার এই প্রেজেণ্ট অথবা আনপ্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ মাকে দিতে পারতাম না।

এই অবধি পড়েই মনীষা ভাবলো অতীশ বড়ই ফাস্ট-ওয়ার্কার। আর মি' সম্বোধন করে লেখার অধিকার সে কী করে পেলো কে জানে!

"তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো, মানুষটার সাহস তো কম নয়! 'তুমি' সম্বোধন রছে!"

অস্বীকার করবো না যে, আমি দুঃসাহসী। আর যাই হোক সাহসের ভাব নিয়ে সারা পৃথিবীতে এতো বড় ব্যবসা চালানো যায় না। সাহস মারও আছে, স্বীকার করি। নইলে ভারতবর্ষের মতো জায়গাতে একজন য়ে হয়ে তুমিও এত বড় ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য চালাতে পারতে না। আমাদের শে মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়েও বয়সে তিরিশের নিচে থেকেও হাঙ্গর-রীর অধ্যুষিত পরিবেশে এতবড় ব্যবসা তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারতে না। মিও হাঙ্গর।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই বলে যে, কলকাতার বি-বি-ডি-বাগে যতরকম এবং তসংখ্যক মাংসাশী হিংস্র শ্বাপদ আছে তা ভারতবর্ষের কোনো জঙ্গলেও নেই। থাটা শুধু আমাদের দেশের বড় বড় শহরের ব্যবসা-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে নয়, থিবীর প্রত্যেকটি বড় ব্যবসাকেন্দ্রিক শহরগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

আমিও অনেকই হিংস্র জন্তুর মধ্যে একজন। প্রতিযোগীকে ঘাড় কামড়ে চুষে খেয়ে চিরদিনই আমি এক গভীর আনন্দ পেয়েছি। প্রতিযোগীর ঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে নভোস্থল থেকে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে যেতেও মার কখনও দ্বিধা হয়নি।

কিন্তু আমি একাই নই। তুমিও আমারই মতো। আমি বড় হাঙ্গর। মি আমার চেয়ে একটু ছোটো। আমার মতো মানসিকতা তোমারও। নইলে

বেঁচে থাকতেই পারতে না এই নির্মম প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে। যে বহাল-তবিয়তে বেঁচে আছো এবং তোমার ব্যবসা ক্রমশই বড় করে তুল তাতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে তুমিও ভ্যাম্পায়ারের মতো প্রতিযোগীর রক্ত খে ভালোবাসো।

আমরা হয় বাঘ নয় হাঙর। কিন্তু আমি এই ক্রমাগত যুদ্ধের খে মেতে থেকে যুদ্ধের দামামার শব্দে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বোধহয় ভুলেই বে বসেছিলাম যে হাঙর কিংবা বাঘেরাও তাদের প্রজাতির অন্য কারো স প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রাপ্তবয়স্ক হলে মিলিত হয়। হাঙর অথবা বাঘও নিজের প্রজাতির অন্য লিঙ্গের কারো সঙ্গে সহবাস করে। সংসার পাতে ক দিনের জন্য। ঘাড় কামড়ে ধরে মিলনের সময়। তখন সে কামড় প্রাণহর জন্যে নয় মিলনের আনন্দকে তীব্রতর করার জন্যেই।

মনীষা, অতীশ সরকার এতোদিন ভাবতো যে সে তার ব্যবসাকেই সব বেশি ভালোবাসে। তার জীবনে প্রেম বা বিবাহের মতো মুখামি অ বিলাসিতার সময় কখনওই হবে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হও পরমুহূর্ত থেকেই আমি নিজেকে নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছি। ব্য আমার মাথায় উঠেছে। সমস্তক্ষণ শুধু তোমার কথাই ভাবছি। হঠাৎই বুঝতে পারছি যে, জীবনে ব্যবসাই সব নয়, টাকা, সম্পত্তি, মান, যশ, ক্ষমত শেষ কথা নয়। প্রত্যেক প্রাণীর এবং নদীরও গতিস্রোতার মধ্যে গন্তব নিহিত থাকে। যাত্রা প্রত্যেকেরই ফুরোয় একসময়। এই ফুরিয়ে যাও দুঃখের নয়। নদী যখন সাগরে গিয়ে মেশে তখনই তার যাত্রা সার্থক পরিপূর্ণ; পরিপ্লুত হয় সে। আমার পথ চলা এ জীবনের মতো সাঙ্গ ক সময় এখনও হয়নি। তবে যতি চিহ্নর সময় হয়েছে। তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারলে, তোমাকে নিয়ে ঘর না বাঁধতে পারলে আমার এই গন্তব্যহ চলাকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিতে হবে।

মানুষ হিসেবে, আমার কারো কাছে হারবার সময় এসেছে। বুঝ পারছি যে জীবনে কোনো কোনো হার অনেকেই বড় বড় জিত-এর চে অনেকই বেশি দামী। এবং এই হার স্বীকারের প্রকৃত মূল্য যারা না বো জীবনের পথে কোনো ছায়াচ্ছন্ন রম্য বাঁকে এসে নিজেকে যে পথশ্রান্ত পা বলে না মনে করে, না বোঝে যে কারোও কোলে মাথা দিয়ে ক্ষণিক বিশ্রামে অবকাশ পেয়েছে সবক্লান্তি অপনোদনের তার যেমন করেই হোক করা উচিত ত বলতে হবে যে সে বড়ই অভাগা।

তেমন কোনো মানুষের খোঁজ সে যখন পায়, যে তার মনের মানুষ; ত মনুষ্যত্ব বোধ হয় তখনই সম্পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়। আমার মনে হ তোমাকে দেখার পর থেকেই আমিও আমার জীবনের পথে তেমনই কো বাঁকে এসে পৌঁছেছি।

আমার এই পথ অশ্বগুলি যাতে না হয়ে ওঠে, অন্য কারো হাতে হাত রে এই চলাকে যাতে আরও দুর্বার অর্থময় ও সুস্থির গন্তব্যর চলা না করে তুল পারি তাহলে সারা জীবনই শুধু পথের ধুলোতেই ধূলিধূসরিত হবো। কো

বন্ধনহীন প্রাপ্তিতে যদি পথের সাথীকে বাঁধতেই না পারি তাহলে এই চলা গতি সম্পূর্ণই নিরর্থক হয়ে উঠবে।

আমি জানি, যতটুকু তোমাকে জেনেছি তাতে; যে তুমি আমার হাতে ার হাত যে রাখবেই তাব কোনো স্থিরতা নেই। বেশির ভাগ মেয়েকেই তে আমার আধঘণ্টাও লাগেনি। মিথ্যে বলবো না, দেশে এবং বিদেশে জাতীয় নারীর সঙ্গে আমি সহবাস করেছি। ব্যবসার কারণে ছাড়া জীবনে আমি কখনও কারো সঙ্গেই মিথ্যাচার করিনি। আমি যা, তা াকে জানাতে চাই কিছুই না-ঢেকে। এই বহু জাতিক শব্দটিতে "জাত" চামড়ার রঙেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেকই রকম মানসিক স্তরের নারীর ও আমি বলছি। কিন্তু কখনও এমন অঘটন ঘটেনি যে কাউকে প্রথম নেই জীবনসঙ্গিনী করতে ইচ্ছা জেগেছে। কারো হাতে ঠোঁট ছোঁওয়াতেই ার স্কোয়াশ-খেলা ঋজু পাইনের মতো শরীরকে "উইপিং উইলোর" মতো পড়া মনে হয়েছে। অথচ নুয়ে-পড়ার মধ্যেও যে এতো গভীর আনন্দ সেদিনের আগে কখনও জানিনি।

তুমি হয়তো ভাববে যে আমি কী লজ্জাহীন, অভিমানহীন অথবা আত্ম নজ্ঞানহীন! তা হয়তো ভাববে। কিন্তু আমার চরিত্রে শিশুকাল থেকে দোষ কখনওই ছিলো না। এক ভয়। অন্যটি দ্বিধা। যখন আমি ফার্স্ট- রের ছাত্র, তখন আমার বাবা আমাকে একদিন ও'র ঘরে ডেকে নিয়ে বলে-

"এক জীবনে অগণ্য মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে, পরিচয় হবে; কাছাকাছি ব তাদের। কোনো পুরুষের মতো পুরুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। যখন মনে হবে যে, ঘর বাঁধার মতো কারো মুখোমুখি এসেছিস তখন জানাতে দ্বিধা করবি না যে তুই তাকে চাস। হাঁটু গেড়ে তার পায়ের কাছে বলবি "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" কাউকে ভালোবাসার কথা বলার নিজেকে ছোট করার কোনো ব্যাপার নেই। ঈশ্বর আর প্রেমিকের নতজানু হলে মানুষের সম্মানই বাড়ে। আত্মা শুদ্ধিকর যা, তা করতে ও দেরী করিস না। ভয়ও পাস না।

কানো নারীর কাছে নতজানু হয়ে "আমি তোমাকে ভালোবাসি" বলার পর নারী দুটির মধ্যে একটি জিনিসই করতে পারে। তার বেশি ঘটনীয় আর ই নেই: হয় সে তোকে তার মৃণালভুজে টেনে নেবে, নয় সে তোর পদাঘাত করবে।

লেছিলেন, 'জীবনে সততার কোনো বিকল্প নেই। অন্তত কিছু কিছু বে। ব্যবসা করতে নেমে সবসময় সততা নিয়ে চলে না। প্রতিযোগী লে তার সঙ্গে শঠের মতোই ব্যবহার করবি। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। তার ভালোমানুষী করা মানে মৃত্যু। হেরে-যাওয়া। কিন্তু প্রেমের বেলায় প্রাণের পরম নৈবেদ্য কোনো নারীর কোমল হাতে সততার সঙ্গে তুলে। গ্রহণ করলে তো তুই ধন্যই হলি। গ্রহণ না করলেও ছোট হয়ে গেলি ভাবিস না। সৎ-প্রেম নিবেদন করলে আত্মাই উজ্জ্বলতা পায়।'

মনীষা, আমিও বিশ্বাস করি যে, দুঃখ না পেলে মানুষ পূর্ণতা পায় না। দুঃখ পেলে, পাবো। দুঃখের বা মিথ্যে অহমিকাভরা অভিমানে ঘা লা... ভয় যে করে তার দ্বারা আর যাইই হোক শুদ্ধ প্রেম কখনওই হয় না।

"মনের মানুষ' কারো জীবনেই বার বার মুখোমুখি আসে না। এ... তাকে চিনতে ভুল করাটা বোধহয় পরম মূর্খতা। তার জন্যেই প্রতীক্ষা ক... ছিলাম।

আমার মনে হয় যে-মানুষ নিজে যে-মানসিক স্তরের তার কখনওই অ... কাউকে বিকল্প করা অনুচিত। এই স্তর বলতে আমি অর্থনৈতিক, জাতিগ... সামাজিক পরিচয়গত স্তরের কথা বলছি না। আশা করি তুমি বুঝবে মান... স্তর বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি। ভিন্ন স্তরের মানসিকতার এক... পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে কখনও কখনও; সে প্রেম, ... নয়। হঠকারিতা, করুণা, দয়া বা অনুকম্পাই মাত্র। এই সব অনুভূ... নির্ভর প্রেম আসলে মোহ। মোহর বিভিন্ন স্তর। তার আয়ু অত্যন্ত স্বল... স্বল্প বলেই আমাদের দেশে পর্যন্ত ডিভোর্স এর সংখ্যা এতো বেড়ে গেছে।

বাবা এও বলেছিলেন যে, "আমি জাত মানি না, দেশ মানি না, ... মানুষ মানি। তুই আমার একমাত্র সন্তান। তোর সুখই আমার সুখ... যাকে হাতে ধরে তোর বলে আনবি আমি তাকেই বরণ করে নেবো। তার... আমি শোবোও না, সংসারও করবো না আমার মতামত এই ব্যাপ... ইমম্যাটেরিয়াল।"

জানো মনীষা। বাবা চলে গেছেন আজ দশ বছর হলো।

আমারও বয়স পঁয়ত্রিশ হলো। দেখায় হয়ত কম।

তোমাকে সেদিন অফিসে নামিয়ে দিয়ে আমি আবার হোটেলেই ফি... গেছিলাম। অফিসে আর যাওয়া হয়নি সেদিন। ব্রিফ-কেস্-এ বাবার এ... ছবি থাকে সবসময়। বাবার ছবিটিকে বের করে মাথায় ঠেকিয়েছিল... জানি না তুমি আমার হবে কী না। হলে, আমার বাবার মতো খুশি ... কেউই হতেন না তোমাকে দেখে। তুমি নিজস্ব অধিকারেই রাজকুমারী। কি... তোমায় রাজরাণীও হতে হবে।

আমি ঈশ্বর মানি, এই সুপার-কমপ্যুটারের যুগে। এবং নিজের কারখা... কমপ্যুটার তৈরী করার পরও। ঈশ্বরের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নে... বিজ্ঞানই ঈশ্বরবোধ আমার মধ্যে গভীর করেছে। এই বোধ সকলের ম... প্রত্যাশার নয়। "ভগবান টগবান মানি না" বলাটা হয়তো অতি-সপ্রতিভ... লক্ষণ। কিন্তু ঈশ্বর আর চালতাথের ভগবান সমার্থক নয়। আশা... তুমি বুঝবে কী আমি বলতে চাইছি। তোমাকে দেখার পর থেকেই আ... মনে হয়েছে ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে, আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হই। স্বামী... হিসেবে।

ছাত্রাবস্থায় 'এডগার অ্যালান পো' আমার অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলে... ওঁর সম্বন্ধে পরে একটি লেখা পড়ে অনেক কিছু জেনেছিলাম। যা জেনেছি...

তার সাক্ষ্য দেয় তাঁর লেখা। এডগার অ্যালান পো'র কাছে "Art meant only beauty and true beauty always contained an element of strangeness or vagueness"। ও'র সমসাময়িক আমেরিকান লেখকদের থেকে তিনি অনেকই অন্যরকম ছিলেন। ব্যোদলেয়রের মতো বড় কবিও বলেছিলেন. "He is a saint"! আজও পো'কে ফরাসীরাই বেশি সম্মান করেন আমেরিকানদের চেয়ে। তুমি হয়তো জানো। হয়তো সাহিত্য "কী" এবং "কেন" তা ফ্রেঞ্চরা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝেন বলেই।

তোমাকে প্রথম দিন দেখেই, বাদল দিনের মেঘেরই মতো তোমার মুখের মধ্যে রোদ আর ছায়া খেলতে দেখেই, তোমার ব্যবহারের ও আমার প্রতি মনোভাবের অতি দ্রুত পরিবর্তন ও পুনঃপরিবর্তন দেখে আমার পো'র লেখার কথা মনে হয়েছিল। তুমিও আমার চোখে "Concept of strangeness and vagueness" এবং সেই জন্যেই সৌন্দর্যরও সংজ্ঞা। তুমি আমার কাব্য।

ইবসনের পরেই নরওয়েজিয়ান লেখকদের মধ্যে ন্যুট হামসুন সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। তুমি আমার চেয়ে ভালো জানবে। ও'র সম্বন্ধে যেমন বলা হয়, "He had a superb contempt for everything that was not of aesthetic value in his own eyes।"

আমারও দৃষ্টিভঙ্গী হুবহু ন্যুট-হামস্যুনেরই মতো। তবে তফাৎ এই যে, আমার আখরগুলি সোনা হয়ে উঠবে না কখনও। ন্যুট হামসুন সম্বন্ধে বলা হতো "Words were gold in his hands"! তবে আখরগুলি নয়, আমি নিজেই হয়তো সোনা হয়ে যেতে পারি যদি তুমি আমাকে একটিবার ভালোবেসে ছুঁয়ে দাও।

ভালো থেকো
ইতি তোমাকে বউ-করতে চাওয়া
অতীশ।"

॥ ৪ ॥

বাথ টাব্-এর জল মনীষার সমস্ত শরীরকে উষ্ণতায় জড়িয়ে নিয়েছিলো। মনীষা দুটি চোখই বুঁজে ফেললো। তারপর বাথটাবে উঠে বসে চিঠিটা বেসিনের পাশে রাখলো। তারপর আবারও জলের গভীরে ডুবিয়ে দিলো সমস্ত শরীরকে। শুধু মাথাটি জেগে রইলো। শরীরে গভীর ঘুম। স্বপ্ন ভরা ঘুমের ফেনাতে শরীর পিছল হয়ে গেলো। ডুবে গেলো সমস্ত শরীর। শুধু মাথাটি জেগে থাকলো।

একটি "ছোটো হাঙর" সাঁতরে আসছে দূরের নীল সাগর থেকে। দূর সমুদ্রর নোনা গন্ধে, সীগালের বিধুর তীক্ষ্ণ ডাকে ওর নাক ও কান ভরে গেলো। দুটি চোখ ভরে এলো জলে।

স্বপ্নর মধ্যেই টয়লেটের টেলিফোনটি বেজে উঠলো। ঘণ্টা বাজলো। পাগলা-ঘণ্টি বাজলো মস্তিষ্কর মধ্যে। জল-ভেজা, রক্তাভ নগ্ন শরীরের ডান হাতটি বাড়িয়ে ফোন ধরবার জন্যে বাথ-টাব্ ছেড়ে এক ঝটকায় উঠতে যেতেই জল চলকে পড়লো টয়লেটের মেঝেতে।

ছিঃ।

মনীষা বকলো নিজেকেই।

এবং হয়তো যতীশকেও।

টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছিলো।

মেঘলা দুপুরের কামাতুর কবুতরের মতো।

স্বপ্নের দেশের জন্য

এখন তো আকাশ খুবই পরিষ্কার। আমাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েই উত্তরের আকাশে মেঘের মধ্যে মধ্যে শেষ বিকেলের আলোতে কাঞ্চনজঙ্ঘার রেখা ঝিলিক মেরে উঠছে দেখতে পাই আজকাল। শরৎকাল। পুজো সবে শেষ হয়েছে। সকালে মাঠ-প্রান্তর শিশিরে ভিজে যাবে। কেন্নো মাটি কুরে-কুরে হেঁটে যায় তার অসংখ্য পায়ে ভোরের শিশিরে-ভেজা নরম মাটিতে। শামুক একবার পেছিয়ে একবার এগিয়ে শুঁড় উঁচিয়ে হাঁটে কালো কুলফি মালাইয়ের মতো। মৌটুসকি পাখি শিউলি ফুলের গাছে টুসকি মেরে বেড়ায়। সন্ধের অন্ধকারে বাদুড় ভেসে যায় কালো থেকে কালোতর বিন্দুর মতো স্থির আকাশে। সপ্‌সপ্‌ শব্দ করে, শিশিরের আর ধানের আর রাতের গন্ধ-মাখা তার বড়-বড় অন্ধকার ডানায়। হুতোম পেঁচা ডেকে ওঠে আলুখেতের পাশের ঝাঁকড়া গাছের ডাল থেকে।

ঠাকুমা বলেন, "সুনীল আসে নাই? ও বউমা?"

মা রান্নাঘর থেকে বলেন, "না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ঠাকুমা।

আমি বলি, "রানা প্রতাপ কি শিবাজির গল্প বলো ঠাকুমা।"

কিন্তু ঠাকুমার মন পড়ে থাকে অন্য কোথাও। আজ গল্প বলার ইচ্ছে নেই।

"তোমারে কী কইয়া গেছিল যাওনের আগে, বউমা?"

ঠাকুমা আবার শুধোন মা'কে।

"কই, কিছু তো বলেনি। যাবার সময় শুধু বলেছিল, ক'দিন না ফিরলে চিন্তা করবেন না।"

ঠাকুমা আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, "জ্বালাইয়া খাইল পোলাডায়। এত মা আছে দ্যাশে। কারও পোলায় তার মায়েরে এমন জ্বালায় না। গ্যাছে সেই গত সোমবারে, আর আজ শনিবার হইয়া গেল গিয়া। কী আর কমু। আর কমুই বা কারে? কোথায় যায়, কী করে, সেই জানে।"

মা বলেন, "ওর যে অনেক মা, মা।"

"হু, সেই লইগ্যাই তো জন্মদাত্রী মায়ের এমন মরণ।"

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে দূরে থেকে বাঁশবনের স্বপ্নময় অন্ধকার ভেদ করে সেজোকাকুর গলার গান ভেসে এল; "বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ/কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!"

গলায় উত্তেজনা লাগল। ঠাকুমা বললেন, "ওই যে, ছাওয়াল আইতাছে।" ঠাকুমা আবার রাগ-মাখা ভালবাসার গলায় গলা তুলে বললেন, "বোঝলা বউমা, আইতাছেন তিনি।"

একটু পরই দুটি হাঁটানো সাইকেল হাতে ধরে শূন্যে-ঘোরা প্যাডেলের কিরকির্ র্-র্ আওয়াজের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে চ্যাগারের দরজা খুলে এগিয়ে এসে সেজোকাকু বলল, "মা, দ্যাখো কাকে এনেছি।"

ঠাকুমা আমার হাত ধরে লণ্ঠনটা নিয়ে বড় ঘরের বারান্দাতে এলেন তাড়াতাড়ি। "কারে আনছস্? কে রে? সঙ্গে কে?"

ঠাকুমা চোখে আজকাল ভাল দ্যাখেন না, কানেও ভাল শোনেন না।

"আমি মাসিমা।" বলে গানুকাকা ঠাকুমাকে নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

"ও, গানু। তুই আছিলি কই এতদিন? কোন্ তল্লাটে?"

"কাজে গেছিলাম মাসিমা।"

"ছাড়ন দে তোদের কাজ। কাজ না, সব অকাজ। কলেজ ছাইড়্যা দিলি, চাকরি-বাকরি, খেত-খামার কিছুই না কইর‍্যা শুধু দ্যাশসেবা করতাছিস সুনীলেরই মতো। দ্যাশ তোদের দিবেটা কী রে? দ্যাশ স্বাধীন হইলে কি সোনার থালায় ভাত খাওয়াইব তগো ন্যাতারা? দেখবিআনে তারাই তখন ফুটানি মাইর‍্যা বেড়াইতেছে। তগো কথা আর কেউ মনেই রাখব না।"

"দেশ দেবে, দেবে। নিশ্চয়ই দেবে। দেশ দেবে না তো কে দেবে মাসিমা? দেশই তো মা। দেশকে যেদিন স্বাধীন করব আমরা, সেদিন দেখবেন এই দেশে সোনা ফলবে। ওই সাদা চামড়াদের একবার তাড়াই না। তারপর দেখবেন, এই বাংলা সোনার বাংলা হবে।"

বলেই গানুকাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডান হাত উঁচু করে যাত্রার বিবেকের মতো খোলা গলায় আবৃত্তি করল, "বল বীর, বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমার নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।"

সেজোকাকু নিজের ঘরে যেতে-যেতে চেঁচিয়ে বলল, "বউদি, গানুও খাবে কিন্তু।"

"জানি। থাকবে যখন, খাবে না? ও কি পর?" মা বললেন।

"ও বউদি, বাইরে একটু আসুন। কতদিন আমার সুন্দর বউদিকে দেখিনি।" গানুকাকু বললেন।

গানুকাকুকে রাজপুত্রের মতো দেখতে ছিল। আর খুব রসিক। গলার স্বরও ছিল ভারী মিষ্টি। চমৎকার গান গাইত। আবৃত্তি করত।

মা বললেন, "ঢং করতে হবে না। কত্ত টান বউদির উপরে! টান থাকলে দিনে-রাতে বনে-বাদাড়ে এমন করে ঘুরে বেড়াতে না। বউদির কাছে লক্ষ্মী-ছেলের মতো বসে একটু গানটান শোনাতে।"

"আর ক'টা দিন সবুর করুন বউদি। বুকের রক্ত দিয়ে যে স্বাধীনতা না পাওয়া যায় সে স্বাধীনতা তো থাকে না বউদি! ইতিহাস তাই-ই বলে। তাই তো .."

"তোমাদের ওসব কথা বুঝি না। কী খাবে তাই বলো।"

"কী খাব? আজ হাঁসের ডিমের ঝোল খেতে ইচ্ছে করছে খুব। আমি কিন্তু আটটা ডিম খাব ঝোলে। তোমাদের সেই ছাইরঙা হাঁসটা এখন ডিম দিচ্ছে না?"

মা বললেন, "হাঁস তো আর গিনিপিগ নয়।"

"তা বটে! তবে ছাইরঙা, সাদারঙা, কালোরঙা সবরঙা হাঁসের ডিম একসঙ্গে করেই ঝোল করো। আমি কিন্তু আটটাই খাব। কমপক্ষে আটটা ডিম না খেলে খাওয়া হল বলে মনেই হয় না। সুনীলের জন্য থাকল কি না-থাকল তাতে আমার বয়েই গেল।"

"আমরা মাংসও খাব।" মেজোকাকু বলল।

"মাংস? মাংস কোথায় পাব এই রাতে?" মা বিব্রত হয়ে বললেন।

সেজোকাকু বলল, "মাংস আমরা নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। আজ গানু আর আমি জংলাশিবের মন্দিরে পাঁঠাবলি দিয়েছিলাম বিকেলে। চামড়াটা ভাল ছাড়ানো যায়নি। লোম-টোম লেগে থাকতে পারে একটু। তিন চার সের মতো আছে।"

সেজোকাকু চট করে বাইরে গিয়ে কচুপাতায় মোড়া একটা মস্ত বাণ্ডিল নিয়ে এসে মা'কে দিল। বাইরে কোনও ফোকরে টোকরে লুকিয়ে রেখেছিল।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখেছ, এই রাত্তিরে কী ঝামেলাতেই ফেললে। আমি কী করি? আর টাকা পেলে কোথায়?"

"হাঃ। নিজের টাকায় যে পাঁঠা খায়, সে সবচেয়ে বড় পাঁঠা। এটা হারান ঘোষের পাঁঠা। মাঠে চরছিল, বডি থ্রো দিয়ে ধরল গানু, যেন হারাগাছার টিমের পেনাল্টি কিক আটকাচ্ছে।"

গানুকাকু বলল, "রেঁধেই দাও বউদি।" তারপর গলা নামিয়ে বলল, যাতে ঠাকুমা শুনতে না পান, "আজ রাতের খাওয়াই হয়তো শেষ খাওয়া।"

আতঙ্কিত গলায় মা বললেন, "সে কী! কেন?"

"সে আপনাকে পরে বলব।" গলা আরও নামিয়ে গানুকাকু বলল।

মা বললেন, "তোমার দাদা পড়ে আছেন কলকাতায়। তাও আবার সরকারি চাকরিতে। আর তোমরা যে এখানে কী করে বেড়াচ্ছ, তা বুঝি না। ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

"ভয় পাবে কেন বউদি? তোমরা হলে মায়ের জাত। তোমরাই তো

আমাদের সাজিয়ে দেবে। তা ছাড়া, এইটাই তো এখন আসল কাজ। দ্যাখো, আমরা ইংরেজদের মেরে তাড়াব।"

ঠাকুমা বললেন, "তোরা ফিসফাস কইর‍্যা কস্ কী ?"

গানুকাকু বলল, "এই তো মাসিমা! পগার দিঘিতে কাগাদা দেড়মনি বোয়াল ধরেছে বত্রিশ ঘণ্টা হুইলে খেলিয়ে-খেলিয়ে, সেই গল্পই করছিলাম বউদিকে।"

গানুকাকুর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। গানুকাকু এমনই করে সব সময়। সব সময় হাসে, লোককে হাসায়।

ঠাকুমা কিছু বুঝতে না পেরেই হেসে বললেন, "তাই ক'। আমি ভাবি বুঝি…"

কী যে ভাবেন তা আর না বলে ঠাকুমা বললেন, "যাক, তোরা ঘরে ফিরে আইছস, আমি আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাইবনে। দুগা খই আর দুধ খাইয়া আমি শুইয়া পড়ুম। ভাল কইর‍্যা খাস কিন্তু গানু। তোগো চিন্তায়-চিন্তায়ই আমার পরানডা যাইব।"

"আপনি ভাববেন না, মাসিমা। আমরা স্বাবলম্বী। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা জানেন তো মাসিমা, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'।"

মা বললেন, "এবার বীরেরা দয়া করে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মাংসটা কেটেকুটে আমাকে সাহায্য করো তো দেখি একটু। সব আমি একা পারব না। কাজের লোক এত রাতে তো একজনও নেই। আমি তো ঋভু আর আমার জন্যে খিচুড়ি রাঁধছিলাম। তখন কি জানি যে, মহামান্য অতিথিরা সব এসে পড়বেন।"

"আসছি বউদি," বলেই দুজনে কুয়োপাড়ে চলে গেল।

সেজোকাকু আমাকে বলল, "এই ঋভু, লণ্ঠনটা সরিয়ে মায়ের ঘরের বারান্দায় নিয়ে যা তো। কী সুন্দর চাঁদের আলো।"

গানকাকু বলল, "লক্ষ্মীপুজো যেন কবে ? ও বউদি ?"

"লক্ষ্মীপুজো এ-বাড়িতে হবে না। অলক্ষ্মীর বাহন তোমরা সব মূর্তিমান। তোমাদের জ্বালায় আমি মরলেও বেঁচে যেতাম।"

"ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা! এমন সুন্দর রাতে অমন কথা বলতে নেই। আমরা এই এলাম বলে চান করে।"

আমি রান্নাঘরের দাওয়ার এক কোণে বসে কাকাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকলাম।

কুয়োতে বালতি নামিয়ে কপিকলে ক্যাঁচর-কোঁচর আওয়াজ তুলে ঝপাঝপ করে জল ঢেলে চান করল সেজোকাকু আর সেজোকাকুর বন্ধু। গানুকাকুদের বাড়ি নীলফামারিতে। কিন্তু ওঁর মা থাকেন গোয়ালপাড়ায়। পড়াশুনো করত গানুকাকু সেজোকাকুর সঙ্গেই রংপুরেরই কারমাইকেল কলেজে।

সেজোকাকু চেঁচিয়ে বলল, 'যা ঋভু, দুটো ধুতি নিয়ে আয় তো আমার ঘর থেকে। দ্যাখ, আলনাতেই ঝুলছে। পাঞ্জাবিও আনিস।'

"শীত করছে রে সুনীল। হিহি।" গানুকাকু বলল।

সেজোকাকুর ঘর থেকে ধুতি আর পাঞ্জাবি নিয়ে কুয়োতলার দিকে যেতে-তে আমি শুনলাম সেজোকাকু বলছে, "গানু, গুলিগুলো তাজা তো রে?"

"একেবারে তাজা। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

"দেখিস, শেষে শিকল না পড়ে হাতে।"

গানুকাকু গামছা দিয়ে গা মুছতে-মুছতে গান গেয়ে উঠল: "তোর শিকল ায় বিকল করবে না / তোর মারে মরম মরবে না / তাঁর আপন হাতের ছাড় ি সেই যে / আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে / তোদের ধরা আমায় াবে না।"

গানটা শুনে ঋভু অবাক হয়ে গেল।

"ডিনামাইটের বাক্সটা কোথায় লুকিয়ে রেখে এলি?"

"যেখানে বলেছিলি।"

"বেনসন-সাহেব কাল ঘোড়ামারির হাটে আসবে তো রে? ঠিক জানিস?"

"ঠিক জানি। জিবু-পাগলা আমাদের পুলিশের টিকটিকির চেয়ে দড়। ওর র পাক্কা খবর।"

"হেডমাস্টারমশাইকে পুলিশ-সাহেব বেনসন হাটের মধ্যে সত্যিই নিজের তে বেত মারবে?"

"হ্যাঁ, যাতে কোনও ছেলেই ভবিষ্যতে আর ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না র। অন্তত ঘোড়ামারি স্কুলের কোনও ছেলে! দেশের যে তারাই রাজা, মরা যে প্রজা, তারা যা বলবে সেটাই যে আইন, তারা যা করবে সেটাই যে ক, এ-বিষয়ে কারও যাতে কোনওরকম সন্দেহ না থাকে, সেই কথা নিশ্চিত ার জন্যেই সে স্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে হাটভর্তি লোকের সামনে বেত রে এ-কথা প্রমাণ করবে। টু সেট অ্যান এগজাম্পল টু দা মাসেস। দা লড্। দা নেটিভস।"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম এ-কথা শুনে।

গানুকাকু বলল, "বড় রাজা এসেছে রে! দিল্লিতে বসে মাখম মারছে আর শের লোকের এই দশা! আমি একজন ডিমওয়ালা সেজে হাটের মধ্যে ডিমের ুড়ি নিয়ে বসে থাকব। বেনসন এলেই তুই হেডমাস্টারমশাইকে বলবি, াস্টারমশাই, চলুন, খুব শস্তায় ডিম দিচ্ছে আমার এক চেনা লোক।' মানে, নসন যেন আমার কাছ অবধি হেঁটে আসে এইটুকু দেখিস তুই। মানে ডমাস্টারমশাই যেন আমার কাছে থাকেন মোক্ষম সময়টাতে।"

"অমন গ্যারান্টি দিতে পারি না। তবে চেষ্টা করব।"

"অত লোকের মধ্যে বেনসনকে গুলি করে তুই পালাতে পারবি?"

"আশা করি পারব। কিন্তু না পারলে মরব। কুকুরের মতো লাথি খেয়ে ালিয়ে যাওয়ার চেয়ে, সবরকম অন্যায়কে সহ্য করার চেয়ে মানুষের মতো াড়িয়ে মরা অনেক ভাল। আরে মরতে তো একদিন হবেই রে সুনীল। কোন্ নুষ কী করে মরল, সেটাই বড় কথা। কী রেখে গেল পেছনে, সেটাই

আসল।" তারপর বলল, "শোন্, তোর বোমা দুটো কিন্তু ফেলতে হ বেনসনের গাড়িতে। সে-সময়ে গুলি করব আমি। দেখিস, দিশি ড্রাইভারে যেন ক্ষতি না হয়। কনফ্যুশান ক্রিয়েট করতে হবে। যাতে আমি ভিড়ের মধে গা-ঢাকা দিয়ে ক্যানালে পৌঁছতে পারি। ওখানে গামা থাকবে ডিঙি-নৌকে নিয়ে।"

"শাসক এবং শোষকের পা যেসব মানুষ চাটে, 'স্যার' বলতে যাদের গল গদগদ হয়ে ওঠে, তারা মরলে কী যাবে আসবে? ওগুলো মানুষ নাকি? স মিরজাফর, কুকুর-মেকুর। রাজা, দেশে যেইই হোক না কেন, ওরা চিরদিনই পা চাটবে কুকুরেরই মতো, একটু সুখ, ঘাড়ে একটু হাত, একটু ডাল-ভাত, দুটে বিস্কুটের জন্যে।"

"তবু..."

"সে আমি বুঝব'খন।"

"অ্যাই রিভে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী শুনছিস রে?"

গানুকাকু খুব রেগে বলল আমাকে। তারপর বলল, "দ্যাখ, সুনীল।"

সেজোকাকু ঘাড় ঘুরিয়ে রাগের গলায় বলল, "কী শুনেছিস রিভে?"

আমি প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললাম, "কিছু শুনিনি।"

"শুনেছিস যে, তা আমি জানি। তবে কাউকে বলিস না কিছু য শুনেছিস।" গানুকাকু বলল।

সেজোকাকু বলল, "বললে খারাপ হয়ে যাবে।"

আমার বুক দুরদুর করে উঠল।

॥ ২ ॥

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মায়ের ঘরের দাওয়াতে মাদুর পেতে সকলে বসা হল। আমার ঘুম পেয়ে যাওয়ার কথা সে-সময়ে। পাচ্ছিলও ঘুম। কিন্তু সন্ধেবেলার উত্তেজনাতে তখনও মাথা ভোঁভোঁ করছিল।

ঠাকুমা ছেলেদের ঘরে ফেরার আনন্দে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

গানুকাকু বলল, ' বউদি, একটা গান শোনান।"

"দূর, আজকাল গানটান গাই না।"

"শোনান না। বন্দে মাতরম্ শোনান। আপনার গলাতে ওই গান শুনলে গা ছমছম করে আমার।"

আমার মায়ের গলা সত্যাই ভারী সুন্দর ছিল। মায়ের গান শুনলে আমার সব সময়ই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। আর এমন রাত। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না চারদিকে। লিচু গাছের পাতায়, জাম গাছের পাতায়, শিশির-ভেজা টিনের চালে-চালে শিশির রুপোর মতো গলে গেছে। দূরের জলপাই গাছটা শারদ জ্যোৎস্নায় মধ্যে মাথা-উঁচু প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে যেন আমাদের পাহারা দিচ্ছে। বাতাস নেই। কিন্তু সেই থম-ধরা রাতে নানা গাছ ও ফুলের হরজাই গন্ধ ঘাস-পাতা-ফুল-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা থেকে উপচিয়ে আসছে, ফলের বাগান থেকে, ফুলের বাগান থেকে, গোলাপ বাগান থেকে, কাগজি লেবুর সবুজ পাতাদের জ্যোৎস্না-মাখা সুগন্ধী সাদা রং থেকে। তক্ষক ডাকছে কুয়োতলায় পাশের সিঁদুরে আমের গাছ থেকে। মায়ের গা থেকে পাউডারের গন্ধ, ঠোঁট থেকে পান-জরদার বাস। ভারী সুন্দর রাত। কিন্তু গুলি, বোমা, বেনসন-সাহেব। ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করছে।

মা ধরলেন, "বন্দে মাতরম্।"

গানুকাকু বললেন, "বউদি, সপ্তকোটিকণ্ঠ থেকে গান।"

"কেন ?"

"গান না।"

মা থেমে গিয়ে আবার ধরলেন ঃ

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বানী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।
বন্দে······"

"আহা, সত্যি বউদি। আপনার এই গান শুনে নিজের এত তুচ্ছ প্রাণটা দেশের জন্যে দিয়ে দিতে একটুও ভয় করবে না কারও, যদি সে মানুষ হয়। মানুষের মতো মানুষ।"

"আপদ বালাই। তোমরা মরতে যাবে কোন্ দুঃখে এত তাড়াতাড়ি। বেঁচে থাকলে তবেই না দেশের আসল সেবা করতে পারবে। তোমার মায়ের কথা ভাবো না?"

"মায়ের কথাই তো ভাবি সব সময়। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। দেশও তো মা! বাঁচতে কার না ইচ্ছে করে বউদি। এমন সুন্দর আমার দেশ, এমন সুন্দর সব মানুষ, আপনার মতো বউদি, সুনীলের মতো ভাই, আমার মায়ের মতো মা, মাসিমা। তবু কখনও কখনও মরণ জীবনের চেয়েও জীবন্ত হয়ে ওঠে বউদি। জানেন!" বলেই সুললিত গলাতে আবৃত্তি করল, "এসেছে সে একদিন / লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ—/ জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।"

"রবীন্দ্রনাথ! থাক, ওসব মৃত্যু-টিত্যুর কথা গানু। তুমি গান গাও একটা। কতদিন তোমার গান শুনি না।"

"আমার গান না শুনে বরং শুনুন, যা বলি। আমার মুখস্থ আছে। আপনার এই বন্দে মাতরমের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে কী আছে। মনে আছে ?"

মা বেণীটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে দিয়ে বললেন, "মনে থাকে না আমার তোমাদের মতো।"

"শুনুন তবে বউদি :

মহেন্দ্র দেখিল দস্যু গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা ?"

ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি ? কার সন্তান ?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল। সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে। সে কেমন মাতৃভক্তি ?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহেন্দ্র। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি ? কার টাকা লুটিলাম ?

মহেন্দ্র। কেন ? রাজার।

ভবা। রাজার ? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার ?

মহেন্দ্র। রাজার রাজভোগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি ?

মা বললেন, "সত্যি ! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে যেন !"

সেজোকাকু বলল, "দেশ স্বাধীন যখন হবে, তখন বন্দে মাতরম্ আমাদের জাতীয়-সঙ্গীত হবে, দেখো।"

"জনগণমন অধিনায়কও হতে পারে," গানুকাকু বলল।

"যদি না হয় ? দেশ স্বাধীন হবার পর যারা দেশ স্বাধীন করল, দাম দিল সবচেয়ে বেশি, তাদের কথা দেশ ভুলেও যেতে পারে। শুনেছি নাকি দেশভাগ হয়ে যাবে ? স্বাধীনতার মানে কি ভিখিরি হওয়া ? আমাদের কেউ কি জিজ্ঞেসও করবে না একবার ?" মা চিন্তার গলায় বললেন।

"হলে বুঝতে হবে আমাদের দুর্ভাগ্য।" সেজোকাকু বলল।

গানুকাকু বলল, "দেশের মানুষরা সত্যিই মানুষ না কুকুর-মেকুর তা দেশ স্বাধীন হলেই জানা যাবে। যদি স্বাধীনতার যোগ্যতা আমাদের না থাকে তা হলে আবার আমরা পরাধীন হব।"

সেজোকাকু বলল, "যে গান সমস্ত দেশকে একসঙ্গে বাঁধল, কত মানুষে যে গান গেয়ে জেলে পচল, সেই গানকে বাদ দেওয়া যাবে ?"

"কে বলতে পারে ? আমরা তো সব মিরজাফরের দেশের লোক। মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করেই আমরা বেঁচে থাকতে ভালবাসি। ইংরেজ তাড়িয়ে আমরা

হয়তো অন্য কোনও জাত বা শ্রেণী বা মুষ্টিমেয় মানুষকে রাজা বানিয়ে দিয়ে, নিজেরা ভেড়া বনে গিয়ে, পরমানন্দে তাদের পা চাটব। পা চাটাই যাদের স্বভাব, তারা সাদা পা না পেলে কালো পা-ই চাটবে। ফাঁকি যাদের মজ্জাতে ঢুকে গেছে তারা নিজেদেরও মহোৎসাহে ফাঁকি দেবে। নিজের দেশ, নিজের স্বজনকে ঠকাবে। এ-দেশে মানুষ তো বেশি নেই বউদি। মানুষের আকৃতির জীবই বেশি। চরিত্রে তারা মানুষ নয়।"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, "তা ঠিক। তোমার দাদাকে তবে তোমরা ওই দলে ফেলো না।"

"না, দাদাকে আমরা জানি। দাদা তেমন মানুষ হলে কবেই আমাদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতেন। যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের অপরাধে দাদার চাকরি যেতে পারে, সে-কথা জেনেও তো কখনও আমাদের কিছু বলেননি দাদা। কোনওদিন না। বরং বলেছেন, তোদের জন্য আমি গর্বিত। তোরা যা পারিস, আমি পারি না।"

"তোমার দাদা কিন্তু তোমাদের চেয়ে দেশকে কম ভালবাসেন না।"

গানুকাকু বলল, "জানি। দেশসেবাও তো অনেকরকম হয় বউদি। ইংরেজের চাকরি করলেই যে ইংরেজের দাসত্ব করতে হবে তার কি মানে আছে?"

"সুনীল, এবার তুমি একটা গান গাও। অনেক রাত হল।"

সেজোকাকু একটা মস্ত হাই তুলল। বলল, "যেমন মাংসটা রেঁধেছিলে, তেমনই ডিমের ঝোল। কতদিন পরে ভাল করে খেলাম বউদি। এখন জম্পেশ করে ঘুম ছাড়া আর কিছুই হবে না আমার দ্বারা।"

গানুকাকু বলল, "আমার না হাঁসের ডিমের আঁশটে-আঁশটে গন্ধটা খুব ভাল লাগে, জানেন বউদি। মুরগির ডিমের ঝোল খেলে মনেই হয় না ডিমের ঝোল খেলাম।"

মা বললেন, "এবারে গান। তারপরে ঘুম।"

তারপরই ঠাকুমার ঘরের দিকে চেয়ে বললেন, "মা যে আজ কতদিন পর আরামে ঘুমোচ্ছেন তোমাদের দু'জনকে ঘরে দেখে!"

বলেই বললেন, "গানু তোমার মা কেমন আছেন?"

"জানি না! চিঠি পাইনি বহুদিন। এক মায়ের সেবা করতে গিয়ে আমার জন্মদাত্রী মায়ের খোঁজ রাখারই সময় পাই না।"

"সেটা অন্যায়।"

"অন্য মায়ের ওপরে যে আরও অনেক বড় অন্যায় ঘটছে অবিরত বউদি। জন্মদাত্রী মাকে দেখার জন্য তো আমার দাদা ও ছোট ভাই আছে। এই দুখিনী মাকে দেখার যে বেশি মানুষ নেই।"

"এবারে গানটা হোক!" মা বললেন।

"গান না বউদি। আপনার গানের পরে আর গান হয় না।"

"গাও, গাও।"

হঠাৎই গান-কাকুর বদলে সেজোকাকু গান ধরে দিল :

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥"

আমি বললাম, "এ গান কার লেখা মা ?"

মা বললেন, "কী রে বোকা ! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাও জানিস না ?"

॥ ৩ ॥

মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে তুললেন। বললেন, "শিগগির ওঠ। পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তোর সেজোকাকু আর গানুকাকুর কথা জিজ্ঞেস করলে কাউকে কিছু বলবি না। বুঝেছিস?" মা'র গলাটা রুক্ষ শোনাল।

দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে প্রথমে কিছুটা বুঝলাম না তারপরই ভাল করে চেয়ে দেখি বাড়ির চারপাশের বাঁশের চ্যাটারের পাশে-পাশেই একটু পরপর একজন করে হেলমেট-পরা রাইফেলধারী পুলিশ। মুজাফফর দারোগা উঠোনে দাঁড়িয়ে ঠাকুমার ঘরের বারান্দায় চেয়ারে-বসা ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলছেন। ঠাকুমা মাথা নাড়ছেন সমানে দু'পাশে।

দারোগা যেন কী বললেন ঠাকুমাকে।

ঠাকুমা বসে বসেই বললেন, "খুইজ্যা দ্যাখেন না।"

বলেই মাকে উদ্দেশ করে বললেন, "বউমা, তুমি আমার কাছে আইস্যা বসো। ঋভুকেও লইয়া আসো। পুলিশ বাড়ি সার্চ করব।"

মা আমাকে নিয়ে ঠাকুমা'র পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তখনও রোদ ওঠেনি। সবে পুবের আকাশ লাল হয়েছে। তার মানে এরা শেষ রাত অথবা মাঝ রাত থেকেই বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।

বাইরে থেকে জনাদশেক পুলিশ এল। সব ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজল। সেজোকাকুর ঘর থেকে একটি বড় ছোরা পেল। সেটা নিয়ে গেল।

দারোগা বললেন, "কোথায় গেছে বলে যায়নি? দুজনের কেউই?"

"হ্যাঁ।" ঠাকুমা বললেন। "ও তো কইয়্যা গ্যালো গৌহাটি যাইব। কাল বিকাল বিকালই বারাইল। পার্বতীপুর যাইয়া টেরেন ধরব।"

আমি ঠাকুমার মুখে এমন ডাহা মিথ্যে শুনে চমকে গেলাম। গুরুজনেরাও মিথ্যে বলেন এটা তখনও জানা ছিল না।

"ও মানে কে?" দারোগা জেরা করলেন।

"ও মানে আমার ছাওয়াল সুনীল। আবার কেডা?"

"আর গানু? সেই ছোকরা?"

আমি বললাম, "ছোকরা বলছেন কেন ?"

মুজাফ্ফর দারোগা চমকে গেলেন। বললেন, "বাবা। কেউটের বাসায় দেখি সবাই কেউটে।"

"হঃ। তারে কত্তদিন দেখি নাই চক্ষে। পরের ছাওয়ালের খবর রাখুম কেমনে ? নিজের ছাওয়াল লইয়াই হিমশিম খাইতাছি।"

বাড়িতে পুরুষ বলতে আমি। ঋভুবাবু। মুজাফ্ফর-দারোগা বেগতিক দেখে বললেন, "আমরা আসছি এখন। কিন্তু আপনার ছেলে এবং তার বন্ধুকে সাবধান করে দেবেন। আমরা খবর সবই রাখি। তারা যা করছে তাতে হয় তাদের প্রাণ যাবে, নয়তো আন্দামানে থাকতে হবে। যাবজ্জীবন। দ্বীপান্তরে। হ্যাঁ, বলে দেবেন কথাটা।"

ঠাকুমা বললেন, "দেখা হইলে না কমু ? তা ছাড়া করে তো নাই কিছু। ভবিষ্যতের কথা কেডা কইতে পারে কন ?"

দারোগা দলবল নিয়ে চলে গেলেন।

আমি বললাম, "মা, সেজোকাকু আর গানুকাকু কখন গেল ? কোন্ কাকে চলে গেল না বলে ?"

মা তাড়াতাড়ি আমার মুখ চাপা দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে একজন পুলিশ ঘরের ডান দিক থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, "থানা দেখেছ খোকা ? দেখতে চাও ?"

মা বললেন, "এ কী ! অতটুকু ছেলেকে !"

"বিচ্ছু কোথাকার। এবারে ছেড়ে গেলাম। কিন্তু যাদের আপনারা বাঁচাতে চাইছেন তারা পালাতে পারবে না। আমরাই তাদের যম ! সময় হয়েছে তাদের।"

ভর দুপুরবেলায় একজন লোক এসে সেজোকাকু আর গানুকাকুর নাম ধরে খুব জোরে ডাকতে লাগল। তখন গোয়ালঘরে মদনদা ছিল, কুয়োপাড়ে পদাদা। রান্নাঘরেও বাসন্তীদি ছিল।

ঠাকুমা ফিসফিস করে বললেন, "পদা, কথাবার্তা খুউব সাবধানে ক'বি। এর গলা আমি চিনি। এ বাহাদুর। পুলিশের টিকটিকি।"

পদাদা যথারীতি তাকে বিদায় করে এল। বেশ গলা তুলেই বলল, "আমরা তো মুনিশ। আমাদের এই দ্যাশের জন্যে যতটুকু ভালবাসা আছে তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোক হয়েও সেটুকু রাখো না। ছিঃ, ছিঃ। গানুবাবু সুনীলবাবু যে নেই তা তো তোমাদের মুজাফ্ফর দারোগাই দেখে গেছে নিজে চোখে। আবার কি টিকটিক না করলেই নয়।"

ঠাকুমা বললেন, "বুঝলি এই টিকটিকিদের লজ্জা-শরম থাকে না। এরা দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেও একই কাজ করে যাবে। ন্যায়-অন্যায় বিচারের কোনও ক্ষমতা এবং হয়তো অধিকারও এদের নেই। কে বলতে পারে-হয়তো এরাই একদিন তোর সেজোকাকু গানুকাকুর পায়ের কাছে বসে থাকবে। কী খিটকাল।"

॥ ৪ ॥

খবরটা প্রথম বিকেলেই জ্যৈষ্ঠের আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল। ঘোড়ামারির হাট থেকে কম করে দশজন বিভিন্ন বয়সের মানুষ বিকেল তিনটের পর থেকে আমাদের বাড়িতে এসে বলে গেলেন যে, গানুবাবু বেনসন-সাহেবকে রিভলভার দিয়ে গুলি করে মেরেছে একেবারে হাটের মধ্যে। বাঘের বাচ্চার মতো। বেনসন-সাহেব হেডমাস্টারমশাইকে একবার বেত মারার সঙ্গে সঙ্গেই লুঙ্গি আর ফতুয়া-পরা ডিমওয়ালা সেজে গানুবাবু তাঁকে একেবারে কাছ থেকে পর-পর দুবার গুলি করে। কিন্তু বেনসন-সাহেবের বডিগার্ডরাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায় ছদ্মবেশী গানুকাকুর ওপরে। চারটি গুলি লাগে গানুকাকুর বুকে। এবং গানুকাকু সঙ্গে-সঙ্গেই মারা যায়।

ঠাকুমা প্রত্যেকবার, প্রত্যেক আগন্তুকের কথাতে ঢোঁক গিলে বলেন, "আর কোনও খবর?"

না, আর কোনও খবর নেই। সুনীলবাবুকে কেউই দ্যাখেনি। কিন্তু বেনসন সাহেবের গাড়ির মধ্যে একটি বোমা ফাটে। তখন কেউই ছিল না গাড়িতে। গাড়িটা নাকি চেপ্টে-দেওয়া দেশলাইয়ের বাক্সের মতো চুরমার হয়ে যায়।

॥ ৫ ॥

সন্ধে নেমে আসে। শঙ্কামারির দিকে হরিধ্বনি দিয়ে শব নিয়ে যায় কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাতে। ছেলেরা দল বেঁধে হাটে দুধ বিক্রি করে মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে গান গাইতে-গাইতে তাদের গ্রামের দিকে চলে যায়। শঙ্কামারির শ্মশানের পথের খোঁয়াড় থেকে, অন্যের ফসলে মুখ দেওয়া, অন্যের বেড়া-ভাঙা, স্বাধীন হতে চাওয়ার তীব্র ইচ্ছায় গলার দড়ি-ছেঁড়া, গাদাগাদি করে ঠাসা গোরু বাছুর, ছাগলেরা মাঝে-মাঝে ব্যাঁ ব্যাঁ বোঁয়াও করে ডেকে ওঠে। ঠাকুমার বাতের ব্যথা বাড়ে। চতুর্দশীর রাত নামে। বাইরে ছমছম করে জ্যোৎস্না। জলপাই গাছের তলায় গভীর গর্তে চিত্রল ঢোঁড়া সাপ নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে পাতা আর শিশির আর জ্যোৎস্না আর ভবিষ্যৎ চাপা দিয়ে।

আজ আমাদের বাড়িতে কিছুই রান্না হয়নি। মা প্রথমে কাঁদছিলেন খুব। এখন ঠাকুমাকে দেখে শান্ত হয়ে গেছেন। আমরা তিনজন ঠাকুমার ঘরের বারান্দাতে বসে আছি। ঠাকুমার গায়ে বালাপোশ। মায়ের গায়ে নকশি কাঁথা। আমার গায়ে তুলোর কোট।

বাইরে রাত বাড়ছে। শেয়াল ডাকছে আলুখেতের পাশে, ক্যানালের পাশের জঙ্গলে। বাঁশবন এখন স্থির। মনে হচ্ছে, মরে গেছে। ফুলমণি গাই খুব জোরে হাম্বা-আ-আ করে ডেকে উঠল। সেজোকাকুকে খুব ভালবাসে ফুলমণি।

এমন সময় বাইরে কে যেন দরজাতে ধাক্কা দিল। আস্তে আস্তে। ফিসফিস করে ডাকল, "মাসিমা।"

"পদা", ঠাকুমা বললেন।

পদাদাকে আজ থাকতে বলেছিলেন মা। বলেছিলেন, "আমার ভয় করে মা। একজন পুরুষমানুষ থাকুক।"

"আমাকে মা পুরুষের মধ্যে ধরেননি। কোনওদিনই না।"

পদাদা দরজার কাছে গিয়ে বলল, "কে ?"

"আমি যতীন, পদাদা।"

পদাদা দরজা খুলে দিতেই যতীনদা বলল, "দরজা বন্ধ করে দাও পদাদা।"

ঠাকুমা, মা ও আমি উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"কী খবর, খবর কী?"

ঠাকুমা ও মা একসঙ্গে বলে উঠলেন।

"এই চিঠি। সুনীলদা দিয়েছে। পড়েই ছিঁড়ে ফেলবেন। আমি থাকতে পারব না আর।"

ঠাকুমা একমুহূর্ত যতীনকাকুর মুখ চেয়ে বললেন, "যাওয়া নাই, আইস্যো গিয়া। কিছু খাবা না যতীন? মুখখান তো এক্কেরে শুকনো ঠেকে দেহি।"

"না মাসিমা, সময় নেই।"

মা ঘর থেকে লণ্ঠনটা এনে গোলটেবিলের উপর রাখলেন।

তারপরই যতীনকাকু বলল, "বউদি, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

"আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

মা উঠে গিয়ে উঠোনে নামলেন। যতীনকাকু একটা চিঠি দিল মা'কে। ছোট্ট চিঠি। তাতে কী লেখা ছিল, জানা গেল না। মা নীরবে চিঠিটি পড়ে বললেন, "দাঁড়াও যতীন।" বলেই নিজের ঘরে গেলেন। একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল রিভলভারটি। সঙ্গে একটি গুলির বেল্ট। মা একটি খামও দিলেন যতীনকাকুকে।

ঠাকুমা অবাক হয়ে বললেন, "কোথায় রাখছিলা লুকাইয়া বউমা?"

"মা-কালীর মূর্তির পায়ের নীচে।"

"খামে কী?"

"টাকা। এক হাজার। আমার কিছু গয়না মধু-স্যাকরাকে বেচে দিয়েছি মা।"

"ভাল করো নাই।"

"গয়নার দাম কি প্রাণের চেয়ে বেশি মা?"

মা বললেন "যতীন, সাবধানে নিয়ে যেও। সুনীলের এখন এটার খুবই দরকার। কাউকে মারতে নয়। নিজেকে বাঁচাতেই।"

যতীনকাকু বলল "জানি।"

তারপর বলল, "সুনীলদা বলেছে এদিকে এলে ন'মাসে-ছ'মাসে গভীর রাতে কখনও দেখা করে যাবে তোমাদের সঙ্গে। কলকাতায় দাদার সঙ্গেও করতে পারে। যদি আসে, তবে তোমরা তার গলা না চিনলে সে নাম বলবে পরশু-রাম। মনে রেখো।"

মা বললেন, "ঠিক আছে। তুমিও সাবধানে থেকো।"

ঠাকুমা বললেন, "পড়ো বউমা।" ঠাকুমার চোখ শুকনো খটখটে। আগুন ঝরছিল চোখ থেকে। আবার বললেন, "আমার চিঠিখান পড়ো।"

যতীনকাকু চলে গেলে ঠাকুমা বললেন, "জানি কী লিখেছে। তবু পড়ো চিঠিখান, জোরে-জোরে একবার বউমা।"

শ্রীচরণেষু মা,

আজ পুলিশ-সাহেব বেনসনকে গানু হাটসুদ্ধু লোকের সামনেই গুলি করে মেরেছে। ও দেখিয়ে দিয়ে গেল যে, কিছু অন্যায়, কিছু অত্যাচার থাকে, তার প্রতিকার বোধহয় শুধুমাত্র অন্যায় আর অত্যাচার দিয়েই করা যায়। কবির সঙ্গে লড়তে হয় কবিতা লিখে। আর দুর্জনের সঙ্গে লড়তে হয় তার গলা টিপে ধরেই। তার গলা টিপে না ধরতে পারাটাই ভীরুতা। পৌরুষহীনতা।

আমার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। আমি হয়তো আর বাড়িতে ফিরতে পারব না। তাই জানি না, তোমার সঙ্গে আর এ-জীবনে কখনও দেখা হবে কি না। মা, যদি নাও হয়, তা হলেও দুঃখ কোরো না। যেসব মানুষ সামান্য দিনের স্বস্তি আর আরামের জন্যে তাদের চিরদিনের স্বাধীনতাকে, সম্মান বোধকে বিসর্জন দেয় তাদের না আরামের যোগ্যতা থাকে ; না স্বাধীনতার।

শুধু আশা করব এইটুকুই যে আমাদের এই ঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়ানো, গানুদের এই বীরোচিত মৃত্যু, বৃথা যাবে না। দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। ঋভুরা যেন সৎ নাগরিক হয়ে- স্বাধীন হয়ে, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে, এইটুকুই কাম্য। কাল ঋভুর জন্মদিন। ওর জন্মদিনে গানুর প্রাণ, কাল গান-গাওয়া গানুর গান আর আমার পলাতক হওয়া—এই আমাদের উপহার ওকে। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের এক গর্বিত নাগরিককে।

বউদি, তুমি এই দেশের মায়ের মতো মা হয়ে ওঠো। ঋভুকে বাঙালি কোরো না, মানুষ করার চেষ্টা কোরো। দাদাকে বলো, যেন আমাকে ক্ষমা করে। ইকনমিক্স-এ এম-এ এবং আইন পাশ করেও ইংরেজ সরকারের আমলে আমি সহজ পসারে সহজে টাকা রোজগার করতে পারলাম না। ক্ষমা কোরো। আমাদের ক্ষতি একদিন তোমাদের লাভ হয়ে ফুটে উঠবে।

আমাদের নেতারা, যাদের জন্যে, যাদের মুখের কথায় আমরা দেশের জন্যে শুধু প্রাণই নয়, ভক্তিও দিলাম, তারা দেশ স্বাধীন হলে প্রকৃত নেতারই মতো ব্যবহারে দেশকে, দেশের মানুষকে উজ্জ্বল, সুখী এবং সৎ করে তুলবেন এই বিশ্বাস, এই স্বপ্ন বুকে নিয়েই সব ছেড়ে বেরোলাম। জানি না, আমার শেষ গানুর মতোই হবে কি না !

তোমাদের প্রণাম। ঋভুকে ভালবাসা। ইতি।

তোমাদের সুনীল

(ঋভুর সেজোকাকু)

ঋক

কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে ?

ঋক বললো।

কই ? না তো !

তৃষা বললো। উপরে নাক তুলে।

স্পষ্ট পাচ্ছি যে আমি !

কী জানি ! কিসের গন্ধ !

নিশ্চয়ই গ্যাসের। গ্যাস সিলিণ্ডার লিক করেছে।

শুনেই তৃষা লাফিয়ে উঠলো বসবার ঘরের সোফা ছেড়ে। আতংকিত গলায় একটি সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে রান্নাঘরের দিকে দৌড়লো। পরক্ষণেই বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জোরে ডাকলো, মুঙ্গলিরে ! ও মুঙ্গলি।

ডেকেই তৃষার মনে পড়লো মুঙ্গলিকে তো হাটে পাঠিয়েছে। মনে পড়তেই, দৌড়ে বসার ঘরে ফিরে এসে বললো, আপনি পারেন না ? ঠিক করে দিতে ; ঋক ?

ঋকও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রত মুখে সে বললো, না। আমি তো স্টোভে অথবা কাঠের উনুনে রান্না করে খাই। গ্যাস সিলিণ্ডারের আমি কিছুই জানি না।

এদিকে গন্ধটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বাড়িময় ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। এই ছোট্ট জনপদের ডিসেম্বরের কাঁচা পথের রাশ রাশ ধুলোর গন্ধ আর বিভিন্নরঙা পুটুস ফুলের উগ্র গন্ধকে ছাপিয়ে গ্যাসের গন্ধ যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছিলো।

তৃষা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, কিছু একটা করুন না ! কী রকম পুরুষ মানুষ আপনি !

অপ্রস্তুত গলায় বোকার মতো ঋক বললো, কাউকে বরং ডেকে আনি বাইরে গিয়ে। আমি এ সব পারি না।

কি পারেন আপনি !

ঝাঁঝালো স্বরে বললো তৃষা।

ঠিক তক্ষুণি বাড়ির সামনের মস্ত মহুয়াগাছটার গুঁড়ি ও ডালপালায় প্রতি-

ধ্বনির সিরসিরানি তুলে নতুন অ্যাম্বাসাডার গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ করে প্রণত ঢুকলো। তৃষা দৌড়ে গেল বাইরে। বললো, আর কাছে এনো না গাড়ি। রান্নাঘরে গ্যাস লিক করছে। ঋক বসে আছেন, কিন্তু উনি জানেন না কিছুই। তুমি এসো শীগ্‌গির।

সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিন বন্ধ করে প্রণত গাড়িটাকে গারাজের পাশে পার্ক করিয়ে দৌড়ে ভিতরে এসে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। এবং একটু পরেই বেরিয়ে এলো।

বললো, কখন ফিট করে দিয়ে গেছে গ্যাস কোম্পানীর লোক ?

এই তো ! হবে আধঘণ্টাটাক্।

ভারী ইরেসপন্‌সিবল্ তো। কমপ্লেইন করতে হবে। আর তুমিই বা কেমন ? রান্নাঘরের ব্যাপার তুমি নিজেও তো একটু জানবে। মুঙ্গলি কোথায় ?

হাটে গেছে।

অপরাধীর মুখে তৃষা বললো।

রান্না তো আমি দু-একটি পদ মাত্র করি। তাও রোজ নয়। সবই তো করে মুঙ্গলিই।

তা হলেও এগুলো এলিমেণ্টারী জিনিস। একটুকুও না জানলে চলবে কি করে।

কী বলবে, ভেবে না পেয়ে তৃষা মুখ নামিয়ে বললো, আমি বুঝি এর আগে কোনোদিনও রান্না করেছি !

আমার মতো সাধারণ অবস্থার মানুষকে যখন বিয়ে করেছো তখন করতে তো হবে। আস্তে আস্তে সবই শিখে নিতে হবে। নইলে চলবে কি করে। আজকাল রাজা মহারাজার স্ত্রীদেরও রান্না করতে হয়।

বলেই, বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়ানো ঋক-এর দিকে ফিরে প্রণত বললো, বোসো ঋক। তুমি আজ হাটবারে হাটে না গিয়ে অসময়ে আমার এখানে যে !

স্যার ! আপনার টেলিফোন কি খারাপ ? টেলিফোনে আপনাকে কিছুতেই কন্‌টাক্ট করতে না পেরেই আমাকে দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বলে পাঠালেন যে কলকাতা থেকে এম· ডি· আসছেন কালকে। আপনাকে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে যেতে হবে পাটনাতে। এম· ডি-কে রিসিভ করতে। আমারও এখুনি ফিরে গিয়ে অ্যাকাউণ্টস-ট্যাকাউণ্টস সব আপ-টু-ডেট করে রাখতে হবে। ব্যাকলগ্ জমে গেছে। আজ বোধহয় রাত দেড়টা দুটো হয়ে যাবে বাড়ি যেতে যেতে। আমি যাই এখন স্যার।

কটায় বেরুবেন উনি ?

বলেছেন তো ভোর ছ'টায়। ওঁর গাড়ি করেই আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। এম. ডি কলকাতা থেকে হপিংফ্লাইটে আসছেন। রাঁচী হয়ে।

ও।

ম্যানেজার সাহেব আরও বলেছেন যে কালকে দুপুরে আপনি সস্ত্রীক ওঁর বাড়িতেই খাবেন। এম· ডি. ওঁর বাড়িতেই লাঞ্চ করবেন।

আমি যাব না।

তৃষা বললো। প্রণত ও ঋক দুজনকেই শুনিয়ে।

কেন ?

বিরক্ত গলায় শুধোলো প্রণত।

আমার ভালো লাগে না। একটানা ইংরিজি বলতে হবে। হেঁ হেঁ করতে হবে।

কেন ইংরিজি বলতে কি তুমি পারো না ? পারো বলেই তো তোমাদের বাড়ির সকলে বলেছিলেন। স্বামীদের চাকরির উন্নতিতে স্ত্রীদেরও একটু সাহায্যের দরকার। বিশেষ করে আজকাল।

আমি ওসব পারি না। ভালো লাগে না।

তৃষা বললো, অপরাধীর গলায়।

তা বললে চলবে কেন ? তোমায় যেতেই হবে। ঋক, তুমিই সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে একটা সাইকেল রিক্সা ধরে তৃষাকে নিয়ে যাবে ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে। আমি খুবই ব্যস্ত থাকবো। তোমাকেও নিশ্চয়ই লাঞ্চ-এ বলেছেন উনি।

না স্যার। আমাকে বলেননি। না বলেছেন ভালোই করেছেন। কোনো-ক্রমে আমি ডেবিট-ক্রেডিটটা সামলাই। বাংলা মীডিয়াম স্কুলে পড়েছি, ইংরিজি-ফিংরিজি আমি তো একেবারেই বলতে পারি না। আমাদের লেভেলের কাউকেই ম্যানেজার সাহেব বলেননি।

কিন্তু লেখো তো বেশ ভালোই ! ম্যানেজারের সঙ্গেও তো কাজ চালিয়ে নাও দেখি।

লেখা আর বলা তো এক নয় স্যার। তেমন সমাজে না মেলামেশা থাকলে, তেমন স্কুলে না পড়লে, ফটাফট্ ইংরিজি বলা যায় না। অভ্যেসের ব্যাপার।

বাজে কথা। আমিও তো বাংলা মীডিয়াম স্কুলে পড়েছি। চেষ্টা থাকলেই শেখা যায়। তোমরা হলে টীপিক্যাল বাঙালী। সাধে বাঙালী সব জায়গাতেই পিছু হটে যাচ্ছে ! অদ্ভুত তোমরা ! সত্যি !

আমি যাবো স্যার।

হ্যাঁ, এসো ! শ্রীবাস্তব সাহেবকে বলে দিও যে আমি তৈরি হয়েই থাকবো।

ঋক বললো, হ্যাঁ স্যার। আসি বউদি।

বলেই, দুজনকে নমস্কার করে চলে গেল, সাইকেলের টায়ারে কাঁকরে মাটিতে কিরকির্ শব্দ তুলে।

আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

প্রণত বললো।

তৃষার মুখটা কালো হয়ে গেল। বললো, গ্যাসটা একটু জ্বেলে দেবে ? আমি মাংসের চপ গড়েই রেখেছি। আমি মানে, আমি আর মুঙ্গলি। এক্ষুণি ভেজে দিচ্ছি।

গ্যাস জ্বালাটাও কী এমন কঠিন কাজ ? চলো, জেবলে দিচ্ছি। আজকে দেখে নাও। এর পরে আর কোনোদিন বলো না যে পারি না।

আমার ভয় করে। তুমি তো জানোই যে আমার মা আগুনে পুড়ে… আগুনকে বড় ভয় পাই আমি।

সব বাড়ির সব আনপড় কাজের লোকই গ্যাস জ্বালছে। তোমার মতো এমন ঢঙ কাউকেই করতে দেখিনি।

তৃষা কথা না বলে প্রণতর সঙ্গে রান্নাঘরে গেল। গ্যাসটা প্রণত জেবলে দিতেই ও বললো, সবাই কি সব পারে ?

সব না পারে তো কিছু তো পারে !

উত্তরে কিছু না বলে তৃষা একবার তার চোখ দুটি তুলে প্রণতর দিকে তাকালো। প্রণতর দু'চোখে বিরক্তি। যদিও ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ'মাস। তৃষা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে প্রণত ওকে পছন্দ করে না। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিলো তৃষা। বললে, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি চা আর চপ নিয়ে যাচ্ছি খাবার ঘরে।

রান্নাঘর থেকেই তৃষা শুনতে পেল যে প্রণত খুব বকছে মালীকে। চপ ছেড়েছিলো সবে কড়াইয়ে। কী নিয়ে যে বকাবকি তা ঠিক বুঝতে পারলো না চপ ভাজার শব্দে। চপ ভাজা হলে. স্যালাড সাজালো একটি প্লেটে। টোম্যাটো আর চিলি-গার্লিক্ সস্-এর শিশি দুটি ফ্রিজ থেকে বের করে খাবার ঘরের ম্যাটের উপর সাজিয়ে ডাকলো প্রণতকে। একটু পর প্রণত এসে টেবলে বসলো।

তৃষা বললো, তুমি খাও, আমি চাটা নিয়ে আসছি।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে শীতের বিকেলের রোদ এসে পড়েছিলো। কম্পাউণ্ড ওয়ালের পাশে বড় বড় সেগুন গাছের পাতাদের পেছন দিকে কমলা রঙা রোদ পড়ায় যেন সবুজ ধুলিধুসরিত পাতাগুলির রঙ পালটে গেছে। এবারের শারদীয়া আনন্দবাজারে বাণী বসুর উপন্যাসে পড়েছিলো 'কমলালেবুর রসের মতো রোদ'। বা ঐরকম কিছু। ভারী ভালো লেগেছিল উপমাটি। এমন এমন বিকেলে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন মনে পড়ে যায় তৃষার। মন খারাপ যেমন লাগে তেমন একরকমের ভালো লাগাও মনকে ছেয়ে ফেলে যেমন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনলে হয়। এ সব জিনিস প্রণত বোঝে না। সকালবেলার আলো বা সন্ধ্যে হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত প্রণতর মনে কোনো দাগ কাটে না। নিজের কোম্পানীর কাগজপত্র এবং দ্যা স্টেটসম্যান কাগজ ছাড়া প্রণত আর কিছুই পড়ে না। গান ভালোবাসে না ও। কাজ-কর্ম সেরে ফিরে এসেই চান করে। পটাপট্ কয়েকটা হুইস্কী খায়। তারপর খাবার খেয়েই শুয়ে পড়ে। তৃষা খেলো কি না এবং কী খেলো তা কোনোদিনও চোখ মেলে দেখেও না প্রণত, যদিও দু'জনে একসঙ্গেই খেতে বসে। প্রণত ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লে তৃষা কখনও খুব নিচুগ্রামে বিয়ের সময়ে তার সেজ মামীমার প্রেজেণ্ট করা ক্যাসেট-প্লেয়ারে কোনো প্রিয় গান শোনে। কখনও বা, চাঁদ থাকলে বারান্দার চেয়ারে বসে থাকে। একা।

তুষার যুবতী শরীরটার প্রতিও কোনো আকর্ষণ নেই প্রণতর। মনের খোঁজ তো সে রাখেই না। রাখে না এ কথাটা বুঝতে পেরে বড় অপমানিতও বোধ করে ও। ও সুন্দরী নয়, কিন্তু কুশ্রীও নয়। তাছাড়া সকলেই বলে ওর ফিগার খুব ভালো। কিন্তু প্রণত তো ওকে দেখেশুনেই বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, মেজমামার কাছে লম্বা তালিকাও ধরিয়ে দিয়েছিলো প্রণত তুষাকে বিয়ে করতে রাজী হওয়ার খেসারত দাবি করে। গডরেজের ফ্রিজ, টেলেরামার কালার টি. ভি , ডাবল বেড খাট-নি. পি. টিক্-এর, গডরেজের আলমারি, সোফা সেট, কার্পেট এবং আরও কত কী! তার উপরে কুড়ি হাজার টাকা নগদ বৌভাতের খরচ হিসেবে। এই তালিকার পেছনে প্রণতর নিজের হাত কতখানি ছিল আর তুষারই সমবয়সী ছোটমামীর হাত কতখানি ছিল ও এখনও জানে না। কী একটা রহস্যের গন্ধ পায় ও সব সময়। অথচ তার তল পায় না।

এ সব কথা আগে জানলে এ বিয়েতে রাজীই হতো না তুষা। ও তো পণ্য নয় যে তাকে ঘর বদলাতে দাম ধরে দিতে হবে! যে শিক্ষিত পুরুষ কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হওয়ার বদলে টাকা দাবি করে, বৌভাতে ঘটা করে আত্মীয় বন্ধু খাওয়ানোর খরচ দাবি করে মেয়ের বাড়ি থেকে, তার শিক্ষা বলে আদৌ কিছু আছে বলে মনে করে না তুষা। প্রণত এঞ্জিনীয়ার হতে পারে কিন্তু শিশুকাল থেকে তুষা শিক্ষা বলতে যা-কিছুকেই জেনে এসেছে তার ছিটে-ফোঁটাও দেখে না প্রণতর মধ্যে। অন্তত এই ছ'মাসে দেখেনি। প্রণত নিজেকে ইচ্ছে করে লুকিয়ে রাখলে আলাদা কথা।

তুষার বাবা যখন মারা যান তখন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তুষার বয়স পাঁচ। মামারা ওকে আর ওর মাকে যত্ন করে নিয়ে এসে তাঁদের কাছেই রাখেন। আদর যত্ন স্বাচ্ছল্যের অভাব ছিল না বড়লোক এবং উদার মামাদের আশ্রয়ে। কিন্তু তাদের দাবি বলতেও কিছু ছিল না। দয়াপ্রার্থীই ছিল ওরা মানে তুষা ও তুষার মা। কোনো ব্যাপারেই কারো উপরে যে জোর খাটাবে তেমন একজন মানুষও ছিল না। বিয়ের আগে অনেক আকাশ কুসুম কল্পনা করেছিলো যে বিয়ে হলে স্বামীই হবে তার সব জোর খাটাবার মানুষ। তার সব আবদারের আহ্লাদের দাবির মানুষ।

তুষার মা দু'বছর আগে হঠাৎ রান্নাঘরে আগুনে পুড়ে মারা যান। আর কেউ জানুক আর না জানুক তুষা জানে যে ছোটমামীর ব্যবহারই মাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিলো। মায়ের মৃত্যুর পরই মামা-মামীরা তুষার বিয়ে দিতে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বিশেষ করে ছোটমামা-ছোটমামী। বিপত্নীক মেজমামাকে এতোসব কথা বলা যেতো না। এ বিয়েতে তুষার রাজী হওয়াটাও এক ধরনের আত্মহত্যাই বলা চলে। ওর না তেমন পছন্দ হয়েছিলো প্রণতর চেহারা, না কথাবার্তা। কিন্তু ছোটমামীর জন্যে মামাবাড়িতে থাকাও তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

কই? চা কি হলো?

হঠাৎ প্রণতর ডাকে চমকে উঠলো তৃষা। বললো, যাই। ও এরকমই। সংসার করার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

চা নিয়ে গিয়ে বললো, আর চপ লাগবে তোমার? নিয়ে আসি?

লাগতো। যদি সময়মতো জিগ্যেস করতে। এখন আর লাগবে না।

তুমিও তো চাইতে পারতে! শুধুই আমাকে গালমন্দ করার সুযোগ খোঁজো তুমি!

মনে মনে বললো তৃষা। কিন্তু মুখে কিছুই বললো না। নিজের জন্যেও এক কাপ চা ঢাললো প্রণতকে দেবার পর। দুধ চিনি মিশিয়ে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলো।

পথ দিয়ে সাইকেল রিক্সা যাওয়ার আওয়াজ হচ্ছিলো ক্রিং ক্রিং করে। লোহার গেটটা টিনের পাত দিয়ে ঢাকা। বাইরের চলমান পৃথিবীর কিছুই দেখা যায় না ভেতর থেকে। শুধু শোনা যায় মাত্র। দূরে কারা যেন মাইকে গান বাজাচ্ছে। কিশোরকুমারের গান। গান শুনতে শুনতে চা-টা শেষ করলো তৃষা।

জামা-কাপড় পরে এসে প্রণত বললো, আমি একটু বেরুচ্ছি। আজ তাস খেলার নেমন্তন্ন আছে সুরদের বাড়িতে। সেখানেই খেয়ে আসব। তুমি কি যাবে?

না। তোমরা মদ খাবে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করবে আর তাস খেলবে। আমি গিয়ে কি করব?

মর্ডান মেয়ে। তাস খেলতেও জানে না? ভাবাই যায় না। তোমার মামারা তোমাকে যে কি শিখিয়েছিলেন তা তাঁরাই জানেন। বিয়ের জন্যে কিছুটা প্রস্তুতি লাগে। এরকম থরোলি আনপ্রিপেয়ার্ড ব্রাইডের কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

তৃষা কথা না বলে বাইরে চেয়ে বসে রইলো। প্রণতর অ্যাম্বাসাডার ধুলো উড়িয়ে চলে গেলো। গেটটা এক মুহূর্তের জন্যে খুললো মালী। পথটা চোখে পড়লো এক ঝলক। কতরকম মানুষ, দোকান, যানবাহন। পরমুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গেলো গেট। গেটটা টিনের পাত দিয়ে বন্ধ করা না-থাকলে তাও সময় কেটে যেতো তৃষার গেটের দিকে চেয়েই।

তৃষা ভাবছিলো, প্রণতর নাম কে রেখেছিলেন জানে না ও, তবে নামটি প্রণত না হয়ে উদ্ধত হলেই মানাতো বেশি।

প্রণত চলে যেতেই মুঙ্গলি এসে ঢুকলো। খুব সেজেছে ও আজকে। হাট থাকলেই সাজে। জবজবে করে তেল মেখেছে। গাঢ় লাল রঙের ব্লাউজের সঙ্গে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরেছে। রুচিশীল চোখে ধাক্কা লাগে। কিন্তু মুঙ্গলি যাদের জন্যে সাজে তারা হয়তো এইরকম সাজ-পোশাকই পছন্দ করে।

মুঙ্গলি হাসলো। বললো, তোমার জন্যে বগারী পাখি এনেছি। এখন খাবে? না রাতে?

তৃষা বললো, খাবো না। তোর সাহেবকে দিস। সে ভালোবাসে। রাতে এবং কাল দুপুরেও সাহেবের নেমন্তন্ন। কাল রাতে রোস্ট করে দিস।

মঙ্গলি চলে গেলে তৃষা ভাবছিলো কেন যে পাখিগুলো খায় মানুষে। ক্ষুদে ক্ষুদে পাখি। বর্ষার সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো দ্রুতগতিতে এ গাছ থেকে ও গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। মানুষের ক্ষিদে বড় আগ্রাসী হয়ে গেছে। এই লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে শীগ্‌গিরই। হাটে জ্যান্ত পাখি সামনে মেরে ভেজে দেয় আর গব্‌গব্‌ করে খায় লোকে।

সন্ধ্যে হয়ে যাবে একটু পরই। মনটা বড় খারাপ লাগছিল তৃষার। ওর মন খারাপই থাকে। আজকে যেন বেশি খারাপ লাগছে। সংসারে যার আপনজন বলতে কেউই নেই সেই শুধু জানে মন খারাপের এই রকমটি।

খস্‌স খস্‌স করে রুক্ষ পায়ের আওয়াজ করে মালী এলো। যেন মাটি ফুঁড়েই উঠলো। চমকে গেলো তৃষা। কোন দিক দিয়ে এলো কে জানে!

কী ব্যাপার?

সাহেব বড় বকাবকি করলেন আমাকে।

হ্যাঁ। রান্নাঘর থেকে শুনছিলাম বটে। কিন্তু বুঝিনি। কেন?

আপনি ঐ জংলী পলাশগাছগুলো কাটতে বারণ করেছিলেন।

হ্যাঁ। করেই তো ছিলাম। ডিসেম্বর শেষ হতে চললো, মার্চের গোড়া থেকেই ফুল আসবে গাছগুলোতে। লালে লাল হয়ে যাবে কম্পাউণ্ড। তুমিই তো বলেছিলে মালী!

বলে তো ছিলামই মেমসাহেব। আপনারা তো এ বাড়িতে এসেছেন মাত্র তিনমাস। আর আমি তদারকি করছি ত্রিশ বছর। আমি জানি না তো কে জানে? জনস্টন সাহেব আর মেমসাহেবও খুব ভালোবাসতেন তাই পুঁতে দিয়েছিলেন কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের পাশের গাছগুলোকে। কত বড় হয়ে গেছে গাছগুলো।

তা তোমার সাহেব বকলেন কেন?

সাহেব বলেছেন, এই রবিবারের মধ্যেই লোক এনে সব জংলী পলাশ কেটে ফেলতে হবে। সাহেব ওখানে চাষ করে আলু, বেগুন আর তামাকপাতা লাগাবেন।

তামাকপাতা?

হ্যাঁ, মেমসাহেব। সাহেব কাগজ পাকিয়ে সিগারেট খান না। নিজের চাষের তামাক এবার থেকে পাকিয়ে খাবেন।

তাই?

অন্যমনস্ক গলায় বললো তৃষা।

তারপর বললো, আমার জন্যে তোমায় বকুনি খেতে হলো মালী। আমি খুব দুঃখিত। তোমার সাহেবের বাড়ি, সাহেব তোমার মালিক, সাহেব যা বলেন তুমি তাই করবে। আমি আর কিছু কখনও বলবো না তোমাকে।

আমাকে মাপ করে দেবেন মেমসাহেব।

মালী বললো মাথা নিচু করে।

না, না। তুমিই আমাকে মাপ করে দিও।

॥ ২ ॥

ভোর ছ'টাতে বেরিয়ে গেছিলো প্রণত। চা করেছিলো মঙ্গলিই। তৃষা তার আগেই উঠেছিলো। দরজা অবধি পেঁছেও দিয়েছিলো প্রণতকে। তবে দরজার আড়ালেই ছিল। বারান্দাতে আসেনি। ম্যানেজার শ্রীবাস্তব সাহেবের চোখের চাউনিটা মোটেই ভালো লাগে না তৃষার। মেয়েদের চোখ ঠিকই বোঝে। কিছু পুরুষ থাকে না, যারা চোখ দিয়ে মেয়েদের চেটে খায়, লোকটা সেই শ্রেণীর। বদমাইস ব্যাচেলার। প্রণতর সঙ্গে এই লোকটার কোম্পানীর সম্পর্ক ছাড়াও আরও কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় তৃষার। সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর শরীরের প্রতিও এমন অনাসক্তি কোনো পুরুষের স্বাভাবিকতার মধ্যে পড়ে না। তৃষা ব্যাপারটা ঠিক কি তা বুঝতে পারে না। তবে অনুমান করতে পারে। অস্পষ্ট অনুমান। অতি স্বল্পবারই প্রণত বিয়ের পরে ওকে আদর করেছিলো। তার স্মৃতিও আদৌ সুখাবহ নয়। বরং কৈশোর থেকে সুন্দর সব নানা রঙীন কল্পনায় রাঙা এই ব্যাপারটি ওর কাছে রীতিমতো ভীতিজনকই হয়ে উঠেছে। প্রণতকে সেই সব মুহূর্তে মনে হয়েছে কোনো জঘন্য দস্যু। তৃষাকে প্রণত সেই হৃদয়হীন, রোম্যান্টিকতাহীন একটি যন্ত্রেরই মতো কামড়ে ছিঁড়ে ধর্ষণই করেছে। সেই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে এক ফোঁটাও ভালোবাসা ছিল না একবারও। ভালোবাসার কথা মাইকে ঘোষণা করতে হয় না। কুকুর-বেড়ালও চোখ দেখে, ভাব দেখে তা বোঝে। তাই, ভালোবাসা যে এই সম্পর্কে একটুও নেই তা তৃষা নিঃসন্দেহে বুঝে গেছে। কিন্তু বোঝেনি ভালোবাসার বদলে আর কি আছে। প্রণতর তাকে বিয়ে করার পেছনে ঠিক কোন উদ্দেশ্য ছিল সেটাই স্পষ্ট হয়নি এখনও তৃষার কাছে। বড় ভয়ে ভয়ে দিন কাটে তার। ছোটমামীই আগ-বাড়িয়ে এই সম্বন্ধ এনেছিলো। অনেকদিন থেকেই নাকি চিনতো প্রণতকে। এই চেনার রকমটাও ঠিক জানে না তৃষা।

সকালের কাজকর্ম সেরে রোজ যে সময়ে চান করে সেই সময়েই চান করেছিলো। বিয়েতে অনেক বই পেয়েছিলো তৃষা। তার মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'ও ছিল। কয়েকদিন হলো পড়া আরম্ভ করেছে। ভারী

ভালো লাগছে। চান করে উঠে ভিজে চুল ঝকঝকে রোদে মেলে দিয়ে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে বইটি পড়ছিলো এমন সময়ে গেট খুলে একটি সাইকেল ঢুকলো। কির্‌কির্‌ শব্দ হলো কাঁকুরে মাটিতে। বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে, ঋক।

ঋক রায় প্রায় তৃষার সমবয়সীই হবে। প্রণতর চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। ভারী লাজুক প্রকৃতির মানুষ ঋক। তবে সেই লজ্জা প্রায়ই হীনম্মন্যতার দরজায় পৌঁছে যায় এবং যখন তা পৌঁছোয় তখন ঋককে অত্যন্ত অপছন্দ করে তৃষা। প্রণতদের অফিসের বেয়ারা, রান্খেলাওন ছাড়া একমাত্র ঋকেরই যাওয়া-আসা আছে প্রণতর বাড়িতে। তাও কাজ বা খবর নিয়েই আসে যখন আসে। তৃষার সঙ্গে ঋকের ব্যবহারে তৃষা খুব মজা পায়। বিলক্ষণ বোঝে যে কোনো দুর্জ্ঞেয় কারণে ঋক তৃষাকে খুবই পছন্দ করে।

আসুন!

তৃষা বললো।

যাবেন না বৌদি? তৈরি হননি এখনও?

কটা বাজে? ভালো বই হাতে পেলে আমার সময় জ্ঞান থাকে না।

বাজে এগারোটা। কি বই?

"প্রথম প্রতিশ্রুতি"। আশাপূর্ণা দেবীর।

আপনার পড়া হয়ে গেলে আমাকে দেবেন।

দেবো। কিন্তু আপনার তো সাড়ে বারোটায় আসার কথা ছিল। তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু এম. ডি-র ইনস্‌পেকশান শেষ হয়ে যেতেই এম. ডি. এবং স্যারেরা সবাই শ্রীবাস্তব সাহেব মানে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে ওঁর বাড়িতে চলে গেলেন। শুনতে পেলাম, আসলে ইনস্‌পেকশান একটা ছুতোমাত্র। আমাদের মাদ্রাজী এম. ডি. এসেছেন ওঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাতটা কাটিয়ে কালই চলে যাবেন কলকাতা। বাঁচা গেল। যা টেন্‌শানে ছিলাম!

আপনি কোন সময়ে টেন্‌শানে থাকেন না?

তা ঠিক।

প্রণত কি আমাকে এখুনি যেতে বলেছে?

না। ঠিক তা নয়। আমি ভাবলাম ইনস্‌পেকশানই যখন হয়ে গেলো তখন একটু আগে আগেই যাই।

তৃষা ঋকের চোখে চোখ রেখে বললো, কেন?

মানে, এমনিই! যদি আপনি আগে যেতে চান তাহলে আগেই নিয়ে যাব। নইলে……

নইলে কি? আমি যদি না যাই?

অ্যাইরে! না-গেলে তো আমারই গিয়ে স্যারকে খবর দিতে হবে।

তৃষা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললো, আপনি বসুন। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। কিছু খাবেন? চা বা কফি!

না, না। অফিসে একটু আগেই কফি খেয়েছি।

তৈরি হতে হতেই তৃষা মুঙ্গলিকে ডেকে বললো মালীকে একটা রিক্সা ডাকতে বলতে।

রিক্সাও এলো তৃষাও তৈরি হয়ে বেরুলো।

ঋক বললো, আপনি রিক্সাতে উঠুন আমি আপনার আগে আগে সাইকেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

সে কি? আমি তো গভর্ণর নই যে আমার আগে আগে পাইলট-এর দরকার। তাছাড়া প্রণত তো আপনাকে সাইকেল-রিক্সা করেই আমাকে নিয়ে যেতে বলেছিলো। তাই না?

তা ঠিক। তবে আমার সাইকেল?

গারাজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখুন। মালীর কোয়ার্টার পাশেই। বাড়ির ভেতর থেকে চুরি হবে না। ভয় নেই।

রিক্সাতে তৃষা উঠে বসলে ঋক বললে, দুজনে আঁটবে?

তৃষার দু চোখে চকিত কৌতুক ঝিলিক মেরে গেলো! বললো, সব রিক্সাতেই তো দুজন করেই যায় লোকে। উঠে আসুন।

যতখানি সম্ভব তৃষার ছোঁয়া বাঁচাবার চেষ্টা করেই একপাশে বেঁকে বসলো ঋক। তবুও ছোঁয়া বাঁচানো গেলো না। তৃষার চান-করে-ওঠা শরীরের ছোঁয়া এবং পারফ্যুমের গন্ধে বেচারী ঋক বেশ বেসামাল হয়ে পড়লো।

তৃষা বললো, আপনার বাড়ি কোন দিকে? রিক্সাওয়ালাকে বলে দিন।

সুরাইয়াগঞ্জে। কিন্তু আমার বাড়ি কেন?

কত দূর? লাগবে কতক্ষণ? যেতে?

সাইকেল রিক্সাতে পনেরো কুড়ি মিনিট।

আপনার বাড়ির দিকেই যেতে বলুন।

কী কি-কি বলছেন? কেন?

এমনিই! এত আগে ওখানে গিয়ে কি করব?

স্যার রাগ করবেন না?

কার ওপর?

আপনার ওপর না হোক আমার ওপর।

সে আপনার স্যারই জানেন। আমি কী করে বলব বলুন?

ও।

অস্বস্তির গলায় বললো ঋক।

আপনার কি খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার পাশে বসে যেতে? অমন হাঁসফাঁস করছেন কেন?

ন-না না। সে কথা বলছি না। বলছি, এমন তো কথা ছিল না! আমার বাড়িতে যে আমি একা থাকি।

তা তো জানিই। নইলে কী আর স্টোভে রান্না করে খান!

আপনি জানেন। ও হ্যাঁ, আমিই তো স্টোভে রান্না করার কথা কাল বলেছিলাম।

মনে পড়েছে? আপনি মানুষটা বড় ভুলো মনের।

হ্যাঁ, আমার মা তাই বলতেন বটে।

বলতেন মানে? মা নেই?

না। মা-বাবা কেউই নেই।

ঋক বললো।

তাই?

হ্যাঁ।

তারপর একটু চুপচাপ। সাইকেল রিক্সার চেইনের শব্দ। অন্য সাইকেল রিক্সা এবং সাইকেলের শব্দ। লোকজনের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা।

আমার বাড়িতে কি দেখতে যাচ্ছেন?

আপনার পরিবেশ। একজন মানুষকে পুরোপুরি জানতে হলে মানুষটির রুচি, তার বাড়িঘর, তার পরিবেশ সম্বন্ধেও তো জানতে হবে।

আমাকে পুরোপুরি জেনে আপনার কি লাভ? তাছাড়া আমি যে মাইনে পাই তাতে আমার পক্ষে যে খুব ভালো করে থাকা সম্ভব নয় তা তো আপনি ভালোই জানেন। আপনার বাড়িতে যা আছে আমার তার কিছুমাত্র নেই।

জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। তবে আপনার বাড়িতে হয়তো কিছু আছে যা আমার বাড়িতে একেবারেই নেই। কে বলতে পারে?

কেন যে যাচ্ছেন?

অস্বস্তিভরা গলায় বললো ঋক।

এমনিই…।

বেশ।

রিক্সাওয়ালাকে আগেই পথ বলে দিয়েছিলো ও। একটা বাঁক নিয়েই রিক্সাটা একটি নির্জন পথে পড়লো। সে পথে পড়েই মনে হলো মুরারগঞ্জের সঙ্গে এই মুরাইয়াটোলির কোনো যোগাযোগই নেই। দু পাশে বড় বড় মহুয়া আর শিমুল গাছ। ঝাঁটি জঙ্গল। খোওয়াই। পথের বাঁ দিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে।

তৃষা বললো, বাঃ। নদী আছে বুঝি বাঁদিকে?

হ্যাঁ। আমার বাড়ির পেছনের বারান্দাতে বসলে একেবারে কাছেই নদী। ভারী সুন্দর। কালো পাথরের, লালমাটির আর সবুজ জঙ্গলের মধ্যে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে।

নাম কি নদীর?

হুরী-নালা।

হুরী মানে কী?

পরী টরী হবে হয়তো। কথায় বলে না? হুরী-পরী।

বলে বুঝি? কখনও শুনিনি।

ঐ যে ঘন শাল জঙ্গল দেখছেন সামনে, তারই মধ্যে আমার বাড়ি।

নিজের নাকি ?

হাসলো ঋক। না, না। ভাড়া বাড়ি। আসলে এক জমিদারের ভাণ্ডার ছিল একসময়। শরিকে শরিকে ঝগড়াতে এখন জমিদারেরা ফকির হয়ে গেছে। এক শরিক এই ভাণ্ডারটি ভাড়া দিয়েছেন আমাকে। সবই ভালো শুধু ইলেকট্রিসিটিই নেই।

গরমের সময়ে কি করেন ?

গরমের সময়ে দুপুরবেলা তো অফিসেই কেটে যায় সপ্তাহে ছ'দিন। যখন ফিরি তখন আর গরম থাকে না। তাছাড়া খুব পুরু মাটির দেওয়াল তো। গরম এবং শীতও এমনিতেই কম লাগে। গরমকালে মনে হয় এয়ারকণ্ডিশান্‌ড্ আর শীতকালে মনে হয় সেণ্ট্রালি হীটেড।

রাতের বেলা ভয় করে না ?

কিসের ভয় ? আমার কি আছে হারাবার মতো ? কোন চোর সিঁদ কাটবে আমার ঘরে ? যা সামান্য সঞ্চয় তা তো ব্যাঙ্কেই থাকে।

চোর সিঁদ কাটবে কি কাটবে না তা কে বলতে পারে ? চোরেরও তো নানা রকম হয়।

কোনো চোরেরই আমার ঘর থেকে কিছু নেবার নেই।

সে কথা তো চোরেরাই জানবে। আপনি-আমি জানবো কি করে ?

শীতের দুপুরের গায়ের একটি নিজস্ব গন্ধ আছে। কাঁচা পথের ধুলোর গন্ধ, শালবনের গন্ধ, নদীর গন্ধ আর মধ্যদিনের রোদের গন্ধ মিলেমিশে যাওয়ায় কেমন এক আচ্ছন্নতা বোধ করছিলো তৃষা।

সাইকেল-রিক্সাটাকে দাঁড় করিয়ে রাখলো ঋক। বললো, বকশিস দিয়ে দেবো। তারপর নিজে নামতে নামতে বললো, নামুন। এখানে এই এক মুশকিল। ঐ মোড় অবধি হেঁটে না গেলে সাইকেল-রিক্সা পাওয়া যায় না। সাইকেল থাকলে অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই।

বাঃ। কী শান্তি এই জায়গাটাতে। ওটা কি পাখি ডাকছে ?

কান খাড়া করে শুনলো ঋক। তারপর বললো, আমি জানি না। রাম সিং বলছিলো, কালি-তিতির। মানে ব্ল্যাক-প্যাট্রিজ।

সে আবার কি ?

পাখিই একরকমের। আমরা আর কটি পাখি চিনি !

মানুষই বা কটি চিনি !

তৃষা বললো।

তা ঠিক। আসুন এই দিকে।

রাম সিং কে ?

রাম সিং নদীর ওপারে মাইলখানেক দূরের এক গ্রামে থাকে। ক্ষেতি-জমিন আছে। ও মাঝে মাঝেই আমার কাছে থেকে যায় রাতটা। কত কিছুর গল্প করে। কত কী জানে রাম সিং। গ্রামের মানুষেরাই কিন্তু আসল দেশ।

আমরা শহরের মানুষেরা দেশের কোনো খবরই রাখি না। আমাদের কোনো শেকড় নেই। আমি তো ভাবছি আর মাস ছয়েক চাকরি করার পর রাম সিং-এর গ্রামে গিয়ে আমিও ক্ষেতি-জমিন করব। পরের টাকার হিসেব রাখার চেয়ে নিজের হাতে বাজরা, কুলথী, পালং শাক, মুলো জন্মানো অনেক আনন্দের। তাছাড়া আমার প্রয়োজনও তো সামান্যই। প্রয়োজন হচ্ছে আগুনের মতো। ঘৃতাহুতি দিলেই বাড়ে। আর বাড়ানোর কি শেষ আছে? বলুন?

তা ঠিক।

তৃষা বললো।

ঋক শাল কাঠের এবড়োখেবড়ো দরজার তালা খুললো। এ পাশে দুটি আর ও পাশে দুটি মাটির ঘর। ভেতরে উঠোন। কুয়ো।

পেছনের দিকের একটি দরজা দিয়ে পেছনের বারান্দায় নিয়ে গেলো তৃষাকে ঋক। হুরী-নালা নদীটি সত্যিই ছবির মতো। মাছ ধরছে কারা যেন। ছোট ছোট খেপ্‌লা জাল মাথার ওপর ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে জলে। একজোড়া মাছরাঙা নদীপারের বাজ-পড়া শিমুলের ডাল থেকে ছোঁ মেরে মেরে কুচো মাছ ধরছে নদী থেকে।

ঋক বললো, আসলে বাড়ির চারদিকেই বারান্দা। তার ওপরে মাটির ছাদ। শীতে গ্রীষ্মে দিক বদলাই। সূর্যের যে অয়নপথ বলে একটা ব্যাপার আছে তা এই বাড়িতে না থাকলে এমন করে বুঝতে পারতাম না কখনওই। আমাদের ছেলেবেলার শ্যামবাজারের গলির সঙ্গে তো সূর্যের খুব একটা ভাব ছিল না!

বাঃ। তৃষা বললো, আপন মনেই।

তারপর বললো, এবারে আপনার ঘর দেখি।

ঘরটা একটু অন্ধকার। তবে জানালাগুলি খুলে দিতেই সব পরিষ্কার হলো। দেওয়ালের বড় বড় কুলুঙ্গিতে ঠাসা বই। বিভিন্ন বিষয়ের বই। তবে কবিতা ও উপন্যাসই বেশি। ইংরিজি বইও খুব কম নেই।

আপনি তো খুব খারাপ লোক। এতো বই আপনার আর একটিও পড়তে দেননি কখনও আমাকে! অথচ আমার কাছ থেকে কত বই নিয়ে এসেছেন পড়তে।

ঋক হাসলো। ঋকের যে দুটি গজদন্ত আছে এবং হাসলে যে তাকে ভারী সুন্দর দেখায় তা আগে জানতো না তৃষা। আসলে ঋককে কখনও হাসতেই দেখেনি এর আগে।

তৃষা বললো, আপনার বাড়িতে খাওয়ার মতো কিছু আছে? এত ভালো লাগছে আমার যে আজ আর শ্রীবাস্তব সাহেবের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই দুপুরটা কাটিয়ে দি।

সর্বনাশ! আমার চাকরি খেয়ে নেবেন ম্যানেজার। স্যারও ছেড়ে দেবেন না। তাছাড়া মেয়েদের ব্যাপারে দায়িত্ব অনেক। দোষ হলে আমারই হবে। আপনাকে কেউ দোষী করবেন না।

এবারে তৃষা হাসলো।

বললো, সত্যি দোষ তো আপনার নেই-ই কিছু। যদি মিথ্যা দোষ কেউ চাপিয়ে দেয় তা নিতেও এতো ভয় ?

বাঙালীর ছেলে বউদি! চাকরি যাওয়ার ভয় যে বাঘের ভয়ের চেয়েও বেশি। চাকরিটা চলে গেলে নতুন চাকরি জোটাতে লেগে যাবে অনেকদিন। তাছাড়া আদৌ জুটবে কিনা কে জানে ?

জুটবে না কেন ? আপনি তো কাজ জানেন।

কাজ নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু কাজ জানার সঙ্গে চাকরি পাওয়ার খুব একটা সম্পর্ক আছে কি এ দেশে ?

প্রাইভেট সেক্টরে এখনও আছে।

তৃষা বললো।

তবু, জানাশোনা, কানেকশান্ ছাড়া কিছুই হয় না।

আপনি এই চাকরি যদি সত্যিই ছেড়ে দিতে চান তো আমাকে বলবেন। আমার সেজমামাকে যদি আমি লিখি তো সেজমামা এখানেই অন্য চাকরি ঠিক করে দেবেন। কলকাতাতে চান তো কলকাতাতেও।

আপনার সেজমামার নাম কি ?

গোপেন মিত্তির।

বাবাঃ! তিনি তো ভীষণ পাওয়ারফুল লোক। এখানের মস্ত কোম্পানী, রবার্টসন কোম্পানীরও তো তিনি ডিরেকটর শুনেছি। খুবই ভালো কথা। তবে ঈশ্বর করুন কারো কাছেই কোনো করুণা যেন চাইতে না হয়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন আপনি ? আপনার বয়সী কোনো মানুষই তো করেন না আজকাল।

মূর্খ ও দাম্ভিক লোক সংসারে চিরদিনই ছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাসের আবার এখন তখন কি ? সকলের পক্ষে তো সব উচ্চতাতে ওঠা সম্ভব নয়। ঈশ্বরবোধ তো সকলের মধ্যে থাকার কথা নয়।

যাক গে। আপনি কি খাওয়াবেন বলুন ?

এক্ষুণি ফারস্ট ক্লাস চিঁড়েভাজা করে দিচ্ছি, কড়াইশুঁটি আর শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে। চিনে বাদামও দেবো। সঙ্গে ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ আর দুধ দিয়ে ওমলেট। আমি খুব খাঁটি দুধ পাই। রাম সিং ওর গ্রাম থেকে দিয়ে যায়। তবে বর্ষাকালে নদী পেরুনো যখন মুশকিল হয় তখন একটু অসুবিধে হয় অবশ্য।

বিস্ময়ের গলায় তৃষা বললো, আপনি সত্যিই এতো সব রান্না করতে পারেন ?

গজদন্তে ঝিলিক তুলে খিলখিল করে হেসে উঠে ঋক বললো, এগুলো আবার রান্নার মধ্যে পড়ে নাকি ? আপনারা যে কত কী রান্না জানেন ?

আমি ?

লজ্জিত গলায় বললো তৃষা।

হ্যাঁ। আপনি। মুখে যাই বলুন কে বিশ্বাস করছে। রান্না যে মেয়েদের মস্ত গুণ! সে আর আমি কী বলব!

লজ্জার শেষ থাকলো না আর তৃষার। কিছু বলতে গিয়ে কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেলো।

ঋক বললো, আপনি শুধু আমার চাকরিটা বাঁচাবেন। দেখুন, এক্ষুণি স্টোভ ধরিয়ে আপনাকে কেমন খাবার করে দিচ্ছি। সঙ্গে গোরখপুরী চা ও খাওয়াবো।

সেটা আবার কি চা?

এলাচ দারচিনি, তেজপাতা সব দিয়ে। খেয়েই দেখুন না!

তৃষা এবারে হতভম্ব হয়ে গেলো।

রিক্সাওয়ালা পথ থেকে ক্রমাগত ঘণ্টি বাজাতে লাগলো।

ঋক বললো, এক সেকেণ্ড দাঁড়ান। ওকে শান্ত করে আসি।

বলেই, চলে গেলো।

ঋক চলে যেতেই ওর লেখাপড়ার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে দেখলো তৃষা। দুটি ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো। একটিতে বর্ষীয়ান বর্ষীয়সী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার ফোটো। সম্ভবতঃ ঋক এর মা-বাবা। অন্যটি অতি সুন্দরী একটি মেয়ের। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের স্বল্প আলোতেও মেয়েটিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও রূপসী বলে চিনতে ভুল হলো না তৃষার। হঠাৎই ওর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেলো। মনে হলো কী করছে ও এখানে? শ্রীবাস্তব সাহেবের বাড়ি না গিয়ে ও এখানে কী করতে এলো? কিসের খোঁজে? কিসের লোভে? পাখিরা সব জোড়ায় থাকে। তাদের কারো নীড়েই অন্য পাখির জায়গা নেই। যার যার নীড়ে ঠোকরা-ঠুকরি কামড়া-কামড়ি করে অথবা গভীর সুখের নিঃশ্বাসের নিঃস্বনেই দিন কাটাতে হয়। যার যেমন কপাল। ঋকের চাকরির আগে ওর নিজেরই একটা চাকরির খুবই দরকার। স্বাবলম্বী না হতে পারলে এবং ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন না হয় তবে এখনও এদেশের মেয়েদের ভারবাহী জানোয়ারের মতোই দিন কাটাতে হয়। সেরকম জীবন ও সইবে না, বইবেও না। ও বুঝে গেছে যে প্রণতর সঙ্গে তার থাকা হবে না। তার পক্ষে মামাবাড়িতে ফেরার পথও নেই। মা-বাবা, দাদা-বৌদি থাকলেও কথা ছিল। তাও আজকাল মা-বাবা ছাড়া আর কারোর আশ্রয়েই ফেরা যায় না। অন্যরা সকলেই বোঝা মনে করে। কিছু একটা করতেই হবে তৃষাকে।

চিঁড়েভাজা ওমলেট এবং চা খেয়ে যখন ওরা আবার বেরুলো তখন ভর দুপুর। শাল গাছেদের ছায়া তাদের পায়ের কাছে মেঝেতে শাড়ির "ফলস"-এর মতো পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর থেকেই তারা প্রলম্বিত হতে হতে দীর্ঘ হয়ে উঠবে। কাঁসা রোদ কমলালেবুর রঙের মতো হবে। আঠা আঠা। তারপর অন্ধকার এসে সেই আঠাকে শুষে নেবে।

সাইকেল রিক্সাটা চলছে ক্যাঁচোর কোঁচোর। এবারে ঋক আর তত আড়ষ্ট নেই। বরং তৃষার উরুর সঙ্গে ওর উরু এখন ছুঁয়ে রয়েছে। এই শীতের দুপুরে অন্য শরীরের মোড়কভরা উষ্ণতা বেশ এক ভালোলাগা এনে দিয়েছে তৃষার বুকে। নববিবাহিত স্বামীর নগ্ন শরীরের ছোঁয়াতেও এমন নির্ভাসিত করে

না ওর শরীর। কে জানে। কেন এমন হয়। কাউকে ভালো লাগে আর কাউকে লাগে না। কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণ যে মিশে থাকে এই ভালোলাগা-না-লাগার মধ্যে তা বিশ্লেষণ করার সময় বা ধৈর্য তৃষার নেই। হয়তো ক্ষমতাও নেই।

কী বলবেন স্যারকে? স্যার কিন্তু খুব রাগ করবেন।

হঠাৎ বললো ঋক।

আপনার স্যার তো সবসময়েই রেগে আছেন। আজ দেখি সেই রাগ তুঙ্গে উঠলে কেমন হয়।

মৃদু হেসে বললো তৃষা।

আমার ভয় করে। যদি আমার ওপর রেগে যান।

আপনি কী রকম পুরুষ মানুষ। নিজের ওপর বিশ্বাস নেই কেন? আপনার সমস্ত জীবনই কি আপনার স্যারের রাগ এবং মর্জির ওপর নির্ভর করছে? এমন ভাবে বেঁচে লাভ কি?

তা ঠিক। বেঁচে কি আর আমরা আছি? বেশির ভাগ মানুষই শুধু তার জীবিকাকেই আঁকড়ে আছে এঁটুলি পোকার মতো। যদি কেউ দু আঙুলে জোর করে তুলে ফেলে দেয় তাহলেই শেষ। উপোষ করে মরার ভয়ে জীবিকাই যে জীবন নয় এ কথাটা ভাবতেও ভুলে গেছি আমরা। তাই ভাবি, আপনার কিন্তু খুব সাহস বৌদি!

কিসের সাহস? আপনারা কত গুণ্ডা বদমায়েসকে শায়েস্তা করতে পারেন, নিজের উপার্জনের ভাত রেঁধে খেতে পারেন, অন্য কেউ আপনাদের অপমান করলে বা নিগ্রহ করলে আপনারা তাকে উল্টে অপমান করতে পারেন। মারতে পারেন। আমরা তো অবলা। পরমুখাপেক্ষী। আমাদের আবার সাহস!

এটা কিন্তু ঠিক বললেন না। সাহস ব্যাপারটা শরীরের নয়, মনের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী যখন ফ্রান্স দখল করেছিল তখন ফ্রেঞ্চ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কত যুবতী এবং বৃদ্ধা নাম লিখিয়েছিলেন। নিশ্চিত ধর্ষণ এবং মৃত্যু এবং নানারকম পাশবিক অত্যাচারের ভয় থাকা সত্ত্বেও তাঁরা গোপনে কাজ করে গেছেন, খবর চালাচালি করেছেন, ইংলিশ, অ্যামেরিকান, ইটালিয়ন সৈন্যদের আশ্রয় দিয়েছেন, যখন 'ইনভেসান্' হলো তখন সবরকম অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম করেছেন। তাঁরা কি যে সব সৈন্যরা রাইফেল হাতে লড়াই করেছেন ফ্রন্ট-এ, তাঁদের চেয়ে কিছু কম সাহসী! সেনাবাহিনীর অফিসারদের যখন শিক্ষা দেওয়া হয় খাড়াকভাসলাতে "কমিশন" পাবার আগে তখন তাদের এই কথাটা শেখানো হয় "ফীজিকাল কারেজ ইজ দ্যা লিস্ট ফর্ম অফ কারেজ"। মনের সাহসই আসল সাহস।

তাই!

নিজের মনে বললো তৃষা।

রিক্সাটা মুরাদগঞ্জের পথে পড়লো। নির্জনতা হারিয়ে গেলো। আবার লোকজন, চিৎকার, ধুলোবালি, পানের পিক, মিষ্টির দোকানের সামনে ফেলে-

দেওয়া শালপাতার দোনার শীতের দুপুরের উত্তরের হাওয়াতে ওড়াউড়ি, বাসের কণ্ডাকটার এবং ছোকরার চিল চিৎকার। একটা মারুতি গাড়িকে দেখে পাদানীতে দাঁড়ানো ছোকরা চেঁচিয়ে উঠলো, এই ছারপোকা। সরে যা। নইলে টিপে মেরে দেবো। সর এখুনি। নইলে মর।

হেসে উঠলো তৃষা। কিন্তু মাঝপথে ওর হাসি থেমে গেলো। ওদের উল্টোদিক থেকে প্রণতর ক্যাটক্যাটে নীল রঙা অ্যাম্বাসাডার আসছে। প্রণতর পাশে রামখেলাওন বসে।

গাড়ি দেখেই ঋক রিক্সা থামাতে বললো।

প্রণত দূরে থেকেই চেঁচিয়ে বললো, ভেবোছোটা কি? কোথায় গেছিলে তোমরা?

তৃষা বললো, যাচ্ছিলাম তো শ্রীবাস্তব সাহেবের ওখানেই। কিন্তু আমার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগলো, বমি বমি করতে লাগলো। তাই ঋকবাবুর বাড়িতে গিয়ে বমি করে বাথরুম করে ফিরছি।

ঋক তোমার বাড়ি কোথায়?

সুরাইয়াগঞ্জে।

কে কে আছেন তোমার বাড়িতে?

আমি একা। ম্যানেজার সাহেব, রামখেলাওন সকলেই জানে।

অ।

তারপর তৃষাকে প্রণত বললো, তা এখন দয়া করে গাড়িতে ওঠো।

ইমপসিবল্। আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়বো।

খাবে না কিছু দুপুরে? রান্না তো হয়নি বাড়িতে।

নাঃ। চিনি লেবু দিয়ে সরবৎ করে খেয়ে শুয়ে পড়বো।

আর কী খাবে! আর কিছু নিজে রাঁধতে পারলে তো খাবো? মঙ্গলিকে ছুটি দিয়েছো তো! এ বেলা?

হ্যাঁ।

রিক্সা ছেড়ে এখন দয়া করে গাড়িতে ওঠো বাড়িতে নামিয়ে দিচ্ছি।

রিক্সা করেই চলে যাব। তুমি যাও না। দেরি হয়ে যাবে না তোমার?

দেরি যা হবার তা তো হয়েইছে। তার ওপর এমবারাসমেণ্ট। প্রত্যেকের স্ত্রী এসেছে। সেলস্ ম্যানেজার, পারচেজ ম্যানেজার, চিফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, পি. আর. ও., এখানের কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, এস. ডি. ও, এস. ডি. পি. ও প্রত্যেকেই স্ত্রী নিয়ে এসেছেন, কেবল আমার স্ত্রীই…।

তৃষা রিক্সাতে বসেই শুনলো।

কী হলো? নামবে না?

নাঃ। তুমি যাও।

এবার গলা নামিয়ে বললো প্রণত, কী সীন ক্রিয়েট করছো? একজন

জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে রিক্সায় বসে সারা বাজার ঘুরে কি আমার বদনাম করতে চাও ? তোমার মতলবটা কি ? এই ঋক ! তুমি নেমে রিক্সা ছেড়ে দাও।

না। আমি রিক্সাতেই বাড়ি যাব। চলো রিক্সাওয়ালা।

আমি নেবে যাই ?

ভয়ের গলায় ঋক বললো।

আপনি কি পুরুষ মানুষ ? আমি আমার স্বামীকে ভয় পেতে পারি, আপনি পাবেন কোন দুঃখে ?

স্যার ! প্লীজ পার্ডন মী !

বললো ঋক।

ঘেন্না হলো তৃষার ঋকের ওপরে।

বললো, নেমে যান আপনি। আমি একাই চলে যাব। সোজাই তো রাস্তা।

আমার স্ত্রী কখনও রিক্সা করে বাজারে ঘুরবে না।

বাঃ। তুমিই তো বলেছিলে রিক্সা করে যেতে।

বলেছিলাম। রিক্সা করে কোনো ডেস্টিনেশনে যাওয়া এক আর এরকম ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো আর এক।

প্রণতর চিৎকারে কিছু উৎসাহী বেকার জুটে গেলো মজা দেখতে।

তৃষা কঠিন গলায় বললো, চলো রিক্সাওয়ালা।

রিক্সাওয়ালার যে যখন সওয়ারী সেই তখন তার মালিক। সে সওয়ারীর কথামতো প্যাডেলে চাপ দিলো।

প্রণত বললো রিক্সাওয়ালাকে, মারেগা এক ঝাপ্পট্।

রিক্সাওয়ালা বললো, জবান সাম্হালকে বাত কিজিয়েগা। গাড়িপর সওয়ার হুয়াতো নবাব বন্ গ্যায়া কি আপ ? ম্যায় দাঁত তোড় দুংগা আপকি।

ক্যা বোলা ? তুম জানতে হো ম্যায় কওন হুঁ ? আভ্ভি এস. ডি. পি. ও সাহাবকো বোলকে তুমকো ভর দেগা থানেমে।

কিঁউ ? হাম কওন্সি কসুর কিয়া ? বড়া খান্দান কি ক্যা এহি হরকৎ হ্যায় ? মিঞাবিবি রাস্তেপর আকর কুত্তোকি মাফিক লড়তে হে'।

রিক্সাওয়ালা ঘেন্নার সঙ্গে বললো।

ক্যা বোলা তুমনে ?

এবার প্রণত রিক্সাওয়ালাকে বললো ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে এসে।

রিক্সাওয়ালা ফট্ করে নেমে দাঁড়িয়ে রিক্সার পেছন থেকে একটা সাইকেলের চেইন বের করে হাতে নিয়ে বললো, আপনা জান সামহালকার ঔর আগে বাড়িয়ে গা।

প্রণত কিন্তু মারতে পারলো না রিক্সাওয়ালাকে শেষ পর্যন্ত। রিক্সাওয়ালার সংহারমূর্তি দেখে পেছিয়ে গিয়ে বললো, রিক্সাওয়ালাসে ম্যায় ক্যা লড়েগা ? হামারা ইজ্জৎ……

হঠাৎ ঋক বললো রিক্সাওয়ালাকে, আররে ! ই সাব স্টিভেন কোম্পানীকো মেইনটিনেন্স এঞ্জিনীয়র হ্যায়। ভারী বড়া সাব।

রিক্সাওয়ালা বললো, ছোড়িয়ে তো। হামারা ক্যা আয়াগ্যায়া? নোকরী দিজিয়েগা উনোনে হামারা লেড়কাকো? ফজ্‌ল বাঁতে ক'রতে হ্যায় ইন্‌লোগোনে। ডর্‌পোক কাঁহাকা। মারনেকা হিম্মৎ হোতা তো তব কুছ সমঝতাথা। আপনা ইজ্জৎ পর থুক্‌ কর আপনা বিবি লেকর ঘর চলা যাইয়ে সাহাব।

এবার ঋকের দিকে ঘুরে বললো, হামারা ভাড়া দে কর মুঝে ছুট্টি কর দিজিয়ে।

ঋক পকেট থেকে একটা ফাটা মানিব্যাগ বের করলো।

তৃষা বললো, আমি দিচ্ছি।

প্রণত বললো, কিতনা হুয়া?

বহুত টাইম্‌ খাড়াথা উ জঙ্গলমে, হুরীনানাকি পাস। প'দরো রুপাইয়া দিজিয়ে কম্‌সে কম্‌।

তৃষা ভেবেছিলো প্রণত দর করবে। কারণ রিক্সাওয়ালা অনেক বেশি চাইছে। কিন্তু প্রণত দুটি দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললো, যাও পাঁচ রুপেয়া বর্কাসিস্‌। সেলাম করকে লেনা।

রিক্সাওয়ালা নিজের সবুজরঙা ছেঁড়া মার্কিনের পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি সবুজ পাঁচ টাকার নোট বের করে তাতে থুঃ করে থুথু ফেলে বললো, হামারা সেলাম বহুত মাঙ্গা হ্যায়। কামিনে আদমীওঁসে ম্যায় বকসিস্‌ নেহি লেতা হ্যায়। লিজিয়ে, রাখিয়ে ই নোট।

প্রণত কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফস করে নোটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপরে উড়িয়ে দিলো।

তৃষাও ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছিলো।

রিক্সাওয়ালা বললো, আস্‌লি রহিস আদমীকা জবানসে ঔর এতলাক্‌ ঔর তমন্দুনসে পাত্তা চলতা রহিসী কি। আপ ফালতু আদমী হ্যায়। সিরফ পইসোসে রহিসী কভ্‌ভী না আতি হ্যায় জনাব।

হঠাৎ তৃষা বললো, আমি হেঁটেই বাড়ি যাচ্ছি।

না।

প্রণত বললো।

ঋক ডাকলো, বৌদি।

তৃষা কারো কথার উত্তর না দিয়ে শাড়ির আঁচলটা দিয়ে বুক ঢেকে সোজা বড় বড় পায়ে এগিয়ে চললো।

ঋক বললো, স্যার আমি সঙ্গে যাই।

নো। তুমি জাহান্নমে যাও। কাল অফিসে তুমি দেখা করবে আমার সঙ্গে আমি এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এলেই।

ইয়েস স্যার।

॥ ৩ ॥

এখন রাত প্রায় দশটা। তৃষা গরম জলে চান করে শুয়েছিলো কম্বল গায়ে দিয়ে। টিভির ইংরিজি খবরটা বহুদিনের অভ্যাসবশে শোনে তাই সেটা শুনছিলো।

মুঙ্গলি অনেকবার খাওয়ার কথা বলেছিলো কিন্তু খায়নি তৃষা কিছুই। প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ গাড়ি ঢোকার শব্দ পেলো গ্যারাজে। অথচ প্রণতর তো আসবার কথা ছিল না। রাতটা পাটনাতেই কাটাবার কথা ছিল। তারপরই ঝন্‌ঝন্‌—ক্রিং-ক্রিং একটা আওয়াজ শুনতে পেলো। মুঙ্গলিকে ডেকে তৃষা বললো, দ্যাখ্‌তো মুঙ্গলি কি হলো ?

মুঙ্গলি বললো, সাহাব বহত পিকে আয়া হুয়া হ্যায় মেমসাব। হিক্‌ বাবুকি সাইকেলথা ফেক্‌ দেলিন্‌ বড়ী গোস্সেসে।

মুঙ্গলি "ঋক" উচ্চারণ করতে পারে না। ঋককে বলে হিক্‌।

প্রণত ঘরে ঢুকলো একটু পরই। গাঢ় লাল চোখ। ওর মুখে প্রচণ্ড ক্রোধ পুঞ্জীভূত কিউমুলাস নিশ্বাস, মেঘেরই মতো থমথমে হয়ে জমে ছিল। ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। শীতের জন্যে জানালার পর্দা সব টানাই ছিল। জানালাও বন্ধ ছিল। দরজা বন্ধ করেই বিবস্ত্র হয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল তৃষার দিকে। খাটটা শব্দ করে উঠলো।

তৃষা আতঙ্কে উঠে বসলো। দু পা বুকের কাছে গুটিয়ে বললো, না, না। না—আ।

প্রণত যে ভাষায় কথা বললো তখন তা উচ্চারণ করাও যায় না। বিড়বিড় করে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, ও-ও। বুঝেছি ঋককে দিয়ে···আর স্বামী ।

বলেই, তৃষার উপরে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়লো। তৃষা আর্তনাদ করে বুকের কাছে দু পা জড়ো করে খুব জোরে একটি লাথি মারলো তার পতিদেবতাকে। দেবতা ছিটকে পড়লেন দূরে। তৃষা তাড়াতাড়ি উঠে বেডসাইড টেবল থেকে পেতলের ফুলদানীটা তুলে নিয়ে বললো, আবার যদি কাছে এসেছো তবে তোমাকে খুন করব আমি।

বলতেই প্রণত বেরিয়ে গেলো এবং ফিরে এলো গাড়ি "টো" করার মোটা ড়টা নিয়ে। দড়িটাকে ফাঁসের মতো করে ছুঁড়ে দিলো তুষার মাথার উপর য় তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বেঁধে ফেললো তাকে। খুবই লাগলো তুষার। া ভাবছিলো, যা বড় সোহাগে, আদরে স্বামীকে দেওয়ার ছিল তা যে এমন বে দিতে হবে তা কে জা· তো!

প্রণত তুষাকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছেঁচড়ে টেনে এনে বালিশের ওয়াড় খুলে র দুটি হাত এবং পা বাঁধলো। মুখের মধ্যে ঘামের গন্ধ মাখা নোংরা মাল ঢুকিয়ে দিয়ে তুষাকে তুলে এনে রকিং চেয়ারটার ওপরে বসালো। পরেই, আবার বেরিয়ে গেলো।

তুষার এবারে খুব ভয় করতে লাগলো। ওকে যখন রকিং চেয়ারে বসিয়ে লো তখন তুষার শরীরের আর কোনো ভয় নেই। শারীরিকভাবে আর পীড়ন করবে না প্রণত। এবার কোনো নতুন মানসিক অত্যাচারের কথা বছে বোধ হয় ও। কিন্তু সেটা কি? ভয়ে গলা শুকিয়ে গেলো তুষার। মাল ঢোকানো থাকাতে এমনিতেও শুকিয়ে যাচ্ছিলো গলা।

একটু পরই মুঙ্গলির গলার স্বর শুনতে পেলো তুষা। মুঙ্গলি আর্ত ংকার করছে না। নীচু গলায় বলছে, নেহি নেহি, মেমসাহাবকি সামনা হি। ছোড় দিজিয়ে সাহাব। আব সব বলিয়েগা, যাঁহা বলিয়েগা···ম্যায় ভি না বোলতি।

মুঙ্গলির এই সব কথা শুনে আত্মারাম কেঁপে উঠলো তুষার। মুঙ্গলি! স্বামীর আসল শয্যাসঙ্গিনী তাহলে ওই সরল শক্ত-সমর্থ মাংসল শরীরের ঙ্গবাসী মেয়েটি।

মুঙ্গলিকে জোর করে টানতে টানতে এনে প্রণত ঘরে ঢুকলো। মুঙ্গলি দো কাঁদো গলায় বলছিলো, ঈয়ে ঠিক নেহি হ্যায়। বহুতই খরাব...। তেই······।

প্রণত বললো তুষাকে, দ্যাখো তোমার সামনেই মুঙ্গলিকে আমি মার চেয়ে ও সব দিক দিয়ে সুন্দর! কী আছে তোমার বিদ্যা মোর আর বদমাইসী জেদ ছাড়া। তোমার যোগ্য হলো ঐ জুনিয়র াকাউন্ট্যান্ট।

বলেই বললো, আই মুঙ্গলি খোল্। খোল্ শাড়ি। সব খোল্।

প্রণতর ক্ষণিক অনামনস্কতার সুযোগে মুঙ্গলি দৌড়ে পালিয়ে গেলো ঘর কে। পিছু পিছু প্রণতও দৌড়লো।

তুষা ভাবছিলো, ভারী ভালো মেয়ে মুঙ্গলি। ও কি করবে। গরীব মানুষ, যৌবন আছে, মেয়েদের যা সবচেয়ে বড় সম্পত্তি তাই ভাঙিয়ে কিছু করে য়, নিরুপায়ে। মেয়েদের নিরুপায়তার স্বরূপ শুধু মেয়েরাই জানে। তবু ঙ্গলি যদি রাজী হতো প্রণত যা বলছিলো তা তুষার সামনেই করতে, তবে াকে যে কতবড় অপমান করা হতো তা মুঙ্গলি মেয়ে বলেই বুঝেছিলো।

বাইরে থেকে প্রণত আর ফিরলো না। গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ শুনলো।

খকের সাইকেলটাকে চাপা দিয়ে মড়মড় করে ভেঙে দিয়ে গাড়িটা চলে গেলো হেড লাইটের আলো কম্পাউন্ড ঝেঁটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। মালী গেট বন্ধ করলো সেই শব্দ শুনতে পেলো তৃষা! মুঙ্গলিও কিন্তু ফি এলো না আর। তৃষা জোরে ডাকলো মালী-ই-ই। কিন্তু আওয়াজ হলে না কোনো। ব্যথা করছিলো গলায় গালে আর চোখে। তৃষার দু চোখ বে জল গড়াতে লাগলো। শীতও করতে লাগলো খুব। কম্বলটা যে গায়ে দি দেয় কেউ এমনও নেই একজন।

অনেকক্ষণ পর বসবার ঘরের মেঝেতে সাবধানী খস্‌খস্‌ একটা শ শুনতে পেলো তৃষা। কথা না বলতে পেরে বসবার ঘরের আর শোওয়ার ঘরে মধ্যের পর্দার দিকে চেয়ে রইলো ও। কেউ আসছে ঘরের দিকে। বাইরে কেউ? মালী? ভাল্লুকের মতো রোমশ চেহারা। খুব শক্তি ধরে শরীরে।

বেডরুমে কেন আসছে মালী? মালী কি?…পুরুষজাতকে কখন বিশ্বাস নেই। মা শিখিয়ে দিয়েছিলেন এক বিশেষ দিনে যেদিন ও বড় হ গেছিলো হঠাৎ। সে বড় সুখের অথচ দুঃখের দিন। বড় ভয়ের দিন। ম বলেছিলেন…

মালীই! পর্দা ঠেলে মালী কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলে হলুদরঙা স্বচ্ছ নাইটি-পরা তৃষার দিকে। পরক্ষণেই লজ্জায় চোখ নামি নিলো। বিড়বিড় করে বললো, হায় ভগবান।

মালী কী ভাবলো একটুক্ষণ, তারপর এগিয়ে এসে তৃষার হাত-পায়ে বাঁধন, মুখের রুমাল তারপর দড়িটাও খুলে ফেললো একে একে।

তৃষা মাথা নীচু করে বসেছিলো। তখনও হতভম্ব ভাবটা কাটেনি।

মালী বললো, হাতে মুখে জল দিয়ে নিন মেমসাব।

তারপর তৃষার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললো, আপনি কী করবেন কলকাতা যাবেন বাপের বাড়িতে?

পড়ে আমার বাপের বাড়ি নেই মালী।

চুকে নেই মানে?

ছিল ঐ। না থাকারই মতো।

দিল ওঃ।

মুঙ্গলি কোথায় গেছে মালী?

মুঙ্গলিকে তো সাহাব সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ম্যানেজারবাবুর বাড়ির পথে গেলেন।

মুঙ্গলি কি খারাপ মেয়ে? মালী?

মালী মাথা নীচু করে বললো, খারাপ বলবো না। খারাপ ও নয়। মনে হয় সাহাবই ওকে খারাপ করে দেন মাঝে মাঝে। ওরা বড় গরীব। স্বামীটা রোজগার করতে পারে না, ওকে আদরও করতে পারে না। গাছ কাটতে গিয়ে পায়ের ওপর গাছ পড়ে ওর দুটি পা-ই গেছে। তাই মুঙ্গলির প্রয়োজন অনেক রকম। এবং জরুরী প্রয়োজন সব। সাহাব তারই সুযোগ নিচ্ছেন।

মঙ্গলির ছেলেমেয়ে নেই ? আমি কখনও জিগ্যেস করিনি।

না। ওর ছেলেমেয়ে হবেও না।

তারপরই বললো, আপনি এখন কি করবেন মেমসাহেব ?

তুমি আমাকে একটা রিক্সা ডেকে দেবে ? পাওয়া যাবে রিক্সা শীতের এতো রাতে ?

তা পাওয়া যাবে। তবে বাজার অবধি হেঁটে যেতে হবে। যদি আপনি বলেন তো যাব ডাকতে। কিন্তু যাবেন কোথায় ? এতে রাতে ? আপনার তা রিস্তেদার কেউ নেই এই মুরাদগঞ্জে।

না। তা নেই। আচ্ছা মালী, আমি চোখে মুখে একটু জল দিয়েই আসছি। তুমি বারান্দাতেই থাকো।

জী মেমসাব।

বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি তুলে দিতেই হু হু করে জল নামলো তৃষার চোখে। কত স্বপ্ন আর কল্পনা মিশিয়েই এই বাথরুম না রেনোভেট করেছিলো ! দেওয়ালের রঙ, সেই রঙে মেলানো টাইলস্, শাওয়ার, শাওয়ারের পাশে হালকা সবুজরঙা পলীথিনের আড়াল। কত ভেবেছিলো ! কী ভেবেছিলো, স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে চান করবে একদিন শাওয়ারের নীচে। আরও কত কত কিশোর থেকে জমিয়ে রাখা সব নানারঙা কল্পনা ! সবই মিথ্যে হয়ে গেলো। বড় তাড়াতাড়ি সবকিছু মিথ্যে হয়ে গেলো। এর পেছনে কি ছোটমামির কোনো হাত ছিল ? মাঝে মাঝেই প্রণতর কাছে খামে চিঠি আসে কলকাতা থেকে PERSONAL' লেখা। যে লেখে তার হাতের লেখাটি একেবারে ছোটমামীর হাতে লেখার মতো। ছোটমামা মায়ের থেকে বয়সে অনেকই ছোট ছিলেন। ছোটমামীও বয়সে তৃষার সমবয়সীই হবে। মেজমামা নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক। মেজমামার তৃষার উপরে অন্ধ ও অগাধ স্নেহটা ছোটমামী তার বিয়ের পর থেকে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেনি। ছোটমামার বিয়ে হয়েছে দু বছর। মামাদের মধ্যে ছোটমামাই একমাত্র WASTER। পরিবারের যৌথ ব্যবসাও দেখে না। শুধু রেসের মাঠ আর মদে টাকা ওড়ায়। অনেক ছোট, আদরের ভাই বলে অন্য মামারা কিছুই বলেন না। ছোটমামার বিয়েতেও মামাদের আপত্তি ছিল। একবার পাটনাতে বেড়াতে গিয়ে অজ্ঞাতকুলশীল এই ছোটমামী, সুন্দরী বৃন্দাকে সঙ্গে করে এনে তোলে ছোটমামা। চেহারা সত্যিই বেশ ভালো, কিন্তু সেজমামী বলেছিলেন হাবভাব যেন বাইজীর মতো ! সেই সৌন্দর্যে কোনো সম্ভ্রান্ততা ছিল না। রেজিস্ট্রী করেই এসেছিল পাটনা থেকে। তাই বিয়ে দিতেই হয়।

ছোটমামীর আত্মীয় বলতে শুধু এক মামা। হাজামৎ-এর মতো হাবভাব তাঁর। কান দুটো বড় বড়। অত্যন্ত ধূর্ত এবং দুশ্চরিত্র মানুষ। চেহারা দেখলেই মনে হয় প্রতি সন্ধ্যেবেলা গাঁজা খান। ওঁকে নিয়ে মামাবাড়িতে বেশ অশান্তিও হয়েছিলো। এই ছোটমামীমা বৃন্দাই প্রণতর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছিলো তৃষার। প্রণতর বাবা-মায়ের পরিচয় দিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা প্রণতর

আসলে কেউ যে নন এ কথা তৃষা বিয়ের অনেক পরে জানতে পেরেছে। আ
বাবা-মা নাকি মতিহারীর এক বস্তিতে থাকেন। প্রণত কোনোদিনও তাঁদের খে
নেয় না। তাঁরা নাকি প্রায় না-খেয়েই থাকেন। এসবও তৃষা জেনে
মতিহারী থেকে তৃষাকে গোপনে লেখা প্রণতর ছোট বোনের চিঠি থেকে। ম
কদিন আগে। একবার সে মতিহারীর একজন লোককে সঙ্গে করে তৃষার সা
মুরাদগঞ্জে দেখাও করতে এসেছিলো। প্রণত তখন ট্যুরে, রাঁচীতে গেছিে
দশ দিনের জন্যে। মেয়েটির মাথায় একটু গোলমাল আছে। তবে ভারী সরল
বঞ্চিত। মুঙ্গলিকে তার আসল পরিচয় দেয়নি তৃষা। মুঙ্গলি মেয়ে
এমনিতে সরলই। আজ তার অন্য রূপ জেনে ভারী আহত বোধ করছিলো ও

মুখ ধুয়ে নাইটি ছেড়ে শাড়ি পরলো। যে শালটা বের করেছিলো কা
আগে এবং হাতের কাছে ছিল সেটাই জড়িয়ে নিলো। ছোট অ্যাটাচিতে মামাে
দেওয়া গয়নাগাটি, নিজের ব্যক্তিগত কিছু জিনিস এবং হাজার টাকা, যা বিয়ে
পাওয়া টাকা থেকে ব্যাঙ্কে দেওয়া হয়নি তাই শুধু সঙ্গে নিল। একটি বলপয়ে
পেন। তারপর চটি গলিয়ে বাইরে এলো।

কৃষ্ণপক্ষর রাত। অন্ধকার। কিন্তু ঝকমক করছে তারারা আকাশময়
একবার মুখ তুলে উপরে তাকালো। তাকাতেই দুচোখ আবার জলে ভে
গেলো। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলো তৃষা। কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থে
বাইরে এসে বসলো চেয়ারে। একটি কুকুর কেঁদে যাচ্ছে পথ দিয়ে। কো
কেউ সাইকেল চালিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে যেতেই কুকুরটি ঘেউ ঘেউ ক
তাকে ধাওয়া করে গেলো। তারপর আবার চুপচাপ। গেটের একটু বাঁপাে
চা সিঙ্গাড়ার দোকানী রাত গভীর হলে শুয়ে পড়ার আগে রোজ তুলসীদা
পড়ে সুর করে। বেশ একটা আমেজের সৃষ্টি হয়। অন্য এক পরিবেশ।

মালী ওর ভাবনার রেশ কাটিয়ে দিয়ে বললো, কাঁহা যাইয়েগা মেমসাব?

কোনো হোটেল টোটেল নেই? তোমাদের মুরাদগঞ্জে?

যেরকম হোটেল আছে তাতে একা আওরাতের পক্ষে থাকাটা খুবই বিপদে
হবে।

না বলে বললো, বিপদ এখানেই বা কম কী!

মামাদের উপরে, এই দেশের উপরে, এ দেশের মেয়েদের এই নিদারু
অসহায়তার কারণে তীব্র এক ঘৃণামিশ্রিত রাগ হলো তৃষার। এ দেশে এক
একজন মেয়ের মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্যে আর
কতদিন যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে তা কে জানে! "উইমেনস লিব্" শু
শহরের কিছু উচ্চবিত্ত মেয়েদের শখের পাস্ট-টাইম। গ্রামে গঞ্জে, শিক্ষি
অশিক্ষিত কোটি কোটি মেয়েদের যে কী নিদারুণ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচারে
মধ্যে এবং আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে হয় তা যদি সেই স
শৌখিন লিবারেশানের প্রবক্তারা একটুও জানতেন!

ভাবলো তৃষা।

তবে এখানে সে আর একমুহূর্তও থাকবে না। এই অপমানকর অবস্থা

চেয়ে বরং ভেসেই যাবে ভাগ্যের ভরসায়, যেখানে গিয়ে ঠেকে ; কিন্তু মরে গেলেও আর কিছুতেই এই বর্বরের সঙ্গে একদিনও ঘর করবে না।

মালী দাঁড়িয়েছিলো মেরুন রঙা একটা ছেঁড়া ফুলহাতা সোয়েটার আর ধুতি পরে। খালি পা। ওর শীত করছিলো খুব। বুঝতে পারছিলো তৃষা।

তৃষা বললো, রিক্সা ডাকো মালী। দুটো রিক্সা ডেকো।

দুটো কেন ?

একটাতে আমি যাব। আরেকটাতে ঋকবাবুর সাইকেল। সাইকেলটা কি মেরামত হবে ?

বোধহয় না।

যাও তবে। ডেকে আনো রিক্সা।

আপনি কি ঋকবাবুর ডেরায় গিয়ে উঠবেন ? লোকে কি বলবে মেমসাব ?

লোকে কি বলবে তা নিয়ে আমি আর ভাবি না মালী। এখানে আমি আর থাকবো না। ঋকবাবুকে আমি বেশি না জানলেও এটুকু জেনেছি যে মানুষটি ভালো। তিনি এই বিপদের সময়ে আমাকে পথে বের করে দেবেন না। রাতটা তো কাটুক তার পরে কী করা যায় ভেবে দেখব। কালকে দুপুরে তুমি একবারের জন্যে যদি সুরাইয়াটোলিতে আসো। চেনো কি ঋক-বাবুর বাড়ি ? তাহলে তোমার হাতে তোমার সাহেবকে একটি চিঠি দেব। পারবে আসতে ?

দেখি। বাড়ি আমি চিনি। সে তো বহুতই সাম্নাটা জায়গাতে। রাত ভর একা আওরাত আপনি থাকবেন কি করে সেখানে ?

সব আওরাতই একা মালী! পৃথিবীর সব আওরাতই আমার মতোই একা। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। এবারে তুমি যাও। বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

যাই মেমসাব।

মালী চলে যেতে বারান্দাতে বসে তৃষা ভাবছিলো, মালীর সঙ্গে এতো কথা বলা তার উচিত হয়নি। মালী হয়তো এতো কথা বুঝলোও না। উল্টে কী ভাবলো হয়তো ওকে। কিন্তু যে মানুষের কেউ নেই সে হয়তো কুকুর-বেড়ালের সঙ্গেও কথা কয়। মানুষকে যখন কথায় পায় তখন সে হাওয়ার সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, পথের সঙ্গেও কথা কয়।

রিক্সাটা আসতে যতক্ষণ দেরি। তারপরই তৃষার জীবনে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবে। আরম্ভটুকুই জানে শুধু সে, শেষটুকু জানে না। ঋক তাকে এতো রাতে আদৌ আশ্রয় দেবে কি না কে জানে ? রাতটুকু আশ্রয় দিলেও তার পরে কি করবে তা একেবারেই অজানা। অথচ ঋক ছাড়া অন্য কাউকেই তৃষা জানে না এখানে যার কাছে সে যেতে পারে ! এতো রাতে এতো গয়নাগাটি, নগদ হাজার টাকা নিয়ে ঐ নির্জন পথে যাওয়া আদৌ উচিত হবে না হয়তো। কিন্তু তৃষার মন থেকে সব ভয় উবে গেছে। কিছুকেই সে আর

ভয় পায় না। তার নারীত্বের এমন এক গোপন নরম কুঠুরীতে সে চরম আঘাত পেয়েছে যে তার পক্ষে আর কোনো আঘাতকেই আঘাত বলে মনে হবে না যে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। ভয় এখন একটাই। ঋক যদি তার চাকরি খাবার ভয়ে তৃষাকে ফিরিয়ে দেয়, আশ্রয় না দেয়! তাহলে কি যে হবে তা ভাবতে পর্যন্ত পারছে না ও।

কতক্ষণ কেটে গেলো কে জানে। ভাবনায় পেলে সময়ের হুঁশ থাকে না কোনো। মালী যখন দুটি রিক্সা নিয়ে গেট খুলে ভিতরে ঢুকলো, দুটি রিক্সার চার চাকাতে কির্‌কির্‌ শব্দ উঠলো কাঁকুরে মাটিতে তখন সম্বিৎ ফিরে পেলো তৃষা। উঠে দাঁড়িয়েই বললো, চলো।

মালী একটি রিক্সাকে গারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে তালগোল পাকানো ঋক-এর সাইকেলটাকে তুললো তাতে। তুলে নিজেও সীটের উপর উঠে বসলো।

তুমি যাবে মালী? তোমার সাহাব যদি ফিরে আসেন এর মধ্যে।

এলে আসবেন।

তোমার উপর যদি রেগে যান? যদি ছাড়িয়ে দেন তোমাকে?

আমি আমার মালিকের চাকর। ভাড়াটের চাকর নই। সাহাব তো মালিকের ভাড়াটে। আর তেমন হলে চাকরি না হয় ছেড়েই দেবো। পেটের জন্যে চাকরি করি মেমসাব। যতক্ষণ এই হাতদুটো আছে ততক্ষণ এ চাকরি গেলেও অন্য কিছু করতে পারব। কিন্তু ইনসান্‌-এর মতো না বাঁচলে বেঁচে থেকে লাভ কি? আমার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।

বাগানের আলোতে মালীর শক্ত সুগঠিত শির-ফোলানো হাত দুটির দিকে তাকিয়ে তৃষা ভাবলো ওর যদি অমন দুটি হাত থাকতো! তাহলে ও-ও হয়তো বলতে পারতো, আমার জন্যে কারও চিন্তা করার দরকার নেই। যে যাই বলুক এখনও একজন পুরুষে আর নারীতে অনেকই তফাৎ এই দেশে। কবে যে তারা সমান হবে!

রিক্সা চলেছে। আগে মালীর রিক্সা, পেছনে তৃষার। দু পাশের দোকান-পাট প্রায় সবই বন্ধ। দু একটি দোকানের প্রায়-বন্ধ ঝাঁপ থেকে আলোর ফালি এসে পড়েছে পথে। দু একটি সাইকেল যাচ্ছে। রিক্সা প্রায় নেই বললেই চলে। দোতলা বাড়ির মতো উঁচু মাল-বোঝাই মার্সিডিস ট্রাক জোরে হর্ন বাজিয়ে হেডলাইট জেলে ন্যাশানাল হাইওয়ের দিকে ছুটে চলেছে।

স্যুটকেসটি কোলের উপরে নিয়ে অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে তৃষা। চোখ দুটি মাঝে মাঝেই ভিজে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে জলে। কিন্তু রুমাল দিয়ে মোছারও চেষ্টা করছে না ও। জীবনই যখন ভেসে গেলো তখন ভাসা-চোখের খোঁজ কে আর রাখে।

সুরাইয়াটোলির দিকে মোড় নিতেই অন্ধকার গ্রাস করে ফেললো রিক্সা-দুটোকে। আগে আগে যাওয়া সামনের রিক্সাটাকেও যেন দেখা যাচ্ছে না। ঐ রিক্সার পেছন দিকে তলায় ঝুলোনো আলোটা আর ওর রিক্সার হ্যাণ্ডেলের মাঝে বসানো কেরোসিনের আলোটা যেন অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে দিলো।

মাথার উপরে আঁচলটা তুলে দিলো তৃষা। শিশির পড়ছে। শিশিরে রিক্সার সীট ভিজে গেছে। বড় বড় শিমুল, মহুয়া আর ঝাটিজঙ্গল বোধহয় ছাড়িয়ে এলো। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শালবন থেকে ভেজা শালপাতার আর ভেজা মাটির মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসছে। নদীর দিক থেকে শেয়াল ডেকে উঠলো। প্রথমে একটি। তারপরে অনেকগুলো। রাত এখন প্রায় বারোটা হবে। প্রচণ্ড শীত। তাই মনে হচ্ছে রাত দুটো। বিশেষ করে সুরাইয়া-টোলির এই রাস্তায়। কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। দুটি বাদুড় উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে সপ্‌সপ্‌ শব্দ করে। ভয় পেলো তৃষা।

মালী সঙ্গে না থাকলে ঋক-এর নিষ্প্রদীপ মাটির বাড়ি এই অন্ধকারে চিনতেই পারতো না তৃষা। বাড়ি ফেলে চলে গেলে এই পথ বেয়ে কোথায় যে গিয়ে পৌঁছতো তাও ও জানে না।

রিক্সাওয়ালাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে শুধোলো, এই পথ কোথায় গেছে?

রিক্সাওয়ালা বললো, সুরাইয়াটোলি-এর কবরখানায়।

গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো তৃষার।

ততক্ষণে মালী রিক্সা থেকে নেমে ঋক-এর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হিক্‌ বাবু! হিক্‌ বাবু শো গ্যয়া ক্যা? হিক্‌ বাবু! বলে ডাকতে লাগলো। ওর রিক্সাওয়ালা কিরিং কিরিং করে ঘণ্টা বাজাতে লাগলো। তার দেখাদেখি তৃষার রিক্সাওয়ালাও।

তৃষা বললো, আস্তে। ভাবলো, গাঢ় ঘুমের মধ্যে এমন হঠাৎ শোরগোলে বেচারার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেলে শরীর খারাপ হতে পারে।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি আর ঘণ্টি বাজানোর পর হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে ঋক দরজা খুললো। অন্য হাতে লাঠি।

মালী বললো, মেমসাব আয়া। রাতে হিঁয়াই বিতানা।

কওন্‌ মেমসাব?

হামারা মেমসাব।

কাহে? ক্যা হুয়া?

সো উনোনে খুদ্‌হি বাতায়েঙ্গী আপ্‌কি।

অবাক হয়ে ঋক তৃষার রিক্সার দিকে এগিয়ে এলো। লণ্ঠনটা তুলে ধরলো ওর মুখের কাছে। জলের ধারা চোখ থেকে নেমে দুগাল বেয়ে বুকের কাছে শাড়ি ভিজিয়ে দিয়েছিলো। অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো ঋক। ওর চোখ এড়ালো না তা।

তৃষা বললো, নীচু স্বরে, আমি কি ফিরে যাব?

ঋক একবার ওর সাইকেলটার দিকে চেয়ে মালীকে বললো, ক্যায়সে হুয়া?

মালী বললো, সাহাব গাড্ডিয়া চড়হা দিয়ে থে।

নিরুত্তাপ গলায় ঋক বললো, কাহে?

গোস্‌সেসে।

ও।

বলেই, লাঠিটা আর লণ্ঠনটা মালীর হাতে দিয়ে বাঁ হাতে তৃষার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে ডান হাতে তৃষাকে হাত ধরে রিক্সা থেকে নামালো যত্ন করে। বললো, আসুন বৌদি। নির্ভয়ে আসুন। আমার বাড়িতে আসার জন্যে দেখলেন তো কত হেনস্থা হলো। বলেছিলাম আমি আপনাকে। আগেই বলেছিলাম। কথা তো শুনলেন না।

তৃষা বললো, বৌদি নয়, বলুন তৃষা।

এক মুহূর্ত থেমে, তৃষার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঋক বললো, হ্যাঁ তাই বলব। অনেকদিন আগে থেকেই বলব ভেবেছিলাম।

তৃষা বললো, মালী, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। বাড়ি খালি পড়ে আছে। সব খোলা। চুরি হলে তুমিই দায়ী হবে।

আপনিই চলে এলেন মেমসাব! বাড়ি তো খালিই হয়ে গেলো। চোরের নেবার মতো আর কি রইলো? নমস্তে মেমসাব।

তৃষা ওর হাত-ব্যাগ থেকে একটি কুড়ি টাকার নোট বের করে মালীকে দিলো। আর দশ টাকা রিক্সাওয়ালাদের। রিক্সাওয়ালারাও বললো, নমস্তে মেমসাব।

তারপর রিক্সা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলো। রিক্সা দুটির পেছনের দুলতে-থাকা লালচে আলো দুটিকে অন্ধকার আর কুয়াশা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিলো। আকাশে মেঘ করেছে। নদীর দিক থেকে কনকনে হাওয়া আসছে।

ঋক বললো, ভিতরে চলো।

তৃষা একটু অবাক হলো। ঋক তাকে শুধু তুমি বলে সম্বোধন করলো বলেই নয়, ঋক-এর গলার স্বরে এক দারুণ আত্মপ্রত্যয় ঝরে পড়লো বলে। আজ দুপুরবেলার ঋক বা যে ঋককে সে তিনমাস ধরে চিনতো, বিয়ের পর যখন প্রথম মুরাদগঞ্জে ওরা এলো তখন যে ঋক পাটনা স্টেশনে ওদের রীসিভ করতে এসেছিলো রামখেলাওন এর সঙ্গে, সেই সব ঋক-এর সঙ্গে এই ঋক-এর কোনোই মিল নেই। একজন মানুষের মধ্যে যে কতজন মানুষ লুকিয়ে থাকে। এই মুহূর্তের তৃষার সঙ্গে আজ সন্ধ্যেবেলার তৃষারও কোনো মিল নেই।

ঋক বললো, কিছু খাবে?

একটু জল।

এই ঠাণ্ডাতে জল? চা করি একটু? তোমার এই মধ্যরাতের অভিসারের রহস্যটা শুনতে শুনতে চা হয়ে যাবে।

আমি যে কম্বল টম্বল কিছু নিয়ে আসিনি। বিছানা!

সব হয়ে যাবে। সে সবের জন্যে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। রান্নাঘরে চলো। আমি চায়ের জলটা গরম করি ততক্ষণে তুমি বলো তো কেন এই মাঝরাতে চলে এলে এখানে।

তৃষার বলতে ইচ্ছে না করলেও ওকে বলতে হলোই। ঐ ঘটনা বা ঘটনাবলীর কথা বলতে গিয়ে তৃষার নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। বড় ঘেন্না হচ্ছিলো নিজের উপর। এবং তা শুনতে শুনতে ঋক-এর চোয়াল শক্ত

হয়ে এলো। স্টোভের সামনে উবু হয়ে বসা ঋকের টকটকে ফর্সা গাল চোয়াল এবং চিবুকে আগুনের লাল আভা লেগে আশ্চর্য দেখাচ্ছিলো ঋককে। মনে মনে খুব খুশি হলো তৃষা। এই আপাতঃ লাজুক, চাকরি হারাবার ভয়ে সদাই ভীত মানুষটিকে চিনতে ভুল করেনি তাহলে ও।

তৃষার হাতে চায়ের কাপটি দিয়ে ঋক বললো, আশ্চর্য! তুমি যা বললে তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। স্যার মানুষটা কিন্তু খারাপ না। মদই খেয়ে ফেললো ওঁকে। আর লোভ। ভাবলে কষ্ট হয়। চোখের সামনে কত ভালো ভালো মানুষ এই লোভে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বললো, ভাগ্যিস আমি ওখানে ছিলাম না। থাকলে প্রণতবাবু মার্ডার হয়ে যেতেন আমার হাতে। যাই বলো, তুমি দুপুরে আমার এখানে জোর করে না এলে এতো সব ঘটতো না কিন্তু। আমি খুবই লজ্জিত, বিব্রতও। তোমার এতো বড় ক্ষতি করে দিলাম।

হয়তো আজ ঘটতো না, কিন্তু এর পরে, ছ মাস পরে বা এক বছর পরে বা দু বছর পরে ঘটতোই। এতো বড় একটা ভুলকে আরো এতোদিন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে কি এই ভালো হলো না? তার সং প্রকৃতি তো চাপা থাকতো না! কি বল?

তা অবশ্য ঠিক। তবে আমি কোনো মানুষকেই খারাপ বলে মানতে রাজী নই। এভরীবডি হ্যাজ টু সাইডস্।

একটু চুপ করে থেকে ঋক বললো, আমি ভাবতেও পারছি না যে নিজের স্ত্রীকে শাড়ি টো করার দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে নোকরানীর সঙ্গে সঙ্গমে প্রয়াস করার মতো রুচির মানুষ সত্যিই থাকতে পারে। আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির কাছেই একজন মোটর ভেহিকেলস্ ইনস্পেক্টর ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে এই রকম ব্যবহারের গল্প শুনতে পেতাম বড়দের মুখের কানাঘুষোয়। কিন্তু গুজব তো গুজবই। সত্যিই যে এমন কেউ করতে পারে, শিক্ষিত কোনো মানুষ, তা ভাবতে পর্যন্ত পারছি না আমি।

চায়ের কাপ দুটি গরম জলে ধুয়ে রেখে একটি বোতলে গরম জল ভরে নিলো ঋক। তারপর বললো চলো, নতুন চাদর আর বালিশের ওয়াড় বের করে দিচ্ছি। তুমি আমার চৌপাইতেই শুয়ে পড়ো। আমার লেপের নীচেই শোও আজ। আমার শরীরের গরমে গরম হয়ে আছে। কাল থেকে একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করা যাবে।

তুমি কোথায় শোবে?

আমি রান্নাঘরেও শুতে পারি।

সেকি? মাটিতে?

খড় বিছিয়ে নেবো।

না, না সে কি।

কোণার ঘরে খড় রাখাই আছে, পেছনের দিকের ছাত মেরামত করার জন্যে। ঘরের তো কোনো অভাব নেই আমার প্রাসাদে!

না না। আমার ভয় করবে একা ঘরে শুতে। এই নির্জন বাড়ি। তার উপর আবার মাটির।

তাহলে ঐ ঘরেই শোব এখন দরজা আগলে। তুমি চলো, আগে চাদর আর বালিশের ওয়াড়টা বদলে দিই।

এতো রাতে ওসবের কি দরকার! থাক না। কালই যা করার কোরো।

ঘুম পেয়েছে? তা তো পাবেই। বাজলো কটা?

দেড়টা।

দেড়টা! ও বাবা। তাহলে তুমি শুয়েই পড়ো। জামা-কাপড় বদলালে বদলে নাও। আমি দরজাটা টেনে দিয়ে যাচ্ছি কোণের ঘরে খড় আনতে।

তৃষার খুব উত্তেজনা বোধ হচ্ছিলো। এই উত্তেজনা প্রণতর হাতে অত্যাচারিত হওয়ার উত্তেজনার থেকেও বেশি। ও শাড়ি ছাড়বে না ঠিক করলো। ঋক-এর সঙ্গে একই ঘরে শুলে নাইটি পরে শোওয়া চলবে না। আলাদা ঘরে শোওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারলে তখন দেখা যাবে। ঘরের কোণে একটি লণ্ঠন রাখা আছে, ফিতে নামানো। মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে সেটা। ব্রেসিয়ারটা শুধু ঢিলে করে নিয়ে তৃষা আস্তে আস্তে ঢুকে পড়লো ঋক-এর লেপের তলাতে, চৌপাইয়ে। সত্যিই ওর শরীরের গরমে গরম হয়ে আছে বিছানা এবং লেপ। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে একটা লেপ থেকে বালিশ থেকে। আতরের গন্ধ। বালাপোষে যেমন থাকে। কী আতর কে জানে! কখনও ঋক-এর এতো কাছেও আসেনি যে আতরের গন্ধ পায়। ঋক যে আতর মাখে তা জানতো না তৃষা। আতরের গন্ধ ও সইতে পারে না। প্রচণ্ড তীব্র লাগে। কিন্তু আজ কেন যে ভালো লাগছে কে জানে! নিশ্চয়ই আতরের অনেক রকম আছে।

ও তখনও পুরোপুরি শোয়নি এমন সময় একটা গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলোর ঝলক এসে পড়লো ওর মুখে জানালার ফুটো-ফাটা দিয়ে। তারপরই গাড়িটা হর্ন দিলো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

ঋক দরজায় টোকা দিল। তারপর দরজা একটু ফাঁক করে বললো, তুমি শুয়ে থাকো ভয় নেই। আমি আসছি।

লাঠি আর লণ্ঠন হাতে দরজা খুললো ঋক।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে প্রণত বললো, হাউ ডেয়ার উ্য ঋক। তুমি আমার ওয়াইফ-এর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছো?

আমি আপনার স্ত্রীকে রাতের মতো আশ্রয় দিয়েছি।

আশ্রয় দিয়েছো মানে? হু দ্যা হেল্ আর উ্য?

প্রণতবাবু, বিহেভ ইওরসেল্ফ। আপনি তৃষার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার পরেও কৈফিয়ৎ চাইবার মতো নির্লজ্জতা আপনার আছে?

আমাকে "স্যার" বলে অ্যাড্রেস্ করো।

করতামই তো বরাবর। আর করবো না।

আই উইল স্যাক উ্য।

প্লীজ ডু।

তুমি আমার স্ত্রীকে ইলোপ্ করেছো।

এতো রাতে এবং এই শীতে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আপনি দয়া করে চলে গেলে ভালো হয়।

চলে যাবো? উ্য স্কাউন্ড্রেল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি শুয়ে থাকবে আর আমি চলে যাবো?

এমন সময় ঋক-এর পাশে এসে দাঁড়ালো তৃষা।

বললো, আমি তোমার স্ত্রী নই।

তার মানে? আমি থানায় যাচ্ছি। আমি অ্যাডালটারীর কেস করব।

করো। কোর্টে যা বলার বলব আমি। এখন চেঁচামেচি না করে চলে যাও। একা শুতে ভয় পাও তো মঙ্গলিকে ডেকে নিও।

শাট আপ্।

এবারে আপনি গেলে আমি খুশি হব প্রণতবাবু।

না গেলে?

ঋক ডান হাতের ছ ফিট লম্বা তেলমাখানো লাঠিটা দেখালো।

তারপর বললো, আমি একা নই। আমার বাড়ির ভেতরে আমার চার পাঁচজন বন্ধু আছে। প্রয়োজনে ......

আচ্ছা! তাই?

হ্যাঁ। নিজের সম্মান নিজের কাছে রাখবেন প্রণতবাবু। এখন সম্মান নিয়ে দয়া করে বাড়ি ফিরে যান। কাল আপনার সঙ্গে কথা বলব অফিসে। আর আপনি যদি তৃষার সঙ্গে কথা বলতে চান এবং তৃষাও বলতে চায় আপনার সঙ্গে তাহলে কাল এখানেই এসে কথা বলবেন।

তৃষা বললো, আমার আর কোনো কথা নেই ওর সঙ্গে।

কথা নেই?

খুব অবাক ও ব্যথিত গলায় বললো প্রণত!

না। নেই।

বলেই তৃষা ভিতরে চলে গেলো।

ঋক বললো, গাড়িটা দেখে ব্যাক করবেন, একটা গাড্ডা আছে রাস্তার ডান পাশে।

তারপর বললো, গরীবের সাইকেলটা না ভাঙলেও পারতেন।

প্রণত পুরো ব্যাপারটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না তখনও। যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। হাত তুললো ও। কী বলবে ভেবে না পেয়ে বললো, গুড নাইট।

ঋক বললো, গুড নাইট। সাবধানে যাবেন। আস্তে। রাস্তা ভালো নয়। তাছাড়া কুয়াসা হয়েছে খুব।

প্রণত উত্তর না দিয়ে গাড়ি ব্যাক করে সত্যিই খুবই আস্তে আস্তে চলে

গেলো। টেইল লাইটের লাল আলোদুটো ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগলো। পথ এবং দুপাশের জঙ্গলকে আলোর বৃত্তে উদ্ভাসিত করে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা শব্দ করতে করতে খুবই আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগলো। বুশ কেটে গেছে বলে ক্যাচক্যাচ আওয়াজ করছিলো গাড়িটা।

এতো আস্তে কেন যাচ্ছে ?

তৃষা বললো পাশ থেকে।

আসলে, ভাবছে প্রণত।

ভাবনার এই তো শুরু।

তৃষা বললো।

আরে তুমি ভেতরে যাও। ঠান্ডা লেগে যাবে। এখানে ভীষণই ঠান্ডা।

তৃষা হাসলো। বললো, আমার কিন্তু একটুও লাগছে না।

চলো।

ভিতরে ঢুকে তৃষা বললো, তোমার বাড়িটাতে কিন্তু একটুও শীত নেই।

ঋজু বললো, আছে, আছে। প্রথম দিন এলে সব জায়গাকেই ভালো লাগে। প্রথম প্রথম সব মানুষকেই।

॥ ৪ ॥

শীতের রাতের অন্ধকার এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়ি চালিয়ে মত্ত অবস্থায় যখন বাড়ির দিকে ফিরছিলো প্রণত তখন তার মাতলামি প্রায় উবে পৌঁছলো। নিজের উপর বড় ঘেন্না হচ্ছিলো ওর। আজ ঋকের মতো একজন সাবর্ডিনেট, যে এতোদিন ওকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছে, সম্মান করে কথা বলেছে, স্যার স্যার করেছে সব সময়ই, সে কেমন আশ্চর্য ব্যবহার করলো! ঐ ঋক-এর মধ্যে যে এই ঋক ছিল তা কখনও দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি আগে। ঐ পুরোনো ঘাড় গোঁজা, চোখের জল-ফেলা, নরম অভিমানী তৃষার মধ্যেও যে এই তৃষা ছিল তাও কখনও ভাবেনি। একজন মানুষের মধ্যে সাতাই অনেক মানুষ থাকে। এবং ঠিক কোন সময়ে যে কোন মানুষটি তার পুরোনো খোলস ছেড়ে ফেলে ঝকঝকে নতুন চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এসে পরিচিতদের চমকে দেয় তা আগের মুহূর্তেও জানা যায় না।

নিজের জন্যে কষ্ট হচ্ছিলো প্রণতর। এই সব কিছুর মূলে তার লোভ, এবং অন্য দুজন মানুষের প্ররোচনা। একজন ম্যানেজার শ্রীবাস্তব। সে এর আগেও কৃপালনী বলে আরেক কলিগের স্ত্রীকেও বশ করে ছিল এমন ভাবে, কৃপালনীকে দিয়েই। কৃপালনীকে আত্মহত্যা করে মরতে হয় এই মনোদৌর্বল্যেই। বাড়ির কম্পাউণ্ডের তেঁতুল গাছ থেকে সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিলো। আর তার সুন্দরী স্ত্রী অনিতা পাগল হয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। একই লোভ দেখিয়েছিলো শ্রীবাস্তব তাকে। তৃষাকে তাকে দিলে প্রণতকে ম্যানেজার করে দিয়ে সে লক্ষ্নৌ বা এলাহাবাদে চলে যাবে। প্রণত তখন মা আর বোনকে নিয়ে আসতে পারবে নিজের কাছে। মাইনে বাড়বে তিনগুণ। ক্ষমতা। ঘুষ। বোনটার মাথার চিকিৎসা করানো দরকার। বাড়ি ছেড়ে নাকি আজকাল পথের মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গা থেকে শাড়ি খুলে যায়। গরীব পাড়ায়ও খারাপ লোকের অভাব নেই। একবার তো এক শেঠ ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে খারাপ পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তোলবার চেষ্টাও করেছিলো। কিন্তু ও কি করবে? যা মাইনে পায় তাতে নিজেরই ভালো করে চলে না। তার উপর স্ট্যাটাস বাড়িয়ে

ফেলে এখন ছুঁচোর হাতি গেলার অবস্থা। ভালো করে চলা মানে, এমন বাড়িতে থেকে, গাড়ি চড়ে, প্রতি সন্ধ্যায় মদ খেয়ে, শনিবার রবিবার তিনপাত্তির খরচ ধরে, তার জামাকাপড়, ঠাট-বাট, মালী মুঙ্গলির মাইনে সব নিয়ে যা খরচ পড়ে তা ঘুষ না পেলে মেটানো যায় না। আর এই ঘুষ যা খায় তার অর্ধেকটা তুলে দিতে হয় শ্রীবাস্তবের হাতে। কারণ তার অজ্ঞাতসারে ঘুষ খেলে চাকরিটাই চলে যেত অনেকদিন আগে। তারপর মুঙ্গলি যা মাইনে পায় সেটাই তো সব নয়। মাসে চার পাঁচশো টাকা ওকেও ধরে দিতে হয়। অভাবের সংসার। অকর্মণ্য স্বামী। কিছু টাকা প্রতি মাসে দিতে হয় বৃন্দার মা বাবাকেও। বৃন্দার মা-ই নষ্ট করেছে সবচেয়ে প্রথম তরুণ আদর্শবাদী অতি অল্পে সন্তুষ্ট এই প্রণতকে। প্রণত এরকম ছিল না। সুন্দরী মাথা মোটা, কিন্তু চরম দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন বৃন্দাকে পোষা সাপের মতো লেলিয়ে দিয়েছিলো বৃন্দার মা একজন যুবকের তারুণ্য, সততা, চরিত্র, সব সুন্দর স্বপ্ন চিবিয়ে খাওয়াতে। শরীর বড় সাংঘাতিক। বিশেষ করে পুরুষের শরীর। এবং একটা বয়সে শরীরের দাস হয়ে কত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সর্বার্থে চমৎকার মানুষই যে নিজেকে কত কুকর্মের শরিক করে তোলে, নিজেকে কী ভাবে নষ্ট করে ফেলে, তার প্রমাণ প্রণত নিজে। প্রণতর সঙ্গেই হয়তো বিয়ে হতো বৃন্দার। মনে না করে উপায় থাকতো না। এমন সময়ে প্রণতর চেয়ে এমনকি শ্রীবাস্তবের চেয়েও ভালো মুরগী পেলো বৃন্দার মা, তৃষার ছোটমামা কুভলু যখন ফুর্তি করতে এলো পাটনাতে। প্রণত, শ্রীবাস্তব সব তখন পাটনাতেই পোস্টেড ছিল। বৃন্দার বিয়ের পর বৃন্দা বুঝেছিলো যে কোনোক্রমে কুভলুকে ছেড়ে ও বাড়ির সবচেয়ে সচ্ছল, বিপত্নীক, উদার, একা মেজমামা বিপ্রদাসকে একবার হাত করতে পারলে বাকি জীবনে আর কিছু চাইবার থাকবে না। আর পুরুষের চরিত্র যতই লখীন্দরের বাসর ঘরের মতো লোহা দিয়ে নিশ্ছিদ্র করে তৈরী হোক না কেন তাতে সাপের প্রবেশ করার মতো উপায়ও থাকে। সবসময়ই থাকে। বৃন্দার মতো কিছু মেয়ে জানে যে সংসারে অসম্ভব বলে কিছুই নেই এবং পুরুষমাত্রই কাঁচের বাসনের চেয়েও বেশি ভঙ্গুর। উপোসী। নিজেদের গাম্ভীর্যের আর ব্যক্তিত্বর মুখোস পরে কোনোক্রমে নিজেদের বাঁচিয়ে ফেরে তারা। যে পুরুষ বাইরে থেকে যত রাশভারী, যত গম্ভীর, যত চরিত্রবান সে ভেতরে আসলে ততই ঠুনকো। খারাপ মেয়ে বৃন্দাকে তার খারাপ-তর মা এসব সহজ পাঠ যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে রেখেছিলো। বেড়ালে যেমন করে ইঁদুর ধরে তেমন করে খেলিয়ে খেলিয়ে এই সব শিকার ধরতে হয়। সময় লাগে, ধৈর্য লাগে। কিন্তু জেদ থাকলে ধরা নিশ্চয়ই যায় কোনো না কোনো সময়ে।

তৃষার মেজমামার সবচেয়ে আদরের পাত্র ছিল মা-মরা তৃষা। সকলেই জানতো যে মেজমামা বিপ্রদাসের সব সম্পত্তি নিঃসন্তান তিনি তৃষাকেই দিয়ে যাবেন। সুতরাং তৃষাকে সরিয়ে দেওয়াই শুধু নয়, তৃষাকে হয় পাগল প্রতিপন্ন করা, নয় একেবারে পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার চক্রান্তে বৃন্দা লিপ্ত হয়েছিলো শ্রীবাস্তব আর প্রণতর সঙ্গে। তৃষার বন্দোবস্ত করতে করতে বৃন্দা নিজেই

বিপ্রদাসকে কব্জা করে তার অংকশায়িনী হতে যে পারবে সে বিশ্বাস বৃন্দার ছিল। পঞ্চাশোর্ধ পুরুষেরা এ সব ব্যাপারে বড় অসহায় হয়ে পড়ে। একটু কার্ণিক মারলেই তাদের ঘুড়ি ভো-কাট্টা হয়ে যায়। ছেনালি এবং কামকেলির সবরকম কলাই তার রপ্ত ছিল। কী ভাবে শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের মেয়েরা স্ত্রী হিসেবে স্বামীদের অনেক ভাবে বঞ্চিত করে রেখে স্বামীদের হারায় তা বৃন্দা জানতো। এবং সেই সব মেয়ের অপূর্ণতাই ছিল বৃন্দার পূর্ণ হওয়ার সুযোগ। পুরুষমাত্রই জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত আদিম, গুহা-মানব এখনও। সেই ক্ষণিক গুহামানবের সঙ্গে গুহামানবী হয়ে খেলতে না পারলে পুরুষের মধ্যে ধীরে ধীরে একধরনের অবসন্নতা, ক্লান্তি, বিরক্তি, এক-ঘেয়েমি জমে ওঠে যা পরে তাকে তিল তিল করে ফুরিয়ে দেয়। জীবনের কিছু কিছু আপাতস্থূল ব্যাপার থাকে যা সমস্ত সূক্ষ্মতার ধারক ও বাহক। এ কথা যে পুরুষ ও নারী না বোঝে তারা একদিন মর্মান্তিকভাবে ঠকে যায়। আর যখন বোঝে তখন বড় দেরি হয়ে যায়।

বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। অন্য অনেক অবাস্তব ভাবনাতে ডুবে গেছিলো প্রণত। পাঁচ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলো বোধহয়। অনেক দূর অবধি চলে গেছিলো মনে মনে। বাড়িতে গাড়িটা ঢোকাতেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। তৃষা নেই অথচ বেডরুমের বেডসাইড ল্যাম্প দুটো হালকা হলুদরঙা শেডের নিচে জ্বলছে। যেমন রোজ জ্বলে। এমনটি ও চায়নি আসলে। নিজেকে যে কোন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে সে কথা ভেবে বড় ঘেন্না হলো ওর নিজের উপর। গাড়িটা গ্যারাজ করলো। গাড়িটাও তৃষার মেজমামার দেওয়া।

আজ রাতে ঋকের সাইকেলটা অমন করে ভাঙা একদমই উচিত হয়নি প্রণতর। বুঝলো ও। লজ্জা হলো। এই ঋককে দেখে ওর নিজের কথা মনে পড়ে যায়। চাকরিতে ঢোকার দু বছর অবধি ও-ও ঠিক ঋক-এর মতোই ছিল। সরল, আদর্শবাদী। ঋক আজকে যখন লাঠিটা দেখিয়েছিলো প্রণতকে তখন প্রণতর মনে যেমন আঘাত লেগেছিলো, যতখানি অপমানিত হয়েছিলো ও ঠিক ততখানি আনন্দিতও হয়েছিলো। ওর হঠাৎই মনে হয়েছিলো এই প্রণতর সামনে পুরোনো প্রণত দাঁড়িয়ে আছে যেন।

গাড়িটা লক করে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। দুচোখ জলে ভরে এলো প্রণতর। বড় শীত করছে আজ। পুরোনো দিনের ভালোত্বর, স্বাভাবিকত্বর উষ্ণতার দাঁড়ে ফিরে যেতে চাইছে যেন অনেকদিন জলে থাকা কোনো উভচর পাখি। কিন্তু তার জন্যে কোনো গাছ নেই, ডাল নেই। নিজে হাতে সেই উষ্ণতার স্থলের আশ্রয় সে-ই ছিন্নভিন্ন করেছে।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে প্রণত ভাবছিলো যে কোনো মানুষই বোধহয় জন্ম থেকেই খারাপ হয় না। তাকে তার পরিবেশ, তার পরিজন, তার বন্ধুবান্ধব, তার পরিচিতির মণ্ডলী এবং আরও পরে তার চামচেরা তাকে খারাপ করে দেয়। তার জীবনসঙ্গিনী অথবা সঙ্গীও করে। একজন মানুষের অতি-বড় হওয়ার লোভের মধ্যেই বোধ হয় তার ধ্বংসে হয়ে যাওয়ার বীজ নিহিত থাকে তা সে

যতবড় অর্থবান, ক্ষমতাবান বা যশস্বী যাই হতে চাক না কেন! আসলে যার বীজ যেমন, জীবনে ফলন তেমনই হয়। তার চেয়ে বড় হতে চাইলে সেটা হয়ে যায় খোদার উপর খোদাকারী। সেই বড়ত্ব থাকে না বেশিদিন। প্রথম থেকেই ও খারাপ ছিল না বলেই আজকে প্রণত তা বুঝতে পারছে। বড় অসহায় লাগছে।

মঙ্গলীর ঘরে তখনও আলো জ্বলছিলো। এই মেয়েটিকে সে নষ্ট করেছে, মঙ্গলী তাকে নষ্ট করেনি। তবে নষ্ট করেছে বলবে কেন? এ পৃথিবীর সব সম্পর্কই লেনদেন এর। মঙ্গলী অনেক নিয়েওছে তর কাছ থেকে। প্রতি মাসেই নেয়। তার বদলে ও যা দেয় তার জন্যে খুব একটা অপরাধ-বোধ করে না প্রণত। ঋক ঠিকই বল অ্যাকউনট্যান্সীর বাড়া সায়ান্স নেই। একটা ডেবিট হলেই একটা ক্রেডিট হতে হবে।

প্রণত ডাকলো মঙ্গলী।

মঙ্গলী ওর র‍্যাপার জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এলো।

প্রণত বললো, শীগগির আয়, ঢোক লেপের নিচে। শীত করছে আমার। ওরা দুজনেই জানে যে একে আদর বলে না। আদর করা কাকে বলে তা কোনোদিন শেখার অবসরই হয়নি প্রণতর।

ভয় পেয়েছিলো আসলে প্রণত। নানারকম ভয়। অপমান তো আছেই। আজ মঙ্গলীকে আদর করতে করতে নিজের প্রতি ঘেন্নায় প্রণতর দু চোখ জলে ভরে এলো। মঙ্গলীরও তাই। তবে দুজনের কারণগুলো বিভিন্ন।

ঋক তাকে আজ লাঠি দেখালো বলেই সে মাথা নিচু করে ফিরে এলো! দুপুরে রিক্সাওয়ালাদের কাছ থেকেও সে ভীরুর মতো মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলো। ওরা বলেছিলো ঘৃণার সঙ্গে, ডরপোক। একজন গাড়িওয়ালা মানুষের সঙ্গে পথের রিক্সাওয়ালার এরকম ব্যবহার আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে ভাবা পর্যন্ত যেতো না। তখন যে লোকই গাড়ি চড়তো সে সমাজে সম্মানিত ছিল। তার গাড়ি তাকে কোনো বিশেষ সম্মান দিতো না। কিন্তু সকলেই জানতো যে, গাড়ি যে মানুষ চড়ে তার সম্মান পাবার মতো অন্য গুণ-পনা নিশ্চয়ই আছে। আজকে চোর, বদমাস, অশিক্ষিত, ব্যবসাদার, মেরুদণ্ড-হীন অসৎ চাকুরে, স্মাগলার সকলেরই গাড়ি আছে। তাই গাড়ি চড়া লোকদের সম্মান করা তো দূরেব কথা সাধারণ মানুষে আজকাল তাদের অসম্মানই করে। আর যাঁরা সত্যিই সম্মানিত তারাই পড়েন মুশকিলে। প্রণত জানে যে, সে সম্মানের যোগ্য নয়। আজকে রিক্সাওয়ালাদের সামনে তার ব্যবহার রিক্সা-ওয়ালাদের ভবিষ্যতে গাড়িচড়া মানুষদের প্রতি আরও দুর্বিনীত করে তুলবে যে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

মঙ্গলী চলে গেলো। শরীরের গ্লানি, উত্তাপ অথবা শীতার্ততা ক্লান্তি অপনোদিত হলো ঠিকই কিন্তু প্রণতর মনের মধ্যে আজকে ঝড় চলছে। বৃন্দার কথায় আর তার নিজের অসীম লোভে সে তৃষার জীবন তো নষ্ট করলোই নিজের জীবনটাও নষ্ট করলো।

ঘুম এলো না। ও উঠে বসে চিঠি লেখার প্যাড ও কলম নিয়ে এলো। ক জানে বৃন্দার কোনো চিঠি তৃষার হাতে পড়েছে কি না! খুলে যদি পড়ে াকে তবে তো কিছুই আর জানতে বাকি নেই। তবে বৃন্দা প্রতি চিঠিতে ম্বর দিতো প্রণতর বিয়ের পর থেকে। যাতে কোনো চিঠি মিসপ্লেসড হলে াণত বুঝতে পারে। কোনো চিঠি তো মিসপ্লেসড হয়নি!

অনেকক্ষণ কলম কামড়ে তারপর প্রণত লিখলো,

মুরাদগঞ্জ

তৃষা, মাই ডার্লিং,

আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত। প্লীজ আমাকে শেষবারের মতো ক্ষমা করিও।

যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া সবকিছু আবার নতুন করিয়া শুরু কি করা যায় না? আমাকে শেষবার সুযোগ দিয়া দ্যাখো। প্লীজ।

তোমাকে আমার অনেক কিছুই বলিবার আছে। আমি অনেকপ্রকার অন্যায় করিয়াছি। তোমাকে সব কিছুই বলিব। কিছুমাত্রই বাকি না রাখিয়া। আমার অপরাধ স্বীকার করার পরও তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো তাহা হইলে আমি তোমাকে জোর করিব না। তোমার জীবন হইতে মুছিয়া যাইব!

মালীর হাতে এই চিঠি পাঠাইতেছি। মালীর হাতেই উত্তর দিবে। উত্তর পাইবামাত্র আমি গিয়া তোমারই গাড়ি করিয়া তোমাকে লইয়া আসিব।

—ইতি ক্ষমাপ্রার্থী প্রণত।

পুনশ্চঃ তোমাকে আমি আমার মতো করিয়াই ভালোবাসিয়াছিলাম, এইবারে তোমার মতো করিয়া, মানে তুমি ভালোবাসা বলিতে যাহা বোঝো, তেমন করিয়াই ভালোবাসিব। যদি সুযোগ দাও।

॥ ৫ ॥

রাত বোধহয় প্রায় ভোর হয়ে এলো। নদীর দিক থেকে কী একটা পাখি ডাকছে থেকে থেকে। শেয়াল ডাকলো একসঙ্গে অনেকগুলো। পাশ ফিরে শুলো তৃষা। পরপুরুষের বিছানা, লেপ, বালিশে অনভ্যস্ত কিন্তু স্নিগ্ধ গন্ধে এবং পরপুরুষের শরীরের ওম-এর উষ্ণতা মাখা বিছানাতে যে শুয়ে আছে এ কথা ভাবতেই ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিলো ও। ওর পায়ের কাছে দরজা আগলে এক বোঝা খড়ের উপরে একটি ব্যাগ মাথায় দিয়ে নিজের গায়ের পুরু দেহাতি ধূসররাঙা আলোয়ানটা জড়িয়ে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে ঋক। ফিতে-কমানো লণ্ঠনের মৃদু আলোটা এসে ঋক-এর মুখের এক পাশে পড়েছে। কোনো দেবশিশুর মুখ বলে মনে হচ্ছে যেন। তার গায়ের পাশে শোয়ানো আছে লাঠিখানা।

আবারও পাশ ফিরলো তৃষা! এ রাতে কতবার যে পাশ ফিরলো! ঋক অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আসলে ঘুমোচ্ছে কি? শুয়ে থাকা মানুষকে দেখে মনে হয় যে তারা ঘুমোচ্ছে। তারা যে ভাবনার গভীরে ডুবুরীর মতো ডুব দিয়ে বেড়াচ্ছে তা তাদের শান্ত আপাত-ঘুমন্ত মুখ দেখে বোঝার উপায়ই থাকে না।

ঘরের উষ্ণতা যেন বেড়ে গেছে মনে হলো। ওর বন্ধ চোখের সামনে যে যেন গলানো কাঁসার ঝরণা ঝরাচ্ছে। আস্তে আস্তে চোখ মেললো তৃষা। প্রথম কিছুক্ষণ বুঝতে পারলো না কোথায় আছে ও। ও কোথায়? দেখলো পায়ের দিকের পুবের জানালাটা খুলে দিয়ে গেছে ঋক। পুবের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার লেপের উপরে। ঝকঝকে নীল আকাশ। এমন আকাশ কলকাতা তো দূরস্থান মুরাদগঞ্জেও দেখা যায় না।

খুবই ভালো লাগছিলো। খুব। উঠতে ইচ্ছা করছিলো না। পরক্ষণেই লজ্জা হলো খুব। প্রণতর কথা মনে হওয়ায় কাঁটা বিঁধলো মনে। সে তার বিবাহিত স্বামী! ধড়মড়িয়ে উঠে ব্রেসিয়ারটা আবার টাইট করে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে লেপটাকে ভাঁজ করলো। এদিক ওদিক তাকালো বেড-কভারের খোঁজে দেখতে পেলো না। দেখলো কাল রাতের খড়-এর একটি কুটোও ঘরের মেঝেতে

পড়ে নেই। সব কিছু নিড়িয়ে নিকিয়ে নিয়ে গেছে ঋক। বাইরে এসে দাঁড়াতেই মন ভরে গেলো, কমলালেবুর রঙের মতো সকালবেলার আলোয়, নীল বেনারসীর মতো আকাশের নীলে, নদীর গুঞ্জন্ময় শব্দে। গেরুয়া পাল তুলে ছোট্ট নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। নদী বেয়ে।

এমন এমন সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিজেকে খুব কেজো করে তুলতে ইচ্ছে যায়। মনে হয় তৃষার যে ও ভীষণই কাজের লোক হয়ে উঠবে। শংখদার কবিতা মনে পড়ে যায়। শংখ ঘোষের।

"আলো একপাশে থাকে সে আলোর
ভিতরে থাকে না।"

তারপর কি যেন! আমার স্মৃতিশক্তি ভারী দুর্বল। দূর সব ভুলে যাই।

বললো ঋককে।

কার কবিতা?

শংখদার।

ভোর?

হ্যাঁ হাঁ ভোর। তুমি জানো?

"আলো একপাশে থাকে, সে আলোর ভিতরে
থাকে না
জল তাকে ডাক দেয়, মাটি তার পায়ে
পায়ে হাঁটে
তার কোনো দুঃখ নেই, আজ তার ভার
আছে শুধু।
একাকার হয়ে আছে তার সব দিন আর
রাতে
প্রতিবিম্ব নিয়ে আজ একা একা দূরে
গিয়েছে সে
সুন্দর যেখানে এসে জীবিকার সীমায়
মিশেছে।
তুমি তাকে একা বলো? স্বচ্ছতায় কতদূরে
একা?
সে দেখে দিগন্তময় স্থির তার
ভবিতব্যরেখা
ঢেউয়ের উপরে ঢালে আলো, সেই আলো
পাশে থাকে
আমিও তো কাজ চাই, কাজের ভিতরে
পাব তাকে।"

বাঃ! কী সুন্দর আবৃত্তি করো তুমি ঋক!

কবিতা ভালো হলে আবৃত্তি ভালোই হয়। আর কবিতাই যদি ভালো না

হয় তবে মিছিমিছি জনুয়ারী দিয়ে কথা বলে আঁতেলশ্রেষ্ঠ হয়ে আবৃত্তি করলেও তা কবিতা বা আবৃত্তি দুটোর কিছুই হয় না।

তারপর বললো, মুখ চোখ ধুয়ে নাও। চা করছি, চা খাও। রাম সিং এসেছিলো। তোমার জন্যে ভালো ঘি আর দুধ নিয়ে আসতে বলেছি। সরও নিয়ে আসবে। আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর সদর দরজা বন্ধ করে তুমি এই উঠোনের ঐ কোনাতে পাটি পেতে শুয়ে সান-বেদিং করো, মুখে সর মেখো, সারা শরীরে খাঁটি কাড়ুয়া তেল মাখো। তোমাকে কেউই দেখবে না। দেখতে পারে, শুধু একটা দাঁড়কাক। সে মাঝে মাঝে দেওয়ালটার উপরে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাবে। আর দেখবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা চিল আর হঠাৎ আকাশের নীলে সবুজ ঝিলিক মেরে চলে-যাওয়া টিয়ার ঝাঁক। একটা টিকটিকি আছে বটে সেও দেখতে পারে। সুন্দর জিনিস দেখতে তো কোনো দোষ নেই। দেখলে, সৌন্দর্য পরিপ্লুত হয়।

এখানে জল কোথায় পাব ?

সব বন্দোবস্তই হয়েছে। কুয়ো তো আছেই। তোমার জন্যে একজন দাসীও ঠিক করে দিয়েছে রাম সিং। তার নাম লালপাতিয়া। রাম সিং-এর গ্রাম থেকে আসবে সে। তোমার সকালের নাস্তা আর চান হয়ে গেলে তোমার সঙ্গেই থাকবে, তোমাকে নিয়ে নদী পেরিয়ে বাজরা আর মটরছিম্মির সবুজ কাড়ুয়া আর সরগুজার হলুদ ক্ষেতের পাশ দিয়ে দূরের গ্রামে বেড়িয়ে আসবে। এই শালবনের গভীরেও যেতে পারে। লালপাতিয়া তোমাকে রান্না করে দেবে। চাও তো তার কাছ থেকে রান্না শিখেও নিতে পারো। লিট্টি খেয়েছো কখনও ? ছাতুর লিট্টি। কোত্থেকেই বা খাবে তুমি ! কলকাতার মেয়ে তো ! লিট্টি খুব গরম। এই শীতকালেই খেতে হয়। বলব লালপাতিয়াকে, বানিয়ে দেবে।

এমন সময় সদর দরজায় কে যেন ধাক্কা দিলো।

ঋক গিয়ে দরজা খুললো।

বললো, ক্যা হো মালী ভাইয়া ? ক্যা বাত্ ?

খাত্ ভেজিন সাহাব, মেমসাহেবকো লিয়ে।

তো আও। অন্দর আও। বৈঠো। চায়ে পীয়েগা মালী ভাই ? তুরন্ত বন যায়গা।

শীতে বেঁকেছিল মালী ছেঁড়া পুরনো সোয়েটারে। মাথা নোয়ালো।

চিঠিটা হাতে নিয়ে মালীকে উঠোনের রোদে বসিয়ে ঋক বললো তৃষাকে, এই যে তোমার চিঠি !

জবাব লেতে যানা হোগা। সাহাব বোলিন।

মালী বললো।

ঋক বললো, তুমি ঘরে গিয়ে আমার লেখাপড়ার টেবলে বসে জবাব লিখে দাও। খারাপ বা রাগের কথা লিখো না। রাগটাগ সব কাল রাতের সঙ্গেই মরে গেছে তোমার জীবন থেকে। এ কথা জেনো। ভুলে যেও না। রাগ দুর্বলের রিপু।

একবার তাকালো তৃষা ঋক-এর দিকে। তারপর চিঠিটা নিয়ে ঘরে গেলো।

বারবার পড়লো চিঠিটা। বিশ্বাস হলো না তৃষার যে প্রণত এরকম চিঠি লিখতে পারে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো বড়। কিন্তু কিছু করারও নেই। কী লিখবে উত্তরে? লিখলে যে অনেক কথাই লিখতে হয়, অনেকদিন ধরে লিখতে হয়। তাতো সম্ভব নয় এখন। মালী বসে আছে এখুনি উত্তর নিয়ে যাবে। চিঠিটা হাতে নিয়ে বোকার মতো অনেকক্ষণ বসে রইলো তৃষা।

ঋক শঙ্খদার কবিতা সকালবেলায় আবৃত্তি করে তৃষার মধ্যে বহুদিন বন্ধ হয়ে থাকা কবিতার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে যেন। একসঙ্গে বহু কবিতা মনে আসছে। জীবনে আনন্দের কত কী ছিল, আছে; ভুলেই ছিল এতোদিন।

তৃষা লিখলো।

প্রণত, ভীতিভাজনেষু,

"মাটি খুব শান্ত, শুধু খনির ভিতরে
দাবদাহ
হঠাৎ বিস্ফারে তার ফেটে গেছে পাথরের
চাড়।
নিঃসাড় ধুলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার
অক্ষর।
যে লেখায় জ্বর নেই, লাভা নেই,
অভিশাপও নেই।"

তুমি তোমার মতো বাঁচো। আমাকেও বাঁচতে দাও আমার মতো করে।

সুখী হও। আমাকে ভুলে যেও। তুমি বড় দেরী করে ফেললে। এখন আর কিছুই করণীয় নেই। আমার মেজমামা তোমাকে যা কিছু দিয়েছিলেন যৌতুক হিসেবে তা তোমারই। আমি কিছুই চাই না সেই যৌতুকের।

ভালো থেকো।

ইতি— তৃষা

মালীর চা খাওয়া হলে চিঠিটা খাম বন্ধ করে তার হাতে দিলো তৃষা।

মালী বললো, মাঝে মাঝে আসবো মেমসাব!

নিশ্চয়ই আসবে। মুঙ্গলী কেমন আছে?

কাল রাতে তো এখান থেকে ফিরে গিয়ে সাহাব তাকে ডেকে নিলেন। সাহাবের সঙ্গে শুয়েছিলো।

আহা। শুক। শুক। কাল যে বড় শীত ছিল রাতে। সকলেই সুখে থাকুক।

তৃষা বললো।

মালী বোকার মতো মুখ করে চলে গেলো।

ঋক চান করে নিয়েছে ততক্ষণে। আলুর চোকা আর পরোটা প্রায় বানিয়ে

ফেলেছে নাস্তা হিসেবে। তৃষাকে বললো, চান ঘরে টুথ পেস্ট আছে। তোমার ব্রাশ যদি না এনে থাকো তো আমি বেরুচ্ছি নিয়ে আসব। আর কী কী আনতে হবে তা মুখ ধুয়ে এসে জলখাবার খেয়ে বরং আমাকে একটি লিস্ট করে দাও।

আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

না। আজ নয়। আজ চান টান করো। কাল রাতের প্লানি, অপমান, কষ্ট, চোখের জল সব ধুয়ে ফেলো। নতুন জীবন শুরু করবে আজ থেকে। আজ থেকে আলাদা ঘরেও শোবে লালপাতিয়ার সঙ্গে। যদি ডিভোর্স নিতে চাও, উকীলের সঙ্গে কথা বলতে চাও তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবো।

একসঙ্গে তুমি এতো কিছু বলো যে আমি বুঝতে পারি না।

তৃষার মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো ঋক। তারপর বললো, আচ্ছা। ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে কথা বলবো।

বলেই বললো, আর শোনো। তোমার যাঁরা গার্জেন তাঁদের এক্ষুণি একটা টেলিগ্রাম করা দরকার। তোমার গার্জেনদের নাম ঠিকানা আমাকে লিখে দাও।

মানে মামাদের ?

মামারা যদি গার্জেন হন তবে মামাদেরই !

আমার গার্জেন·········

ঋক তৃষার মুখের দিকে চাইলো। তৃষা বুঝলো যে ঋক বোঝাতে চাইছে যে, সে তার গার্জেন নয়, হতেও চায় না।

ভীষণ ভয় করতে লাগলো তৃষার। কী যে বলবে, ভেবে পেলো না।

ঋক বললো, ঠিকানাটা ?

দিচ্ছি লিখে।

মেজমামার নাম ঠিকানা নিয়ে ঋক চলে গেলো। তার আগেই লালপাতিয়া এসে গেছিলো। তাকে সব বলে গেল যাবার আগে ঋক। রাম সিং লালপাতিয়ার হাতে কিছু টাটকা আনাজপাতি, ডিম, এবং একজোড়া ছোট দিশী মুরগীও পাঠিয়েছিলো। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার আগে ঋকের মনোভাবে খুবই বিস্রস্ত হয়ে পড়লো তৃষা। ঋককে এই প্রথমবার কাল দুপুরের পর থেকে বড় আশ্চর্য ঠেকলো ওর চোখে।

ঋক চলে যেতেই ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো তৃষা। তারপর চান টান না করেই মেজমামাকে একটি চিঠি লিখতে বসলো।

সুরাইয়াগঞ্জ

পূজনীয় মেজমামা,

আমি কাল রাতে প্রণতর বাড়ি থেকে চলে এসেছি। এসে উঠেছি ওদেরই অফিসের একজন অ্যাকাউন্টেন্ট ঋক রায়ের বাড়িতে। কেন এসেছি তা তোমাকে চিঠিতে জানাতে পারছি না, কিন্তু তুমি সব শুনলে বুঝবে যে আমার কোনো উপায় ছিলনা। আমার বড় বিপদ মেজমামা। তুমি যদি একদিনের জন্যেও

আসতে পারতে তবে বড় ভালো হতো, নইলে আমার ভেসে যাবার সম্ভাবনা আছে। তোমার সঙ্গে হয়তো আর কখনওই এ জীবনে দেখা হবে না। অন্য মামাদেরও আমার কথা বলো।

ইতি ভীতা তৃষা

আমার ঠিকানা :

প্রযত্নে ঋক রায়, সুরাইয়াগঞ্জ, ভায়া মুরাদগঞ্জ, জেলা পাটনা, বিহার।

পুনশ্চ : যদি আসো তো একা এসো। ছোটমামা বা ছোটমামীমা যেন না আসে সঙ্গে।

চিঠিটা Speed-post-এ পাঠাতে হবে। চান-টান পরে হবে। লালপাতিয়া বললো, পোস্ট অফিস মুরাদগঞ্জে। এদিকে কোনো পোস্ট অফিস নেই। ইতিমধ্যে রাম সিং এসে হাজির। সে বাজারেই যাচ্ছিলো। আজকে আমার এ হাটও আছে। বিকেলে হাট করে ফিরবে। রাম সিংকে টাকা দিয়ে স্পীডপোস্ট-এর ব্যাপারটা বুঝিয়ে চিঠিটা ওকে দিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে অনুরোধ করলো তার কাজটি যেন এক্ষুণি সে করে। রাম সিং পাঁচ টাকাটা ফেরৎ দিয়ে বললো, আপনি ঋকবাবুর মেহমান। আপনার কাছে টাকা আমি নিতে পারবো না। ওঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বকশিস-এর নয়।

লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চাইলো তৃষা। রাম সিং চলে গেলে অনেকক্ষণ উঠোনে রোদের মধ্যে থামে হেলান দিয়ে বসে রইলো কী করলো, কী করবে এই সব ভাবতে ভাবতে। রোদ তার চোখের পাতার মধ্যে লাল-নীল দেশলাই জেলে দিলো। রোদ জ্বলতে লাগলো, সময়ও জ্বলতে লাগলো, জ্বলতে লাগলো, গলতে লাগলো তৃষাও।

॥ ৬ ॥

প্রণত অফিসে আসেনি। ঋক অফিসে গিয়েই জানলো। তারপর নিজের কাজ কিছুটা গুছিয়ে ম্যানেজার সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিলো বাকি দিনের।

কী ব্যাপার রায় ?

আমার ব্যক্তিগত কাজ আছে স্যার।

ক্যাজুয়াল লীভ কাটা যাবে একদিন।

নেবেন কেটে স্যার।

ওকে।

সাইকেলটা এখনও মেরামত করতে দিতে পারেনি। অসুবিধে হচ্ছে খুবই। ব্যাঙ্কে গিয়ে কিছু টাকা তুললো। তারপর হেঁটে হেঁটেই চললো প্রণতর বাড়ির দিকে।

উইক-ডে। বেলা বারোটা বাজে। চারদিকে কর্মব্যস্ত মানুষদের ছোটাছুটি। ধুলো উড়ছে উত্তরের হাওয়ায়। গমগম করছে বাজার এলাকা। তা পেরিয়ে এসে প্রণতর বাংলোর পথে পড়লো এবারে। যখন গেট খুলে বাংলোতে ঢুকলো তখন কাউকেই দেখা গেলো না। মালীকেও নয়। বারান্দায় উঠে এদিক ওদিক তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলো না। তখন ডাকলো মালী বলে।

মালী পেছন দিক থেকে দৌড়ে এলো। এবং ঋককে দেখে অবাক এবং আতঙ্কিত গলায় বললো, আপ ?

সাহাব নেহি হ্যায় ক্যা ঘরমে মালী ?

হ্যায়, হ্যায়। পিছুকা বাগানমে বৈঠ্‌কর পী রহা হ্যায়। আভ্‌ভি হুঁয়া আপকি যানা ঠিক নেহি হোগা।

কাহে না ঠিক হোগা ?

বলে, প্রণত বাংলোটা ঘুরে পেছন দিকে পেঁছলো। একটা চেরী গাছের ছায়ায় বেতের চেয়ারে বসে বেতের টেবলের উপর হুইস্কীর বোতল রেখে টেবলের উপর দুটি পা তুলে দিয়ে হাতে গ্লাস নিয়ে হুইস্কী খাচ্ছে প্রণত। বোতলের অনেকখানিই খালি হয়ে গেছে।

ঋক বললো, স্যার।

কে? কে?

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে চাইলো প্রণত।

আমি ঋক স্যার।

ঋক! তুমি? এসো এসো। হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। বসো। খাবে নাকি? ও তুমি তো এসব খারাপ জিনিস খাও টাও না।

কে বলেছে খাই না? কখনও সখনও খাই। আপনার সঙ্গে আজ খাবো স্যার।

খাবে? মাই প্লেজার। তবে আমাকে আবার স্যার স্যার করছো কেন? কাল রাতে তো প্রণতবাবু বলছিলে। আমি বলবো, বাবুটাও কর্তন করো। শুধুই প্রণত বোলো। চাকরির সম্পর্কটা কোনো সম্পর্ক নয়।

মালী। ও মঙ্গলী!

মঙ্গলী বোধহয় রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলো, সাহাব।

ঔর এক গ্লাস লাও।

জী সাহাব।

ঔর ওমলেট লাও বাদমে। দো।

মঙ্গলী ঋককে দেখে একটু অবাক হলো। বললো, আপ? ছিক বাবু? বলেই, গ্লাসটা রেখেই পালালো।

কিছু বলতে এসেছো আমাকে ঋক?

না। শুনতে।

ঋকের গ্লাসে হুইস্কী ঢেলে দিতে দিতে প্রণত বললো, সে তো অনেক কথা। তাছাড়া তুমি শুনেই বা কি করবে! তোমার উপকারও আমি করতে পারবো না, আমার উপকারও তুমি নয়।

আমি হয়তো আপনার উপকার করতে পারি।

তুমি আমাকে 'তুমিই' বোলো। আমি যখন এতদিন পদাধিকার বলে তুমি বলে এসেছি, তুমি বন্ধুত্বের দাবিতেই বোলো। নাও খাও। চিয়ার্স্।

ঋক বললো চিয়ার্স্ গ্লাস তুলে। তারপর বললো, আপনার চিঠির উত্তরে…।

তুমি করেই বলো। আমাদের সম্পর্কটা এখন প্রায় সতীনের মতো।

তুমি ভুল করছো প্রণতদা। তোমার স্ত্রীর হাতেও আমি হাত দিইনি। তোমার স্ত্রী তোমারই আছে। তোমার চিঠির উত্তরে কি লিখেছিলো তৃষা?

তুমি জানো না?

না। আমি তখন ওর জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিলাম!

তুমি! মাই গুডনেস্। এতো গুণের লোক বলেই না!

ঋক হাসলো। বললো, কী লিখেছিলো তৃষা?

লিখেছিলো যে দেরি হয়ে গেছে আমার। আর কিছু করণীয় নেই। তার সঙ্গে কে এক কবি শঙ্খ ঘোষ-এর কবিতা 'কোট' করে দিয়েছিলো। আমি তাই

ওসব কিছুই বুঝি না। আরও গণ্ডগোল হয়ে গেল। কী যে বলতে চেয়েছে তাও বুঝলাম না। কবিতা-টবিতা কি আমার জন্যে ?

হুঁ। ঋক বললো হুইস্কীতে চুমুক দিয়ে।

প্রণত অবাক চোখে ঋককে দেখেছিলো। বললো, কাল রাতে যখন লাঠি হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিলে তখন অবাক হয়েছিলাম। এখন আরও অবাক হচ্ছি। তুমি রাতারাতি ভীষণই বদলে গেছ ঋক। আনথিংকেবল্।

তুমিই বদলে দিয়েছো। তুমি নিজেও কি রাতারাতি বদলাওনি প্রণতদা ? তুমি কাল রাতে যা করেছো, মানে যে ব্যবহার তৃষার প্রতি ; তাতে তুমি যে রাতারাতি বদলে গেছো সে সম্বন্ধেও তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

আমি ? হ্যাঁ। তা বলতে পারো। তবে আমি নই। এই অ্যাল্কোহল। কাল মদ আমাকে খেয়েছিলো ঋক। কালকে আমি মানুষ ছিলাম না। আজকাল আমি প্রায়ই যা বলি, যা করি তা আমার বলা বা করা নয়। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি মদেই নষ্ট হয়ে গেলাম একেবারে। কিছুতেই থামতে পারছি না। সত্যিই আমি যা করেছি তার ক্ষমা নেই। সে জন্যে আমি লজ্জিত। আমি তৃষার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে রাজী আছি যদি তুমি তৃষাকে ছেড়ে দাও।

বাঃ। হাসলো ঋক। বললো, ধরলামই বা কখন যে ছাড়ব ? তুমি পাগল। কাল রাতে আমি তোমার ট্রাস্টীর মতো তৃষাকে সযতনে রেখেছি। তার উপরে আমার কোনো দাবি নেই। তবে অস্বীকার করবো না তৃষাকে আমার প্রথম দিন থেকেই খুব ভালো লাগে। সেই যেদিন পাটনা জংশনে তোমাদের আনতে গেছিলাম। কিন্তু ভালো লাগলেই বা কি। ভালো লাগা তো অনেক রকম হয়। সব ভালো লাগাকেই যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ছকে বেঁধে ফেলতেই হবে তার কি মানে আছে ? তোমার স্ত্রী হিসেবেও তো তাকে আমার ভালো লাগতে পারে। তুমি ও সে দু'জনেই তো আমাকে বন্ধুর মতো ভালোবাসতে পারো সমান ভাবে। কি ? পারো না ?

সুস্থ কোনো সম্পর্কের কথাই ভাবিনি ঋক এতো দিন। তাই তৃষাকে এতো কষ্ট দিয়েছি। নিজেও বড় কম পাইনি। তোমার কথা ভেবে দেখবার।

আসলে ব্যাপারটা কি স্যার জানেন।

আঃ ঋক।

ও। ব্যাপারটা কি জানো প্রণতদা। তুমি 'আরো চাই' 'আরো চাই' এর দলে পড়ে গেছো। তুমি একা নও। তোমরাই এখন দলে ভারী। তোমাদের কারোই পেছনে একবারও চাইবার অবকাশ নেই। ভালো আসবাব, ভালো ফারনিশিং, ভালো বাড়ি, ভালো গাড়ি, ভালো মদ, ভালো স্ত্রী, স্ত্রীর উপরি এক বা একাধিক নারী, কালার টি. ভি., ভি. সি. আর, এয়ারকণ্ডিশানার এই গেলো তালিকা। গত মাসের রিডার্স ডাইজেস্ট-এ পড়ছিলাম, Quotable quotes-এ যে 'When we have provided against cold, hunger and thirst, all the rest is but vanity and excess' কথাটা বড় ভালো

লেগেছিলো। সুখ, প্রাচুর্যর মধ্যে, আধিক্যের মধ্যে কোনো দিনই ছিল না প্রণতদা। সুখ ছিল তোমার মনে। আমার মনে। নিজের মনে তাকিয়ে দেখার অবকাশ হয়নি কখনও তোমার। চিরদিন বাইরের দিকে চোখ ছিল, ভেতরে কখনওই চেয়ে দ্যাখোনি। তৃষা অত্যন্ত অন্তর্মুখী, সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না শিক্ষিতা মেয়ে। ও তোমাকে ডিভোর্স করে নিজে স্বাবলম্বী জীবন যাপন করতে পারে সহজেই। হাজার ছেলে দৌড়ে এসে ওকে বিয়েও করবে। তোমার দয়ানির্ভর সে নয়। কিন্তু তুমি যদি তৃষাকে হারাও তবে আর কখনওই তৃষার মতো অন্য কাউকেই পাবে না।

আসলে বৃন্দা…

বৃন্দা কে?

তৃষার ছোটমামী।

এসব কথা আমাকে বলার দরকার নেই। তৃষার সঙ্গে বসে দুজনের সব ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করে নিও। আমি সব সাহায্য করবো। আমাকে আর একটা হুইস্কী দাও।

মুঙ্গলী ওমলেট নিয়ে এলো।

প্রণত ঋককে আরেকটা ড্রিঙ্ক ঢেলে দিলো।

ঋক বললো, আজ সন্ধ্যে লাগতেই তুমি চান করে, ধুতি পাঞ্জাবি পরে এবং শাল গায়ে দিয়ে আমার মাটির কুটিরে আসবে। গাড়ি নিয়ে এসো না। ও সব আড়ম্বর ওখানে মানায় না। যে রিক্সা নিয়ে যাবে তাকেই বলে দেবে কালকে সকাল সাড়ে সাতটাতে আসতে। নিয়ে যাবে তোমাকে। রাতটা তোমার স্ত্রীর সঙ্গেই কাটাবে।

সে কি আমার মুখ আর দেখবে? মনে হয় না ঋক।

সে তুমি ছেড়ে দাও আমার উপরে। কিন্তু এই তোমার শেষ সুযোগ। ক্ষমা চাইবার, প্রায়শ্চিত্ত করার। এইটা শেষ করেই আমি উঠবো। আমার অনেক কাজ আছে। ভালো করে চান করে সুন্দর করে সেজে, সুগন্ধ মেখে যেও। মনে করো, অভিসারে যাচ্ছো। আবারও বলে গেলাম।

প্রণত অবাক হয়ে চেয়েছিলো ঋকের মুখের দিকে।

বললো, তোমরা দু'জনে কি আমাকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে? মতলবটা কি বলো তো! আমি যা করেছি গত রাতে তৃষার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে তারপরে তোমার এই ব্যবহার রীতিমতো রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে।

জীবন তো রহস্যময় হবেই প্রণতদা। জীবনের মতো এমন গভীর গোপন মাল্টিডাইমেনশানাল রহস্য আর কি আছে?

ঋক! তোমার এই তুমিকে এতোদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

জীবনের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা পড়োনি?

'রাতের সব তারাই আছে।

দিনের আলোর গভীরে।' আমার মধ্যেই ছিলাম। দেখতে পাওনি শুধু।

না। কোনো কবিতা-টবিতা পড়োনি বলেই তো তোমার তৃষার সঙ্গে বনিবনা হলো না।

তৃষা আমার নয়। তবে জীবনে সুখী হতে হলে, সম্পূর্ণ মানুষ হতে হলে, মেয়েদের বুঝতে হলে একটু কবিতা-টবিতা পড়া দরকার। কবিতা না পড়লে মানুষের মনুষ্যত্ব অপূর্ণ থেকে যায়।

কিছুক্ষণ বোকার মতো চেয়ে থাকলো প্রণত ঋক-এর মুখের দিকে।

ঋক বললো, উঠলাম। এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো প্রণতদা। ভালো করে এক লম্বা ঘুম দিয়ে নিয়ে উঠে চান-টান করে চলে এসো। তোমাকে নতুন জীবন দেবো। কথা দিলাম। তুমি বদলে কিছু দাও আর নাই দাও।

॥ ৭ ॥

ফেরার সময়ে একটু ঘুর হলেও খাদি গ্রামোদ্যোগে-এ গিয়ে একটি ডাবল বেড বেড-শীট এবং বেড কভার কিনলো ঋক। তারপর রাবড়ি কিনলো পাঁড়ের দোকান থেকে, মুসলিম-এর দোকান থেকে এক কেজি পাঁঠার সিনা, বাজার থেকে নেড়ো বিস্কুট। তারপর এসব নিয়ে একটি রিক্সা নিয়ে বাড়ির দিকে চললো।

তৃষার সারাদিন আজ বড় আনন্দে কেটেছে। লালপাতিয়া বলেছিলো দিদি তোমাকে ভালো করে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি। সর মাখিয়ে দিচ্ছি মুখে। তারপর কুয়ো থেকে জল তুলে তোমাকে চান করিয়ে দেবো। রোদে বসে থাকবে তুমি। লজ্জা কিসের। আর তুমি ছাড়া এখানে আর কেউ তো নেই।

তাই করেছে তৃষা। এতো টাটকা লাগছে নিজেকে তা বলার নয়।

দুপুরে লালপাতিয়াই রেঁধেছিলো। বাসমতী চালের ভাত, সোনামুগের ডাল মধ্যে তিন-চার রকমের শাক দিয়ে, বেগুন ভাজা, নদীর কুচো মাছের ঝাল, পুদিনার চাটনি। ঘরে ছিল লেবু আর আমলকির আচার। ভাতের মধ্যে রাম সিং এর গ্রামের খাঁটি ঘি ফেলে দিয়েছিলো। আঃ খাবার না যেন অমৃত। এমনই ঘি যে ডান হাতে এখনও ভুঁড় দিতে পারছে না সাবান দিয়ে ধুয়েও।

সারা দুপুর পেছনের বারান্দার রোদে বসে নদীর দিকে চেয়ে থেকেছে। আর লালপাতিয়ার কাছে গান শুনেছে তাদের গ্রামের, রাম সিং-এর এবং তাদের ঋকবাবুর। কখন যে বেলা পড়ে এসেছে, মেছো বকেরা শান্ত ভড়ানে জঙ্গলের ভেতরে তাদের ডেরায় ফিরে গেছে, পশ্চিমের আকাশে সিঁদুর খেলে সূর্য চলে গেছে তা খেয়ালই হয়নি। লালপতিয়া মুচমুচে কুচো নিমকি আর চা করে এনে বলেছে এবারে ঘরে চলো দিদি। ঠাণ্ডা ধরে নেবে।

ওরা ঘরে আসতে না আসতেই ঋক এসে হাজির। লালপাতিয়াকে বলেছে, কাঁধের থলি নামিয়ে রেখে, শীগগির আদা, পেঁয়াজ, রসুন আর পেঁপে বেটে সেই রসে এই সিনাগুলো ভিজিয়ে রাখ্ লালপাতিয়া। রাতে রাম সিং আর

আমার আরেকজন মেহমান খাবে। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে এসেই ভুনি খিচুড়ি চাপাব। আলু আর বেগুন কাটবি ভাজার জন্যে। শুকনো লংকা বের করবি। মনে আছে তো কোথায় রাখা আছে? ঐ ঝোলানো হাঁড়িটার মধ্যে। কি রে?

মনে আছে বাবু।

বলে, হেসেছে লালপাতিয়া।

কেমন কাটলো দিন? তৃষা?

দারুণ। এক অন্য জীবন। অন্য দিন। ভারী ভালো লাগলো।

জীবনের প্রত্যেকটি দিনকেই অন্য দিন যারা করে তুলতে পারে তাদের জীবন কখনওই পুরোনো হয় না। তোমার জীবনও পুরোনো হবে না।

আমার আবার জীবন! জীবনের আছেটা কী? সব শেষ।

বলো কি তুমি! এই তো সবে শুরু।

সারা দিনই আনন্দে কেটেছে তৃষার কিন্তু মনের মধ্যে একটিই প্রশ্ন বারবার কাঁটার মতো বিঁধেছে। ঋক-এর টেবলে যে মেয়েটির ছবিটি সে দেখেছে সে মেয়েটি কে? লালপাতিয়াকে জিগেস করতে পারতো কিন্তু লজ্জা করেছে। তাছাড়া লালপাতিয়া হয়তো জানেও না।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে জামা কাপড় ছেড়ে খদ্দরের পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে, গরম দেহাতি কাপড়ের জহরকোট পরে ঋক কাজে লেগে গেছে। তৃষাকে বলেছে, ভালো করে সাজতে, হাত-পা-মুখ ধুয়ে নিয়ে। ঋক এর গণ্যমান্য অতিথিকে খেতে বলেছে সে আজ। আলাপ করিয়ে দেবে তৃষার সঙ্গে। খুব ভালো লাগবে তৃষার।

তৃষা যখন হাত-মুখ ধুতে গেছে চান ঘরে, সেখানে লালপাতিয়া কেরোসিনের টিনে করে জল তুলে রেখেছিলো; তখন ঋক, লালপাতিয়ার সাহায্যে পেছনের দিকের ঘরে অনেক পোয়াল এনে প্রায় এক হাত উঁচু করে দু'জনের বিছানা করেছে। তার উপর পেতে দিয়েছে নতুন কেনা ডাবল বেডের চাদর। ঢেকে দিয়েছে বেডশীট দিয়ে। নতুন ওয়াড় পরিয়ে দেওয়াল আলমারি খুলে দুটি বালিশ বের করে পেতে দিয়েছে এবং পাছে বিছানা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাই নতুন লেপ বের করে তাতে পাতলা মার্কিনের ওয়াড় পরিয়ে তা দিয়ে বালিশ এবং বিছানাও ঢেকে দিয়েছে। লালপাতিয়াকে বলেছে ঐ ঘরের কোণে কাঠ-কয়লার আগুনের মালসা রেখে দিতে যাতে গরম হয়ে থাকে ঘর। আর এই ঘরের বিছানা সম্বন্ধে কিছু বলতে মানা করেছে তৃষাকে। পেছনের বাগান থেকে লাল আর হলুদ গোলাপ তুলে এনে পাপড়ি ছড়িয়ে দিতে বলেছে তাকে লেপের নিচে।

তৃষা মুখ-হাত ধুয়ে ঋকের ঘরে গিয়েই সেজেগুজে এসেছে। একটি মেরুন রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। লণ্ঠনের আলোয় ওকে একটি মসৃণ উজ্জ্বল প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছে। লণ্ঠনের আলো বিজলী আলোর চেয়ে অনেকই ভালো। যেটুকু দেখাবার দেখায়, যেটুকু দেখাবার নয়, লুকিয়ে রাখে।

অনেক রোম্যান্টিক। কোনো বিদেশী পারফ্যুম মেখেছে। তার গন্ধে ঋক-এর মাটির ঘরবাড়ি ম-ম করছে।

একবার জোরে নাক টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে ঋক বললো, আহা রোজ যদি এমন সুগন্ধে ভরে যেতো আমার এই গোবর-লেপা ঘর বাড়ি।

তৃষা মুখ তুলে বলতে গেছিলো তুমি ইচ্ছে করলেই ভরে যেতে পারে। কিন্তু বলতে গিয়েও বললো না। ঋক পরক্ষণেই গেয়ে উঠেছে 'ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি, ওহে সুন্দর'।

হেসেছে তৃষা।

মানুষটিকে ও ঠিক বুঝতে পারছে না। কাল রাতে বুঝেছিলো। ভেবেছিলো যে বুঝেছিলো। কিন্তু সকাল থেকেই কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ঋক যখন চা খেলো তখন তৃষা আর লালপাতিয়াও আরেকবার করে খেলো। এমন শীতে চা সবসময়ই আনন্দের। ওরা যখন চা খাচ্ছে তখন রাম সিং এলো। বললো আমার চা?

লালপাতিয়া হেসে বললো, আছে।

রাম সিং চা খেয়ে লণ্ঠন আর ছুরি হাতে করে পেছনের দরজা খুলে মুরগী দুটোকে নিয়ে নদীর দিকে চলে গেলো বানিয়ে আনবে বলে।

ভুনি খিচুড়ি, আলু বেগুন আর শুকনো লংকা ভাজা, পাঁঠার সিনা ভাজা, জ্যাম দিয়ে; আর মুরগীর কষা মাংস। ভালো হবে না?

তুমি বড় খাদ্যরসিক।

তৃষা বললো।

জীবন-রসিক মাত্রই খাদ্যরসিক। ভালো খাওয়া, ভালো গান, ভালো কবিতা, ভালো পোশাক (দামী নয়), ভালো সুগন্ধ, ভালো ভালোবাসা এই সবকিছু নিয়েই তো জীবন। একের সঙ্গে অন্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তোমাকে কিন্তু রান্না শিখে নিতে হবে তৃষা। রান্না, মেয়েদের একটি মস্ত গুণ। যে মেয়েরা এ কথাটা জানে না তারা ভুল করে। দিন রাত হেঁসেল ঠেলার কথা বলছি না। প্রয়োজনে এবং শখে রান্না যে মেয়ে করে না সে পুরোপুরি মেয়েই নয়।

তৃষা হেসে উঠলো। বললো, মেয়েদেরও এক নতুন ডেফিনেশান শুনছি!

ঠিক সেই সময়ে একটি সাইকেল রিক্সার ঘণ্টা শোনা গেল এবং বাইরের লোহার হুড়কোতে কে যেন শব্দ করলো।

ঋক বললো, ঐ বোধহয় আমার অতিথি এলো। তৃষা কিছু বলার আগেই ঋক উঠে দরজা খুলতে গেলো। অর্ধেক পথ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আমাকে তুমি ভালোবাসো? তৃষা?

তৃষা কথা না বলে, মাথা নোয়ালো, খুবই লজ্জা পেয়ে।

আমার অতিথির সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার কোরো তাহলে।

বলেই, দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বললো, এসো এসো। আমার কী সৌভাগ্য!

ভূষা লণ্ঠনের আলোতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লম্বা, চওড়া সুপুরুষ মানুষটিকে চিনতে পারলো না প্রথমে। পরক্ষণেই চিনতে পেরে এক দৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলো। যে ঘরে (ঋকের ঘরে) ভূষা গেলো সেই ঘরেই প্রণতকে নিয়ে ঋক ঢুকলো এসে। বললো, ভূষা ইনি একজন বন্ধু আমার, দাদা স্থানীয়। নতুন মানুষ। এঁকে তুমি চেনো বলে জানো বটে, আসলে কিন্তু চেনো না। ভালো করে আজ আলাপ করিয়ে দেবো বলেই নেমন্তন্ন করেছি।

ভূষা বললো, রাগত স্বরে, আমি এর কোনোই মানে বুঝছি না।

প্রণত মুখ নিচু করে অপরাধীর মতো বললো, আমিও কিন্তু না। এ সব ঋক-এর কারসাজি।

ঋক হেসে বললো, আমিও বুঝিনি। কিন্তু পরে হয়তো বুঝবো। এখন এসব কথা ছেড়ে আমরা অন্য কথা বলি। প্রণতদা তুমি ভূষার গান শুনেছো কখনও? শুনতে চাওনিও তো কখনও? কবিতা? আর ভূষা তুমি প্রণতদার মুখে তাঁর অফিসের কলিগদের গল্প শুনেছো কখনও? হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে তোমার।

ভূষা আড়ষ্ট হয়েই ছিল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। প্রণতও মুখ নিচু করে অপরাধীর মতো বসেছিলো। লণ্ঠনের আলোতে ওদের দু'জনের ছায়া পড়েছিলো মাটির দেওয়ালে। ওদের আসল মাপের চেয়ে অনেক বড় হয়ে।

ঋক বললো, এক কাজ করো। এখনও শিশির পড়া আরম্ভ হয়নি। তোমরা এই লণ্ঠনটি নিয়ে আমার বাড়ির সামনের শালবনের পথে একটু হেঁটে এসো। দু'জনেই মাথা ঢেকে নিও কিন্তু। আমার রান্নাটা ততক্ষণে আমি এগিয়ে নিই। কেমন?

বলেই ডাকলো, লালপাতিয়া। যা তো বোন, সাহেব মেমসাহেবকে লণ্ঠনটা নিয়ে এগিয়ে দে। শালবনের পথটা দেখিয়ে লণ্ঠনটা দিয়েই ফিরে আসবি। অনেক কাজ আছে আমাদের।

রাম সিং ফিরে এলো লালপাতিয়া ফেরার আগেই।

রাম সিং বললো, যা করার চেষ্টা করছো তা কি পারবে?

না পারি, চেষ্টা করতে ক্ষতি কি বলো। দুটি অমূল্য জীবন বেঁচে যাবে। মতভেদতো অনেক রকমের হয়। এ তো জীবন-মরণের ব্যাপার। অমিল থাকে না কোন মিঞা-বিবির মধ্যে? তা বলে সবাই যদি কথায় কথায় একে অন্যকে ছেড়ে যেতো!

প্রণত বললো ভূষাকে, এই! আমাকে কি কোনোরকমেই ক্ষমা করা যায় না?

না।

ভূষা বললো।

আমি জানি। তুমি আমি হলেও আমাকে ক্ষমা করতাম না। আসলে তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার ছিল তোমার ছোটমামীর কথা, ম্যানেজার শ্রীবাস্তবের কথা, মুঞ্জরির কথা।

আমার শোনার আর ইচ্ছে নেই কোনো। বললে তো অনেক আগে বলতে পারতে।

একটা শেষ সুযোগ দিয়ে দেখলে পারতে। সুযোগ দিলেই যে করতে হবে এমন কোনো মানে নেই।

এই ঋক মানুষটা মোটেই সুবিধের নয়। কাল যাকে লাঠি হাতে মারতে গেলো আজ তাকেই নেমন্তন্ন করে আনবার মানে কি? আমি তো কিছু বুঝেই উঠতে পারছি না।

আমিও সে কথাই ভাবছি। লোকটা সুবিধের কি না জানি না তবে লোকটার চরিত্তর রকম সম্বন্ধে আমারও সন্দেহ হচ্ছে। যে কাল আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলো সেই কাজ আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

সহবাস করলো মানে কি? কি বলতে চাইছো তুমি? সকলেই কি তোমার মতো? তুমি এই যদি বলতে পারলে তবে তো বলতেও পার যে লালপাতিয়ার সঙ্গেও ঋক-এর কোনো সম্বন্ধ আছে। তোমার মন তো নয়, আস্তাকুঁড়।

তা বলছি না। তবে কিছু থাকলেও দোষের কি? বেশ তো মেয়েটি।

ছিঃ। তোমার নজরই নোংরা।

হয়তো। তবে তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দেবো এবারে। তুমি যেমন করে গড়ে নেবে...

যাক। আর যাত্রা করতে হবে না।

কী সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে একটা, না? জঙ্গলের?

বাবাঃ কোন দিকে সূর্য উঠলো। এ সবও তোমার নাকে যায়? জঙ্গলের গন্ধের সঙ্গে আমার পারফ্যুমের গন্ধও আছে।

তোমার শরীরের গন্ধও।

থাক।

আকাশভরা কত তারা।

বাবাঃ ভূতের মুখে রামনাম। তা তারা তো তোমার বাড়ির আকাশেও আছে। কোনোদিন দেখেছিলে কি?

না। এবার থেকে দেখব।

একা বসে দেখো। মালী আর মুঙ্গালিকে সঙ্গে নিয়ে।

না। তোমার সঙ্গেই দেখব।

তুমি একটা মানুষই নও।

মানুষ ঠিকই, তবে বেশিদিন বোধহয় বনমানুষ থেকে মানুষ হইনি। নানারকম ব্যাপার এখনও বড় প্রবল।

কী রকম?

যেমন শরীর।

তুমি একটি পার্ভার্ট। স্ত্রীর শরীর না চেয়ে তুমি নোকরানীর শরীর চাও।

হ্যাঁ। চেয়েছিলাম। অনেক নির্ঝঞ্ঝাট বলে। তোমাকে অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু তুমি আমার নতুন বউ, তোমাকে সুন্দর র‍্যাপিং পেপারের মোড়ক খুলে দেখিনি পর্যন্ত। আমি সত্যিই অমানুষ। সব পাপ স্খালন করে দেবো। দেখো। তোমাকে আমি ভালোবাসি তৃষা।

ফুঃ। ভালোবাসা!

বিশ্বাস করো, কাল রাতের আগে এ কথা আমি নিজেও জানতাম না। আজ সারা দিন কী যে কষ্টে কেটেছে আমার, কী যে অনুশোচনা, গ্লানি—কী বলব তোমাকে।

থাক্। ওসব কথা। আমার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা বাইরে।

প্রণত পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে তৃষার নাক মোছাতে গেলো। তৃষা ছোঁ মেরে রুমালটা নিয়ে নিজেই মুছে বললো, আদিখ্যেতা করো না বেশি বেশি। বলে, রুমালটা ফেরত দিল।

ওরা ফিরতেই রাম সিং দরজা খুলে দিলো। শুনলো রান্নাঘর থেকে দরাজ গলায় গান গাইছে ঋক।

'এলো যে শীতের বেলা
বরষ পরে, এলো যে শীতের বেলা।···
বাহিরে কাদের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
অতিথি আসিবে রাতে তাহারি তরে॥'

এসো এসো। বাঘ-টাঘ সামনে পড়েনি তো!

প্রণত বললো, এ জঙ্গলে শেয়াল থাকলেই বেশি, তার বাঘ।

আর বাঘ সত্যি সত্যিই আর ক'জনের সামনে পড়েছে আজ অবধি। সবই তো কল্পনার বাঘ। স্বপ্নের পোলাউতে যেমন ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করতে নেই দুঃস্বপ্নের বাঘের সাইজেও তেমন কার্পণ্য করতে নেই। এ পর্যন্ত ছোট বাঘও কেউ কি দেখেছে? শুনেছো কারো মুখে?

তা ঠিক। বেশ মজাব মজার কথা বলেন আপনি ঋকবাবু।

আমাকে তুমি 'তুমিই' বোলো। যেমন বলছিলে। প্রণতদা তো ঘরের লোক। তার সামনে লজ্জা কি!

তারপরই বললো, ঠাণ্ডা লাগিয়ে এসেছো তো! এই দ্যাখো ঠাণ্ডার ওষুধও এনে রেখেছি। তৃষাকে একটু গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি আর প্রণতদা এমনিই জল দিয়ে খাবো।

কি?

চোখ বড় বড় করে বললো তৃষা।

ব্রাণ্ডি। ঠাণ্ডার যম।

তুমি মদ খাও?

খাই বইকি। তুমি মিছেই প্রণতদাকে দোষ দাও। আজকাল মদ খায় না কে। তবে প্রণতদা মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলে এই যা। এবার থেকে আর করবে না শুনতে পাচ্ছি।

কে বলেছে তোমাকে?

তৃষা বললো।

শুনতে পাচ্ছি। এই নাও তৃষা। একটু একটু করে চুমুক দাও। আড়ষ্ট ভাবটা চলে যাবে। শীতও পড়েছে। বড়দিনও এসে গেল। আমাদের মতো কেরানীদেরও বড়দিনে একটু কেক খেতে আর মদ খেতে হয়। সায়েবদের কাছে শিক্ষা। বুঝলে না। কই গেলে রাম সিং? কই এসো। তুমিই বা বঞ্চিত হও কেন? এই লালপাতিয়া তুই খেয়ে-দেয়ে শোওয়ার সময়ে এক চুমুকে খেয়ে নিবি। ঘুম ভালো হবে। তোর জন্যেও রেখে দেবো। ভাবিস না।

চিয়ার্স বললো ঋক। তারপর বললো, কই তৃষা খাও। তৃষা অবাক হচ্ছিলো। মদ ব্যাপারটার মধ্যে ও চিরদিনই একটি গর্হিত অপরাধ লক্ষ্য করেছিলো। আজ ঋক ব্যাপারটাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে এমন জল ভাত করে দিলো বলে সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছিলো।

বলল, জীবনে কোনোদিনও খাইনি।

এই কথাটা শুনলেই আমার হাসি পেয়ে যায়। জীবনে বিয়ের আগে কোনোদিনও একটা জিনিস করেছিলে? অবশ্য না—করে থাকলে আমি জানি না।

ঋক ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললো।

প্রণত হো হো হো করে হেসে উঠলো।

তৃষা কথার মানেটা একটু পরে বুঝলো। বুঝেই লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। বললো, এতো অসভ্য না।

নাও, এবার খাও। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের সঙ্গী হবে, স্ত্রী স্বামীর। দূরে দূরে ছেড়ে ছেড়ে থাকে বলেই আমাদের দিশী দম্পতি একে অন্যকে পরিপূর্ণভাবে পায় না। কিটসন্ সাহেবকে দেখোনি প্রণতদা? স্বামী-স্ত্রী যেন একে অন্যকে পলকে হারায়। স্বামী যা করতেন স্ত্রীও তাই করতেন। নইলে কিসের জীবনসঙ্গিনী?

তা বলে মদ খেতে হবে?

তৃষা বললো।

একে মদ খাওয়া বলে না। সোস্যালড্রিঙ্কিং এর নাম। আমার কথা শোনো। দুজনে মিলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে, গান শুনতে শুনতে, কবিতা পড়তে পড়তে একটু খেলে ক্ষতিই বা কি? বাইরে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতে খাওয়া অনেক ভালো। স্ত্রী না খেলে স্বামী মদ্যপদের পাল্লায় পড়ে রোজই দেরি করে বাড়ি ফিরবে। আর মাতাল মানুষ আর কাটুনেওয়ালা জানোয়ারে তফাৎ কি আছে বল?

তোমার খিচুড়ির গন্ধটা বেশ ছেড়েছে।

প্রণত বললো কী বলবে ভেবে না পেয়ে।

এখনই কি ? যখন খাবে, তখন বুঝবে। চলো। বাকিটা রাম সিং ভাই আর লালপাতিয়া সামলে নেবে। আমরা আমার ঘরে গিয়ে বসি। একটু আড্ডা মারা যাক।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা এখন। ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ। ভূষা দুটো বড় ব্রাণ্ডি খেয়েছে গরম জলে। প্রণতর প্রতি বিরূপতা যেন অনেকখানি কেটে গেছে। তবে তার প্রধান কারণ ঋকের মজার মজার কথা, গান, কবিতা। ঋক যেখানে থাকে সেখানে কারোই ব্যাজার মুখে থাকার উপায় নেই।

প্রণত বললো, এবার একটা রিক্সা ডেকে দিতে হয় ঋক।

রিক্সা ? রিক্সা এখানে কোথায় পাবে ? রিক্সা ডাকতে হলে সেই মুরাদগঞ্জের মোড়ে যেতে হবে। গাড়ি থাকতে গাড়িখানা নিয়ে এলে না কেন ? পরস্ত্রীর বোঝা আর আমার বইতে হতো না। মিঞা-বিবিকে একসঙ্গে তুলে দিতাম গাড়িতে। তোমার গাড়িখানা কি কেবলই গরিবের সাইকেল ভাঙার জন্যে ?

ওরা সকলেই হেসে উঠলো।

প্রণত বললো, তোমাকে আমি একটি অটো সাইকেল কিনে দেবো।

হ্যাঁ ! আমি নিলে তো ! পায়ে বাত হবে। সাইক্লিং ইজ আ ভেরী গুড একসারসাইজ।

আমি এখন যাবো কি করে ? ঋক ?

তুমি যে এখান থেকে একা যাবে তা তো হবে না। রাত ন'টার পর থেকে এই রাস্তা একটা পাগলা শেয়ালের টেরিটোরী হয়ে যায়। কাল আসা-যাওয়ার পথে দেখোনি তাকে ?

না তো !

কোথায় যাবে এতো রাতে। আর তোমার রিক্সা ডাকতে গিয়েই বা কে নিওমুনিয়া বাধাবে ! জলে তো আর পড়োনি। আমার আবার ভীষণ ঘুম পেয়ে গেছে। যা গেলো না সারাটা দিন !

তা ঠিক। ভূষা বললো।

আই অ্যাম সরি ঋক।

আর কথা না বাড়িয়ে এবারে এসো দেখি। বিছানা পর্যন্ত পেতে রেখেছি।

সে কি ! কোথায় ?

ভূষা অবাক হয়ে বললো।

এসোই না।

আমি কিন্তু কাল যেখানে শুয়েছিলাম সেখানেই শোব।

ভূষা বললো।

আমি কি তাহলে প্রণতদার মতো একজন আধোচেনা ধুমসো পুরুষ-মানুষকে জড়িয়ে ধরে রাত কাটাবো। ওসব হচ্ছে না।

তারপরই গলা নামিয়ে ঋক বললো, তৃষা, কথা শোনো। ডোণ্ট ক্রিয়েট আ সীন্‌। ওরা আছে না। কী ভাববে!

ঘরে একটি লণ্ঠন ফিতে কমিয়ে রেখে ঋক বললো, প্রণতদাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিও তৃষা। যদি রাতে যান। খাবার জল রইলো জাগে। গ্লাস। আর এই দ্যাখো, সব নতুন। বলেই লেপটা তুলে দেখালো: লাল আর হলুদ গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো বেড়শীটের উপরে।

দেখছো! কী পাজী!

তৃষা বললো।

বেডশীটটা আর তুলো না। নিচ থেকে ঠাণ্ডা তো উঠবেই। তোশক-টোষক তো নেই। তারপর গলা নামিয়ে বললো, দুজনে দুজনকে যতটুকু গরমে রাখতে পারো ততটুকুই গরম। ওকে গুড নাইট। আমি শুতে চললাম। আমার ঘর থেকে তোমার স্যুটকেসটা দিয়ে যাচ্ছি তৃষা। যদি কোনো কিছুর দরকার হয়। ও একটা কথা শোনো প্রণতদা।

বলেই, প্রণতকে উঠোনে ডেকে এনে ঋক বললো, বিয়ে তো আমি করিনি। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে দম্পতির সব ঝগড়া বিছানাতেই মিটে যায়। কথাটা যে সত্যি তা প্রমাণ করো।

॥ ৮ ॥

এখন বেলা আটটা। ঋকের চান হয়ে গেছে। নাস্তাও হয়ে গেছে। তৃষাদের জন্যে নাস্তার বন্দোবস্ত করে অফিসে বেরোলো ঋক। ও ঘরের দরজা এখনও খোলেনি। রোদ ঝলমল আকাশের দিকে চেয়ে মনটা ভারী প্রসন্ন লাগলো ঋকের। বহুদিন এতো ভালো লাগেনি ওর।

বেরোবার সময়ে রাম সিংকে বলে গেলো. মুরাদগঞ্জের মোড় থেকে রিক্সা ডেকে এনে দুজনকেই তুলে দিতে সব মালপত্র দিয়ে। অফিস-ফেরতা ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখা করবে ঋক। অফিসেও বলে দেবে যে সাহেব আজও অফিসে যাবেন না। আরেকটা কথা রাম সিং। লালপাতিয়াকে সঙ্গে করে তুমি রাতে নিয়ে যাবে সাহেবের বাংলোয়। ওখানেই থাকতে হবে ওকে কিছুদিন। আমার মুখ চেয়ে। যতই কষ্ট হোক ওর গ্রাম ছেড়ে থাকতে।

শিশিরে ভেজা শালবনের পাতায় পাতায় রোদ পড়ে লক্ষ হীরের মতো ঝলমল করছে দু দিক। জোরে নিশ্বাস নিলে এখনও নাকে ব্যথা করে এমন ঠাণ্ডা। একটা নীলকণ্ঠ পাখি পাতা থেকে শিশির ঝরিয়ে আকাশের নীল আর রোদকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে তার প্রাণের অকলুষ উৎসারে ডাকতে ডাকতে চলে গেলো নদীর দিকে। ভেজা ধুলোর গন্ধ উঠছে চারপাশ থেকে। নদীর গন্ধ ভাসছে থমথম-ধরা সকালে। হাওয়াটা এখনও শুরু হয়নি। বেলা বাড়লে শুরু হবে। বনে বনে উসখুস উসখুস। ঝরা পাতা উড়বে এদিকে ওদিকে উত্তরের হাওয়ায়।

কোনো মানুষকেই খারাপ বলে কখনও ফেলে দিতে নেই। ঋক আবার বললো মনে মনে। লণ্ঠনের আলোতে যেমন সব দেখা যায় না মুখের কিছুটা অন্ধকার থাকে, আমাদের চোখের আলোও তেমনই। আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আলোকিত দিকটুকুই বেশি অন্ধকার দিকের চেয়ে। জীবনকে দেখতে, অন্যকে দেখতে আজকের সকালবেলার আলোর মতো আলো চাই।

কী করছে এখন তৃষা কে জানে? হয়তো প্রণতদাকে জড়িয়ে ধরে আশ্লেষে ঘুমোচ্ছে। আসলে কালই ওদের ফুলশয্যার রাত গেছে। বিয়ের বহুদিন পরে এলো।

কে জানে কি বলবে তৃষা আজ যখন দেখা হবে ওদের বাড়িতে রাতে? ওর প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা আবৃত্তি করেই বলবে কি?

"নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতে
ঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহরে উজানে
তারই কাছে এসে ওই পাঁজরে পালক রেখেছিলে
তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে।"